ভারতের সাধিকা

ভারতের সাধিকা

(প্রথম খণ্ড)

প্রথম খণ্ড

শঙ্করনাথ রায় শঙ্করনাথ রায়

(প্র-না-ভ)

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

সূচীপত্র

অণ্ডাল রঙ্গনায়কী	...	...	৭
কৃষ্ণময়ী মীরা	...	...	৩৩
মাতাজী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী	...	...	৬০
দেবী সারদামণি	...	...	১০৪
যশোদা মাঈ	...	...	২০৩
গৌরীমা	...	...	২২৩

প্রাক্-ভাষণ

ব্রহ্মবিদ্ ঋষিসেবিত ভারতে ব্রহ্মবাদিনী ঋষি ও সাধিকাদের অভাব কোনদিনই ঘটে নি। যুগে যুগে তাঁরা আবির্ভূতা হয়েছেন এই দেশের মাটিতে, ছড়িয়ে গেছেন সাধনার পরম ঐশ্বর্য অকৃপণ করে।

ঋক্‌বেদের মন্ত্র যাঁরা দর্শন করেছিলেন সেই ঋষিদের ভেতরে রয়েছেন নারী-ঋষি—ঘোষা, রোমশা, লোপমুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি।

ব্রহ্মবাদিনী বাক্ ছিলেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা, দেবীসূক্তের ঋষিরূপে ভারতীয় সাধনজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তিনি।

বৈদিক ভারতের অন্যতম অবদান হচ্ছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ। এই সুপ্রাচীন মন্ত্রের উৎস, ছিলেন 'যোগীশ্বর'রূপে ঋষি ও যোগীদের সংপূজিত পরমপ্রভু। এই যাজ্ঞবল্ক্যের বৃহদারণ্যক ধ্বনিত হতে দেখি তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীর আকুল প্রশ্ন—যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্,—যে বস্তু পেলে অমৃতত্ব লাভ হবে না, সে বস্তুতে আমার কি প্রয়োজন? মৈত্রেয়ী তাঁর পতি ও গুরুর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, হয়েছিলেন আপ্তকামা।

আজকের দিনেও ব্রহ্মজ্ঞ মহলে আলোচিত হয়ে থাকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মানসকন্যা মহাসাধিকা সেই ব্রহ্মদূতির কথা যিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী, গায়ত্রীমন্ত্রের মূর্ত প্রতিমা।

বেদের ব্রাহ্মণে মহাতাপসী বাচক্নবী গার্গীর কথা আমরা পাই। সেই গার্গী এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিচারের কাহিনী আজো এদেশের সাধককুলের কাছে হয়ে রয়েছে অবিস্মরণীয়। আচার্য শঙ্করের উক্তি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়—গার্গী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নি, সংসারধর্ম কখনো পালন করেন নি, সন্ন্যাসিনীই ছিলেন আজীবন।

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে দেখতে পাই, তাপসী নারীদের অনেকেই ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করেছেন, তাঁদের সার্থক তপস্যা ও কৃপার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে সমকালীন সমাজ।

ধর্মশাস্ত্রকার যমের মতে, প্রাচীন যুগের সাধনার্থিনী কুমারী কন্যাদের মধ্যে উপনয়ন, বেদ অধ্যয়ন ও গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রবেত্তা হারীতও সমর্থন করেছেন এই প্রথার কথা।

অনেকের ধারণা, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের আগে নারী সন্ন্যাসিনী বা নারী পরিব্রাজিকা এদেশে দেখতে পাওয়া যেত না। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের আধুনিক গবেষকরা কিন্তু প্রমাণ করেছেন, এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। বেদপন্থী সন্ন্যাসিনীদের অবশ্যই দেখা যেতো প্রাক্ বৌদ্ধযুগে এবং সমাজে তাঁরা অধিকার করতেন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের স্থান।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ও জৈন তপস্বিনীদের কথা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে ছড়ানো রয়েছে। পরবর্তীকালে তন্ত্রানুসারিণী ভৈরবী ও নারী সাধিকাদের জীবন-তথ্যও আমরা নানাস্থানে পাই।

আধুনিককালে এবং আমাদের সমকালীন সমাজেও উচ্চকোটির নারী-সাধিকাগণ, ব্রহ্মজ্ঞাগণ, দুর্লভ নন। আসমুদ্র হিমাচলের নানা পুণ্যকেন্দ্রে এঁরা বিচরণ করেন, শাশ্বত আত্মিক জীবনের আলোয় আলোকিত করেন বহু নব-নারীর জীবনপথ, ছড়িয়ে যান জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও নিষ্কাম কর্মের পরম সম্পদ।

'ভারতের সাধক' গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকাদের অজস্র চিঠিপত্র গত কয়েক বছরে আমরা পেয়েছি এবং এই সব চিঠিতে তারা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন ভারতের সাধিকাদের পুণ্যকথা বর্ণনের জন্য। বর্তমান গ্রন্থে সেই অনুরোধ কথঞ্চিৎভাবে মেটাবার প্রয়াস আমরা করেছি। বলা বাহুল্য আলোচ্য সাধিকাদের বাইরেও উচ্চকোটির বহু সাধিকা রয়ে গিয়েছেন, সুযোগ ও অবসর-মতো পরবর্তীকালে তাঁদের পুণ্যকথা বিবৃত করা হবে।

সারা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজে আজ দেখা যাচ্ছে চরম অনাচার, অবক্ষয় ও আত্মহননের বিভীষিকা। এই দুর্দিনে 'ভারতের সাধিকা' গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

সাধিকাগণ সাত্ত্বিকী মাতৃশক্তির প্রতীক, জাতীয় উজ্জীবনের প্রেরণাদাত্রী। তাঁদের সেই মাতৃশক্তির স্বরূপকে এই গ্রন্থের মাধ্যমে জনজীবনের সম্মুখে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি আমরা। ইতি—

—গ্রন্থকার

অণ্ডাল রঙ্গনায়কী

প্রত্যূষেব স্নিগ্ধ মধুব আলো ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীবিল্লিপুত্তুবেব আকাশেব গায়ে। ধ্যান ভজন সমাপন করে, ফুলেব সাজিটি হাতে নিয়ে, আচার্য বিষ্ণুচিত্ত কুটিবেব অঙ্গনে এসে দাঁড়ান। এবাব শুরু হবে তাঁব ইষ্টপূজাব অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান। উদ্যান থেকে বেছে বেছে নানা বর্ণেব নানা গন্ধেব ফুল তিনি চযন কববেন, তাই দিযে সারা মনপ্রাণ ঢেলে প্রভুব জন্য গাঁথবেন অজস্র মালা। তাবপব শ্রীমন্দিবে গিযে প্রেমভরে একটি ক'রে ঐ মালাব গুচ্ছ দুলিযে দেবেন অর্চাবতাব আদিকেশবেব গলায়। প্রভুব মালাকাব হযে, এমনি ক'বে ভক্তশ্রেষ্ঠ আচার্য প্রতিদিন উপনীত হন তাঁব কাছে, নিপুণ হস্তে এক একটি ক'বে সাজিযে দেন পুষ্পমালা। প্রহবেব পব প্রহব নির্নিমেষে, বিগ্রহেব অপরূপ শোভার দিকে চেযে চেয়ে আশ আব মেটে না। প্রতি প্রভাতে, প্রতি রাত্রে মাল্যদানেব এই পবম মধুর অনুষ্ঠানটিব জন্যই আচার্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'বে থাকেন।

কুটিবেব প্রান্ত থেকে দূবে প্রসাবিত হয়ে গিয়েছে পুষ্প উদ্যানেব সীমানা। এই উদ্যানটি আচার্যেব নিজের হাতে গড়া, তাঁর সর্বস্ব উজাড় ক'বে গড়া। পৈতৃক বিষয-আশয যা কিছু ছিল তা বিক্রয় ক'রে এই উদ্যান তিনি বচনা কবেছিলেন। তাবপব এর ওপব ঢেলেছিলেন উত্তবকালেব অর্জিত সম্পদ। সেবাব পাণ্ড্য বাজসভায এক বিবাট শাস্ত্রবিচাব সভাব অধিবেশন হয়। বহু প্রখ্যাত আচার্য ও দার্শনিক দেশ-দেশান্তব থেকে আমন্ত্রিত হযে আসেন। এই বিচাবসভায বিষ্ণুচিত্ত তাঁর অসাধাবণ প্রতিভাবলে স্থাপন করেন ভক্তি সিদ্ধান্তের প্রাধান্য। বিজযী আচার্যের গলায সেদিন জযমাল্য পবিযে দিযেছিলেন পাণ্ড্যরাজ, সেই সঙ্গে উপঢৌকন দিযেছিলেন

একবাশি স্বর্ণমুদ্রা। সেদিনকার প্রাপ্ত অর্থেব সমস্তটাই বিষ্ণুচিত্ত ব্যয় কবেছেন তাঁর উদ্যানের পেছনে।

এই স্থানটি বিষ্ণুচিত্তের জীবনের এক পবম সম্পদ। তাঁর প্রাণ-প্রভু যে এই উপবনেবই কুঞ্জে কুঞ্জে রয়েছেন লীলাচঞ্চল। এখানকার প্রতিটি লতায়, পত্র-পুষ্পে, তরুর শাখায় জেগে আছে তাঁরই দিব্য আনন্দেব শিহরণ। নানা বর্ণের, নানা গন্ধের পুষ্প চয়ন ক'বে প্রতিদিন এখানে গাঁথা হয় অর্চাবতারের অর্চনামালা। তাই তো এই পুষ্পোদ্যানকে কেন্দ্র ক'রে দিনেব পব দিন আবর্তিত হয়ে চলে বিষ্ণুচিত্তের ভজনময় জীবন।

নবারুণের আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে উর্ধ্বায়িত নাগলিঙ্গমের শাখায় শাখায়। আদিকেশবেব গগনচুম্বী মন্দিরচূড়ায় ফুটে উঠেছে তারি অপরূপ স্বর্ণ-আভা। নাঃ, পুষ্পচয়নের আর দেরি করা নয়, বাগানের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন আচার্য বিষ্ণুচিত্ত।

আষাঢের বর্ষণক্লান্ত প্রভাত। জুঁই চামেলী থবে থবে ফুটে বযেছে দিকে দিকে। প্রাণভরে বিষ্ণুচিত্ত পুষ্প চয়ন ক'রে নেন, অল্প সময়েব ভেতর সাজি তাঁব ভরে ওঠে। এবার কিছুটা তুলসীপত্র সংগ্রহ হলেই কুটিবে ফেরা যায়।

পুষ্পোদ্যান পার হয়ে তুলসীকাননে পা বাড়াতেই আচার্য বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যান। একি অভাবনীয় দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত তাঁর নয়নসমক্ষে? মাটির ওপব তুলসী বিছানো শয্যায় শায়িত বয়েছে এক নয়নাভিরাম শিশুকন্যা। দেবশিশু না মানবী? অথবা একি আচার্য বিষ্ণুচিত্তেব মনেব ভ্রম? কিংবা দৈবী মায়া?

কাছে এগিয়ে দেখলেন,-লাবণ্যে ঢলঢল অঙ্গ, অনিন্দ্যসুন্দরী এক শিশুকন্যা আপন মনে শুয়ে শুয়ে হাত পা নেড়ে খেলা কবছে। সাবা মুখ হাসির আভায় সমুজ্জ্বল।

কিন্তু কোথা থেকে এল এই শিশু? কে বেখে গেল এমন ক'বে এই তুলসীবনেব অভ্যন্তবে?

নানা প্রশ্ন এসে ভিড় করে বিষ্ণুচিত্তের মনে। সস্নেহে শিশুটিকে স্পর্শ করতে গিয়েও থমকে দাঁড়ান। স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য কে বলবে? জন্ম কার ঘরে, কেনই বা এখানে পরিত্যক্ত হল তা জানা নেই। চাঁদের টুকরোর মতো এমনতর শিশুকে প্রাণে ধরে বিদেয় দিতে পারে সে কোন্ দুর্ভাগিনী জননী? আকাশ পাতাল কত কিছু ভাবতে থাকেন বিষ্ণুচিত্ত। কিছুরই খেই পান না।

ঠিক সেই মুহূর্তে তুলসীকুঞ্জের ওপাশ থেকে ভেসে আসে স্নিগ্ধ কণ্ঠের দৈবী আওয়াজ, "আচার্য, কেন বৃথা তুমি ভেবে মরছো? এ কানন কার বলতো? তুমি কি আমাকেই এটা উৎসর্গ ক'রে দাও নি? যদি তাই হয়, এ যে আমারই লীলাস্থলী। দেবভোগ্য ছাড়া, এখানে অবাঞ্ছিত, অগ্রহণীয় বস্তু কি ক'রে আসবে বলতো? এতো শুধু মানবী কন্যা নয়, এ যে দেবপূজার দিব্য অর্ঘ্য। তোমার বাগানের অজস্র ফুলের মাঝে এ এসেছে ফুলরানী হয়ে। তোমার মালার ফুলের সাথে একেও উৎসর্গ ক'রে দাও তোমার ইষ্টের চরণে। তারপর একে পালন করো আপন সন্তানরূপে। প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়ে এ কন্যা জন্মেছে। কৃষ্ণপাগলিনী হয়ে, কৃষ্ণবল্লভা হয়েই সে কাটাবে তার দিব্যজীবন। অগণিত নরনারীকে করবে কৃষ্ণরসে রসায়িত।"

মনের সংশয় ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব সেই মুহূর্তে ঘুচে যায়, পরম স্নেহে বিষ্ণুচিত্ত শিশুকন্যাকে বুকে তুলে নেন। দ্রুতপদে উপনীত হন নিজের কুটিরে।

সোৎসাহে পত্নী বীরাজয়কে ডেকে আচার্য বলেন, "ওগো, এসো এসো। এই ছাখো, কি বস্তু তোমার জন্য এনেছি। প্রভুর বাগানের এ এক নূতন প্রাণমাতনো ফুল। পরম প্রভু রঙ্গনাথজীর কৃপায় স্বর্গ থেকে ঝরে পড়েছে।"

আচার্যপত্নী সন্তানহীনা। আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে এলেন,

শিশুকন্যাকে চেপে ধরলেন বুকের মাঝে। সব কথা শুনে আনন্দের তাঁর আর অবধি রইল না।

খানিক বাদেই পুষ্পমালার সাজি আর সেই নবলব্ধ কন্যা নিয়ে বিষ্ণুচিত্ত শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলেন। পরমানন্দে দুই-ই অর্ঘ্য দিলেন জাগ্রত নারায়ণ বিগ্রহের চরণতলে।

বেদীতলে শায়িত রয়েছে দিব্য লাবণ্যময়ী কন্যা। একবার দেখলে চোখ ফেরানো কঠিন। অনুসন্ধিৎসু হয়ে দর্শনার্থীদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, "আচার্য, এ কন্যারত্ন কার বলুন তো? কোথায় পেলেন? কি ক'রেই বা পেলেন?"

"দেবানুগ্রহে পেয়েছি, ভাই, এ আমারই।"

একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে মন্দিরকক্ষে। আচার্য প্রৌঢ় হয়েছেন। দীর্ঘদিন তিনি নিঃসন্তান, এই কথাটাই তো সকলে জানে। তাঁর ঘরে হঠাৎ এ কন্যার আবির্ভাব কি ক'রে হল?

সব শুনে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে, "জাতি ধর্মের-খোঁজ না ক'রে আচার্য এ কন্যাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর মতো লোকের পক্ষে এটা কি সুবিবেচনার কাজ হল? লোকেই বা কি বলবে?"

মর্মাহত হলেন বিষ্ণুচিত্ত। যুক্তকরে সকাতরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন অর্চাবিগ্রহের কৃপালু নয়ন দুটির দিকে। জানালেন নীরব প্রার্থনা— "তোমার প্রদত্ত বস্তুর স্বীকৃতি তুমিই দাও প্রভু, আমার আর আমার কন্যার মর্যাদা তুমি রক্ষা করো।"

হঠাৎ দেখা যায় এক অলৌকিক দৃশ্য। শ্রীবিগ্রহের কণ্ঠ থেকে একগাছা মালতীর মালা ছিঁড়ে পড়ে বেদীতলে, শায়িত কন্যার শিরে। মন্দিরকক্ষে দণ্ডায়মান ভক্তদের মাঝে ওঠে আলোড়ন। এযে অর্চাবতারের নিজস্ব নীরব স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। সংশয়ের মেঘ মুহূর্তের মধ্যে কেটে যায় সবার মন থেকে। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় আচার্য বিষ্ণুচিত্তের জয়ধ্বনি।

সেদিনকার ঐ কৃপাধন্যা শিশুকন্যাই উত্তরকালের মহাসাধিকা অণ্ডাল। দাক্ষিণাত্যের প্রেমভক্তিসিদ্ধ আড়বার বৈষ্ণবদের মধ্যে

নারী সাধিকারূপে তিনি ছিলেন অনন্যা। অর্চাবতার শ্রীরঙ্গনাথের প্রিয় বল্লভা আর গোপী প্রেমের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন অণ্ডাল। সেই প্রেমময়ী কৃষ্ণ-সর্বস্ব সাধিকার মধুর স্মৃতি আজও সারা ভারতের ভক্ত-সমাজে অক্ষয় হয়ে আছে।

শিশুকে কোলে ক'রে বিষ্ণুচিত্ত ও বীরাজয় ঘরে ফিরে আসেন। নিঃসন্তান দম্পতির হৃদযে উচ্ছলিত হয় অপত্য স্নেহের অমৃত-রস। সারা ঘর অঙ্গন শিশুর প্রাণভোলানো কলহাস্যে মুখরিত হযে ওঠে। পিতা মাতার হৃদয়-কন্দর আনন্দে আরো ঝলমল করতে থাকে।

আদর ক'রে তাঁরা এই কন্যার নামকরণ করেন, 'কনই' অর্থাৎ কান্তিময়ী কমনীয়া সুকন্যা। সাধিকাজীবন স্ফুরণের অল্পকালের ভেতরই 'কনই' পরিচিত হন অণ্ডাল নামে। আষাঢ়ের শুভ শুক্লা চতুর্থীতে ভক্তপ্রবর বিষ্ণুচিত্ত এই দিব্যকান্তি, সুদর্শনা কন্যাকে লাভ করেছিলেন, তাই আজও তা চিহ্নিত হযে আছে অণ্ডালের আবির্ভাব-তিথিরূপে। দাক্ষিণাত্যের জনসমাজে, বিশেষ ক'রে ভক্তিসিদ্ধ আড়বার সাধকদের ভক্ত ও অনুগামীদের কাছে এই পবিত্র তিথিটি হযে রয়েছে অবিস্মরণীয়।

পরম স্নেহে ও আদরে বিষ্ণুচিত্ত এই পালিত কন্যাকে লালন করতে থাকেন। কন্যাও দিন দিন বেড়ে ওঠে শশীকলার মতো। পিতার উপর তার ভারি টান। উদ্যানের তরুলতার পরিচর্যায়, পুষ্প-চয়নে, ভজনকুটিরে, প্রভু নারায়ণের মন্দিরে, আচার্য যখন যেখানে যান, কন্যা অণ্ডাল ছায়ার মতো থাকেন তাঁর সাথে সাথে। আচার্য ও বীরাজয়ের পরান-পুতলী এই মেয়ে। ক্ষণেকের তরেও তাকে চোখের আড়াল করতে তাঁরা ভরসা পান না। কি যেন এক দুর্বার আকর্ষণে সে এই ভক্ত দম্পতিকে সদাই টেনে রাখে।

এক একদিন আচার্যের মনে প্রশ্ন জাগে। দীর্ঘ দিন ভক্তি-সাধনার তিনি অনুষ্ঠান ক'রে আসছেন, ইষ্টভজনে ইষ্টকর্মে নিজেকে করেছেন নিবেদিত। কিন্তু এই কন্যাকে কেন্দ্র ক'রে আজ তাঁর

জীবনপ্রবাহ কোন্‌দিকে সঞ্চালিত হতে যাচ্ছে? কেন এই মানবীর স্নেহের আকর্ষণ? কেনই বা বৃদ্ধ বযসে এই মায়াব বন্ধন?

সঙ্গে সঙ্গেই কানে আসে ইষ্টদেব শ্রীনাবাযণেব মধুর বাণী। প্রভু বলেন, "বিষ্ণুচিত্ত, সারা জীবন একান্ত নিষ্ঠায় তুমি অর্চনা ক'রে আসছো আমায নিজ হাতে গডা উদ্যানেব পুষ্পমাল্যে। দৈব কৃপায তোমার সেই উদ্যানে আত্মপ্রকাশ কবেছে এই দিব্য ফুল—অণ্ডাল। তাঁকে তুমি আমার অর্চনার উপযোগী ক'রে, বঙে বসে প্রস্ফুটিত ক'বে তোল—এই যে আমি চাই। অণ্ডালকে তুমি গণ্য করবে দিব্যলোকেব পুষ্পরূপে, আমার অর্চনার এক প্রধান উপচাবরূপে। তাহলে তোমাব অপত্যস্নেহ আর মাযার বন্ধন বলে মনে হবে না।"

ভক্তসাধক বিষ্ণুচিত্তের সব সংশয় দূবে যায, অন্তবেব ভার লঘু হয। সত্যিই তো, এ কন্যা তিনি লাভ করেছেন দৈবানুগ্রহে, তারপর ইষ্টবিগ্রহের চবণেই তাকে করেছেন উৎসর্গিত। তবে কেন সে হবে বন্ধনস্বরূপ?

পবম আগ্রহে বিষ্ণুচিত্ত অণ্ডালেব লালন-পালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, এখন থেকে এ-কার্য হয় তাঁব পবিত্র দিনচর্যার এক প্রধান অঙ্গ।

অণ্ডাল ধীরে ধীবে কৈশোরে পদার্পণ করেন। অঙ্গে যেমন তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য অন্তরের ঐশ্বর্যও তেমনি রয়েছে সুপ্রচুর। ভক্তিপ্রেমের শুদ্ধ সংস্কাব নিযে জন্মেছেন, সে সংস্কাব স্ফুরিত হযে ওঠে পিতাব মুখে ঐশ্বরীয কথা শুনে। আড়বাবদের ভাগবত জীবনের কথা, প্রেমোন্মাদনাব কথা শুনে তাঁর দুই নযনে ঝরতে থাকে পুলকাশ্রুব ধাবা। পিতা বিষ্ণুচিত্ত ভক্তিসাধনায বাৎসল্য বসের ধারক ও বাহক। এ অঞ্চলেব তিনি এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় আড়বার বৈষ্ণব। তাঁব মুখে দিনের পর দিন অণ্ডাল ভক্তিবসে বসাযিত দিব্য-প্রবন্ধ, বিশেষ ক'রে তাঁব স্ববচিত বৈষ্ণবীয গীতি, শ্রবণ করেন। প্রেমভক্তিব ভাবতবঙ্গ উচ্ছলিত হয তাঁব সাবা দেহে মনে। শ্রুতিধব

কিশোরীর স্মৃতিতে অবলীলায় গেঁথে যায় সাধক বৈষ্ণবদের দিব্য অনুভূতিময় পদাবলী।

ভাগবতের কৃষ্ণলীলা উপাখ্যান অণ্ডাল বসে বসে শোনেন পিতার কাছে, সারা অন্তর উদ্বেল হযে ওঠে কৃষ্ণপ্রেমে। কিশোরী জীবনে উপজিত হয় প্রেমভক্তির দিব্য রসধারা। বড় সহজ বড় স্বাভাবিক অণ্ডালের এই রূপান্তর। যে সহজাত কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে তিনি জন্মেছেন, সে প্রেমের রসধারা দিনের পর দিন পুষ্টিলাভ করছে তাঁর জীবনের এই অনুকূল পরিবেশে।

অণ্ডাল যেমন সুকণ্ঠি তেমনি ভজন গানে উৎসাহও তাঁর প্রচুর। ভাবাবেশে মত্ত হযে শ্রীমন্দিরে বসে তিনি যখন ভগবৎ-সংগীত গান করেন, দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে যায। কিশোরী অণ্ডালের ভজন ও ভাবাবেশের খ্যাতি রটে শ্রীবিল্লিপুত্তুরের সীমা ছাড়িয়ে।

অণ্ডালের জীবনে সবচেযে বড় আকর্ষণ তাঁর পিতার রচিত পুষ্পোদ্যানটি। এ উদ্যান বিষ্ণুচিত্ত রচনা করেছেন তাঁর ইষ্টবিগ্রহের সেবার জন্য, নিত্যকার পুষ্পমাল্য যোগানোর ভার নিযেছেন তিনি। এখানকার প্রতিটি তরুলতা প্রতিটি পুষ্পস্তবক অণ্ডালের প্রাণসর্বস্ব। রোজ প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠেই এই উদ্যানে তিনি প্রবেশ করেন। বিচরণ করেন মুক্ত বিহঙ্গিনীর মতো। প্রেমবিধুরা হয়ে চয়ন করেন প্রভুপূজার পুষ্পরাজি। পিতা মাতার সঙ্গে সানন্দে ভজন গাইতে গাইতে অণ্ডাল মালা গাঁথেন, তারপর শ্রীমন্দিরে গিয়ে আদিকেশবের গলায তা পরিযে দেন একটি পর একটি। বটপত্রশাযী নারাযণ-বিগ্রহের কোন্ দিব্য রসমধুর রূপ ফুটে ওঠে কিশোরী অণ্ডালের মানসপটে তা তিনিই জানেন। সে দিব্যদর্শন তাঁর আযত দুটি নয়ন-কমল থেকে উৎসারিত করে প্রেমাশ্রুর প্রবাহ। কিশোরী অণ্ডালের এই প্রেমার্তি, এই করুণমধুর রূপ দেখে মন্দিরের দর্শনার্থীদের নযনও হযে ওঠে অশ্রু ছলছল।

দাক্ষিণাত্যের ভক্ত-সমাজে অর্চাবতার শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহের মর্যাদার সীমা নেই। বড় জাগ্রত বড় কৃপালু এই দেববিগ্রহ। এঁকে কেন্দ্র

ক'রে হাজার হাজার বৎসর ধরে অগণিত ভক্ত-সাধক হয়েছেন আপ্তকাম, ভক্তি-শাস্ত্রের পঠন গঠন ও ব্যাখ্যান ছড়িয়ে পড়েছে অজস্রধারে। অণ্ডাল এই মহান্ বিগ্রহের লীলাকথা অনেক শ্রবণ করেছেন, শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে নিমজ্জিত হয়েছেন প্রেমসমুদ্রে। পিতার কাছে অণ্ডাল ভাগবত শ্রবণ করেছেন দীর্ঘদিন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা, আর সর্বত্যাগিনী গোপীদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা তাঁর মন কেড়ে নিয়েছে। তাই ইষ্টদেব শ্রীরঙ্গনাথের গোপীজনবাঞ্ছিত কৃষ্ণ-রূপটি চিরতরে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে তাঁর মানসপটে। মাধুর্যমূর্তি মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের অপার মাধুর্যের রসতরঙ্গে তাই অণ্ডাল দিনরাত রয়েছেন ভাসমান। বৃন্দাবন লীলার অনুধ্যানের ভেতর দিয়ে সর্বসত্তা তাঁর হয়ে উঠেছে প্রেমময়, মাধুর্যময়। এই মাধুর্য তাঁকে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাগল ক'রে তোলে। সারা দেহে ও মনে, সারা সত্তায়, উদ্বেল হয়ে ওঠে রাগাত্মিকা ভক্তির দুকূলভাঙা রসপ্লাবন।

অসামান্যা জাতরতিরূপে, অর্থাৎ সহজাত কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারিণী হয়ে জন্মেছেন অণ্ডাল। সেই সঙ্গে তাঁর ভেতরে বিকাশ লাভ করেছে অনন্যসাধারণ কাব্যপ্রতিভা। নিজের সাধনজীবনে যা কিছু দিব্য অনুভূতি ও লোকোত্তর মহাভাবের স্ফুরণ হয়, তখনি তা ছন্দোবদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর অনুপম কাব্যগাথায়। তাঁর নিজের রচিত প্রেমাশ্রয়ী কাব্য আর তাঁর মধুকণ্ঠ নিঃসৃত ভজন ও পদাবলী শ্রবণ ক'রে প্রবীণ ভক্ত ও আচার্যেরা অবধি বিস্মিত হয়ে যান। সবাই বলাবলি করতে থাকেন, বিষ্ণুচিত্ত আড়বারের গৃহে অচিরকাল মধ্যে অভ্যুদয় ঘটছে আর এক নূতন আড়বারের। সর্বাপেক্ষা আনন্দ ও বিস্ময়ের কথা—এই নবাগত আড়বার হচ্ছেন একজন রমণী এবং তিনি তরুণী।

অণ্ডালের প্রেমভক্তি সাধনা কৃষ্ণ-উন্মাদনা ও উত্তর জীবন বর্ণনা করার আগে দাক্ষিণাত্যের আড়বারদের সাধনা, সিদ্ধি ও দিব্য

অনুভূতিময় জীবন"ও পদাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

দাক্ষিণাত্যে পৌরাণিক ধর্ম ও ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে বহু শতাব্দী থেকে। নিম্বার্ক, মধ্ব, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি ভক্তিমার্গী আচার্যেরা সর্বভারতীয় দর্শন ও সাধনক্ষেত্রে কালজয়ী আসন গ্রহণ ক'রে আছেন। এই সব ভক্তিবাদী আচার্য ছাড়াও আর একদল ভক্তিসিদ্ধ সাধকের আবির্ভাব আমরা দাক্ষিণাত্যে দেখতে পাই, যাঁরা প্রেমভক্তি সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন, এ সাধনার ধারাকে বইয়ে দিয়েছেন জনজীবনের স্তরে স্তরে। এঁরা হচ্ছেন বহুলখ্যাত আড়বার বৈষ্ণবগোষ্ঠী। দাক্ষিণাত্যের পল্লব রাজাদের সময়ে এঁদের অভ্যুদয় ঘটে এবং সপ্তম থেকে অষ্টম শতক অবধি দু'শ বৎসর ধরে এঁদের সাধনা ও সিদ্ধিকে কেন্দ্র ক'রে ভক্তিধর্মের প্রবাহ বিস্তারিত হয়। আড়বারদের প্রভাব শুধু দক্ষিণদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, উত্তর ভারতেও তা বিস্তারিত হয়েছে। নানাভাবে সে অঞ্চলের ধর্মজীবনকে করেছে প্রভাবিত। রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য থেকে শুরু ক'রে তুকারাম, নামদেব অবধি সকল ভক্ত সাধকদের জীবনেই আড়বারদের প্রেমোন্মাদনার ছাপ কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

ভক্তিধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন আড়বার বৈষ্ণবেরা। তাঁরা ছিলেন জাতরতি, বিষ্ণুপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রেম তাঁরা লাভ করেছেন আজন্ম থেকে, এজন্য তাঁদের শাস্ত্রপারঙ্গম হতে হয় নি, বৈধীমার্গের উপাসনাও তাঁরা অনুসরণ করেন নি। ভাবময় ঐশ্বরীয় উন্মাদনার মধ্য দিয়ে হয়েছে তাঁদের পরমপ্রাপ্তি। ঈশ্বরপাগল আড়বারদের রম্য প্রতিচ্ছবি আমরা পাই ভাগবতের ভক্ত-বর্ণনায়।

> ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠ চিন্তা শবলচেতনঃ।
> ক্বচিদ্ধসতিতচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ॥
> নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ
> ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ॥

অপূর্ব এই পরম ভাগবতের ভাবশাবল্য। মিলন বিরহে মান অভিমানে প্রাণপ্রভুকে তাঁরা আস্বাদ করেন প্রাণ মন ভরে। কখনো স্তব-স্তুতিতে বিভোর, কখনো মহাভাবে উন্মত্ত, কখনো চলছে রোদন, কখনো হাস্য, কখনো বা নির্লজ্জের মতো নৃত্য। আড়বার বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রেমভক্তি ও ভাবময় সাধনার এই বৈশিষ্ট্যই মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ভক্তিশাস্ত্র বলেছেন 'প্রেমদশায়াং বৈপরীত্যেন তিষ্ঠতি'। এই পাগল করা প্রেমদশা মহাভাব অধিকাংশ আড়বারের জীবনেই করেছিল আত্মপ্রকাশ।

আড়বার শব্দটি তামিল ভাষার। আড় অর্থে নিমগ্ন, বার—যিনি থাকেন। অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমে যে সাধক সদাই থাকেন নিমগ্ন, তিনি প্রকৃত আড়বার বৈষ্ণব। তামিলদেশের ধর্মসংস্কৃতিময় জীবনে দ্বাদশ জন আড়বারের অভ্যুদয় দেখা যায়। পৌর্বাপর্য অনুসারে এঁদের তামিল নাম—পোয়্গৈ, পুদত্ত, পে, তিরুমড়িশৈ, নম্মা, মধুরকবি, পেরিয (বা বিষ্ণুচিত্ত, অণ্ডালের পালক পিতা), অণ্ডাল, তোণ্ডাপুড়ি, তিরুপ্পান, কুলশেখর ও তিরুমঙ্গই। প্রেমধর্মের পথে এঁরা অগ্রসর হয়েছেন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্তাভাবের বিভিন্ন ধারা ধরে, যাঁর যাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। এঁদের মধ্যে একমাত্র নারী সাধিকা হচ্ছেন অণ্ডাল এবং আড়বারদের মধ্যে নায়িকা ভাব বা কান্তাভাবের স্ফুরণ তাঁর ভেতরেই প্রকটিত হয়েছে সব চাইতে বেশী। পুরুষ আড়বারদের মধ্যে যে তিনজনের ভেতর নায়িকা-ভাবের কিছুটা স্ফূর্তি দেখা যায়, তাঁরা হচ্ছেন নম্মাড়বার, কুলশেখর ও তিরুমঙ্গই।

বিষ্ণু ও কৃষ্ণ—শ্রীভগবানের এই ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যময় এই দুই দিব্যরূপেরই উপাসক ছিলেন আড়বার বৈষ্ণবেরা। আর এই ঐশ্বর্য মাধুর্যময় পরমপুরুষকে লাভ করার জন্য তাঁরা ক'রে গেছেন সর্বস্ব পণ।

বৈধী অথবা রাগাত্মিকা, দাস্য-বাৎসল্য ভাব বা নায়িকা ভাব, যে ধারাই অনুসরণ করুন না কেন আড়বারদের সাধনা, জীবনদর্শন ও তত্ত্ব ভাবনার ভেতর একটা মৌলিক ঐক্য বর্তমান। জীব ঈশ্বরের

সৃষ্ট, সদা ঈশ্বর দ্বারা বিধৃত ও আশ্রিত, ঈশ্বরের সে চিরকিঙ্কর বা সেবক এবং চরমপ্রাপ্তির পর এই কৈঙ্কর্যের সৌভাগ্যই থাকে তাঁর অব্যাহত।

আড়বারদের প্রেমভক্তি পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়—প্রপত্তি, অনন্য-শরণ। তাঁদের মূল কথা হচ্ছে—"পরমাত্মা যদি সর্ব অণু পরমাণুতে অনুস্যূত হন, তবে জীবকে অনিবার্যরূপে তাঁর উপর নির্ভর করতেই হবে, তাঁকে জীবনপ্রভু ও পরমাশ্রয় বলে মেনে নিতেই হবে। উভয়ের পারস্পরিক মূল সম্পর্কটি থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে জীবকে তার চরমপ্রাপ্তি লাভ করতে হলে, করতে হবে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ আড়বারদের জীবনদর্শন অনুযায়ী প্রপত্তি বা চরম আত্ম-নিবেদনই হচ্ছে 'উপায'। এই উপায় কিন্তু জীবের আয়ত্তাধীন নয়, শুধু শ্রীভগবানই তাঁর অপার কৃপার বলে তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে সক্ষম।

সাধকের পরম পুরুষার্থ হচ্ছে পরমপ্রভুর চরণের কৈঙ্কর্য, তাই তো তাঁর চরণে আত্মনিবেদিত হয়ে থাকা ছাড়া অপর কোনো সাধনপন্থা আড়বার ভক্ত অনুসরণ করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন—প্রভুকে পাবার উপায় প্রভু নিজেই, কারণ সব কিছু কল্যাণময় দান যে তাঁর অসীম কৃপার উৎস থেকেই নিঃসৃত হয়। যে কোনো আদর্শ ও পন্থাই অনুসরণ করা হোক না কেন, দেখা যাবে যে, তাঁর থেকেই সেই পন্থা হয়েছে উদ্‌গত, তাঁর থেকেই সংগৃহীত হয়েছে পরম পাথেয়। পথ, পাথেয় ও পথিক তাঁরই সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে অবিচ্ছেদ্য যোগবন্ধনে। কাজেই শ্রীভগবানের সেবা ও কৈঙ্কর্যই যদি প্রেমভক্তি সাধনার মূল লক্ষ্যবস্তু হয়, তবে ঐকৈকনিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণ ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই।"[১]

সাধনার চরম সাফল্যের পরেও সেই একই দাস্য ও সেবার কথা। শ্রীভগবানের চির কৈঙ্কর্যের মধ্য দিয়েই ভক্তিসাধক আড়বার পেতে চান তাঁর পরম পুরুষার্থ, তাঁর সাধনার সিদ্ধি ও পরমানন্দরস।

---

১ দ্য রিলিজিয়ান অব্ দ্য আড়বার্স,—কে, শেষাদ্রি (সেমিনার অন সেইন্ট্‌স)

আড়বারদের শ্রেষ্ঠতম অবদান তাঁদের প্রেমভক্তিমূলক অজস্র পদাবলী। এগুলিতে প্রধানত রয়েছে—শ্রীভগবানের প্রশস্তি, মিলন বিরহের লীলাকাহিনী ও দিব্য অনুভূতির ব্যঞ্জনা। এই সব পদ ও গাথার সংখ্যা হবে প্রায় চার হাজার। সারা দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে এগুলি মনোরম তানলয়যোগে গীত হয়, ঝঙ্কৃত হয়, অগণিত ভক্তজনের হৃদয়তন্ত্রীতে। এই রসসমৃদ্ধ পদাবলীগুলিকে বলা হয় দিব্যপ্রবন্ধ, অর্থাৎ ভগবৎ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বা অলৌকিক প্রবন্ধ।

এসব দিব্যপ্রবন্ধের ভেতর নম্মাড়বারের (শঠকোপ স্বামী) মূল্য ও মর্যাদা হচ্ছে সব চাইতে বেশী। তাঁর রচিত তিরুবিরুত্তম, তিরুবাসিরিয়ম, পেরিয় তিরুবন্দাদি এবং তিরুবায়মোড়ি নামক প্রবন্ধ বিশ্বের প্রেমভক্তি সাহিত্যে কালজয়ী আসন অধিকার ক'রে থাকবে।

নম্মাড়বারের এই চারটি প্রবন্ধকে শ্রীবৈষ্ণবেরা বলে থাকেন তামিল পরিচ্ছদে ঘেরা চতুর্বেদ। ভক্ত নম্মাড়বারের শ্রেষ্ঠতম প্রবন্ধ তিরুবায়মোড়িকে প্রসিদ্ধ আচার্য বেদান্তদেশিক উল্লেখ করেছেন দ্রাবিড়োপনিষদ বলে। তাঁর রচিত গ্রন্থ দক্ষিণী বৈষ্ণবদের আচার আচরণ ও ধর্মজীবনের উজ্জীবনে যে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে তা আর কোনো ভক্তসাধকের রচনার মাধ্যমে সম্ভব হয় নি।[১]

নম্মাড়বারের আর এক অবদান রয়েছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ওপর। শ্রীবৈষ্ণবেরা এ সত্যটি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন যে, নম্মাড়বারের অধ্যাত্ম উপলব্ধিই ভক্তিবাদের সাথে বেদ-বেদান্তের কতকগুলি প্রধান ভাবধারার সমন্বয় সাধনে সাহায্য করেছে ও তার ফলে পরবর্তীকালের ভক্তিবাদী আচার্যেরা সমর্থ হয়েছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভিত্তি গঠনে।[২] রামানুজ যে তাঁর শ্রীভাষ্য রচনার কালে শূন্যবাদ খণ্ডন করেছিলেন

১ হিস্টরিক্যাল ইভোল্যুশান অব্ শ্রীবৈষ্ণবিজ্‌ম্ ইন সাউথ ইণ্ডিয়া—ডি রঙ্গচার্য—কালচারাল হেরিটেজ অব্ ইণ্ডিয়া।

২ ঐ—ঐ

নম্মাড়বারের যুক্তি উপলব্ধ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, তার প্রমাণ রয়েছে।

আড়বারদের মধ্যে রয়েছেন উচ্চ নিম্নবর্ণের সর্বস্তরের লোক, রয়েছেন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, অভিজাত ও অন্ত্যজ, রাজা ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নারী আড়বারও রয়েছেন। সাধনা ও সিদ্ধির বলে এঁরা সবাই জনচিত্তে লাভ করেছেন অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন।

দীনহীন কাঙাল অন্ত্যজ এবং পরম পাষণ্ডীদের জন্যও এঁরা নিয়ে এসেছেন পরম আশ্বাস ও আশার বাণী। জীব মাত্রেই ঈশ্বরের অংশ, তাঁর নিত্যদাস, তাঁর সেবার অধিকারী—এই উদার মহাবাণী মানুষের চেতনার সমক্ষে উদ্ঘাটিত করেছে সাধনার এক সর্বজনীন রূপ।

শুধু জনসাধারণেই নয়, নৈষ্ঠিক শ্রীবৈষ্ণব সাধকদের নমস্য হয়েছেন এঁরা। নাথমুনি যামুনাচার্য, রামানুজ প্রভৃতির মতো দিক্‌পাল আচার্যেরা এই পরম ভাগবতদের মেনে নিয়েছেন শ্রীবিষ্ণুর আয়ুধ ও আভরণের অবতাররূপে। এ থেকে বুঝা যায়, প্রেমভক্তি ধর্মের ক্ষেত্রে আড়বারদের প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রম কি বিপুল পরিমাণ ছিল। এই সব মহা-ভাগবতদেরই অন্যতম হচ্ছেন আমাদের অণ্ডাল বঙ্গনায়কী।

পূর্বসূরী আড়বারদের ঐতিহ্যের ধারা বহন ক'রে এগিয়ে এসেও অণ্ডাল আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নিজস্ব ভঙ্গীতে ও স্বকীয় মহিমায়। পরম প্রভু রঙ্গনাথের প্রেমিকারূপে জীবনসাধনা তিনি শুরু করেন। রঙ্গনাথের লীলাপর মোহন রূপটির হন তিনি অনুরক্তা—মাধুর্যমূর্তি কৃষ্ণের অনুধ্যানে একান্তভাবে হন বিভোর। রঙ্গনাথ আর কৃষ্ণ একাকার হয়ে যায় তাঁর সাধনোজ্জ্বল দৃষ্টিতে। মধুর সাধনার অমৃত তরঙ্গে দিনের পর দিন চলে তাঁর রসবিলাস। রঙ্গনাথের নায়িকাভাবে বিভাবিত, তাঁর কৃপা ও প্রেমরসে নিষিক্ত অণ্ডাল সাধকসমাজে পরিচিত হন অণ্ডাল রঙ্গনায়কী নামে।[১]

১ হিস্টরিক্যাল ইভোল্যুশান অব্ শ্রীবৈষ্ণবিজ্‌ম ইন সাউথ ইণ্ডিয়া—রঙ্গাচার্য—কালচারাল হেরিটেজ, ভল্যু ২

আড়বারদের ভাগবত জীবন ও ভাবোন্মাদনা থেকেই অণ্ডাল সংগ্রহ করেছিলেন সাধন-জীবনের প্রাণরস। কিন্তু ঐ আড়বারদের অধিকাংশই ছিলেন বৈধীভক্তি অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতির অনুসারী। এদের এই ঐতিহ্য ও পরিবেশ সত্বেও অণ্ডাল কি ক'রে বেছে নিলেন তাঁর নিজস্ব পথ—কৃষ্ণপ্রেম ও কান্তা-ভজন? রাগাত্মিকা ভক্তিরসে কি ক'রে তিনি এমন নিমজ্জিত হলেন? গোপীদের মতো হলেন কৃষ্ণ-উন্মাদিনী?

অণ্ডালের এই জীবন-বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে তাঁর সহজাত কৃষ্ণপ্রেম, তাতে সন্দেহ নেই। তদুপরি রয়েছে পিতা বিষ্ণুচিত্ত ও নম্মাড়বারের শিক্ষা প্রেরণা ও প্রভাব। তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যের ভক্তসমাজে শ্রীমদ্‌ভাগবতের জনপ্রিয়তা ছিল প্রচুর। পিতার কাছ থেকেই অণ্ডাল ভাগবতের পাঠ নিয়ে ছিলেন, তারপর থেকে ধীরে ধীরে ভাগবতের মাধুর্যময় কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত হন তাঁর হৃদয়াসনে। অর্চাবতার প্রভু শ্রীরঙ্গনাথ আর কৃষ্ণ একাকার হয়ে যান তাঁর সাধনসত্তায়। রঙ্গনাথরূপী কৃষ্ণকে গ্রহণ করেন তিনি ইষ্টরূপে।

শ্রীকৃষ্ণ জীবনকে কেন্দ্র করে আচার্য বিষ্ণুচিত্ত স্বয়ং কতকগুলো রসস্নিগ্ধ গাথা বা প্রবন্ধ রচনা করেন। ভাবের ব্যঞ্জনায় ও রসের স্ফূর্তিতে এই গাথাগুলো তামিল ভক্তিসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। এইসব কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণ প্রশস্তি তরুণী অণ্ডালকে কম প্রেরণা যোগায় নি।

অণ্ডালের জীবনে কৃষ্ণপ্রেমের ধারা সঞ্চারিত করতে সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত নম্মাড়বারও (শঠকোপ স্বামী) যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। নম্মাড়বার আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীবিল্লিপুত্তুরেরই অঞ্চলে, তাঁর উৎসারিত ভক্তিপ্রেমের ধারা তাই অণ্ডালের সাধন-জীবনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। নম্মাড়বারের কৃষ্ণনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। প্রতিটি দিনচর্যা ছিল তাঁর কৃষ্ণময়, তাঁর জীবনেরও শ্রেষ্ঠ অভীপ্সা ছিল কৃষ্ণকে সুখ দেবার জন্য, তৃপ্তি দেবার জন্য, জীবন ধারণ করা। নিজের মুক্তির জন্য নয়, দিব্য আনন্দের জন্য নয়—

কৃষ্ণপ্রেমে বিভাবিত হয়ে, কৃষ্ণদাস্য গ্রহণ ক'রে কৃষ্ণসেবায় দিনাতিপাত কবাই ছিল তাঁব চিবকাম্য।[১]

পিতা বিষ্ণুচিত্ত ও নম্মাড়বাবেব এই কৃষ্ণপ্রীতি অণ্ডালেব জীবন-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয কৃষ্ণবসেব দিব্য প্রবাহ। এই প্রবাহ তাঁকে ভাসিযে নিযে যায় গোপীপ্রেমেব মহাসাগবে।

সাধিকা অণ্ডালেব জীবনে এসেছে মধুব বসেব জোয়াব। অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে এসেছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে মদীয়তা ভাব। আমি তাঁব, তা নয়, তিনিই আমার—এই তত্ত্বভাবনা ওতপ্রোত হয়েছে তাঁব সমগ্র সত্তায়। মধুর বস-সাধনাব এই স্তরে যখন অণ্ডাল বিচবণ কবছেন তখন হঠাৎ সেদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'বে ভক্তজনসমাজে উদ্‌ঘাটিত হয এই তরুণী সাধিকাব প্রেমঘনরূপ।

ভজনকুটিবে বসে সেদিন পিতা-পুত্রীতে মালা গেঁথে চলেছেন শ্রীবিগ্রহেব জন্য। বিষ্ণুচিত্তের মনে জেগেছে এক বিশেষ সংকল্প, প্রভুকে আজ একটা অভিনব ধবনেব মালতীব মালা তিনি অর্ঘ্য দেবেন। নিপুণ হস্তে বাছা বাছা ফুল নিযে, নিখুঁত ক'বে এটি শেষ করলেন। নযনলোভন পুষ্পমালা। একদৃষ্টে এটি নিবীক্ষণ ক'বে বিষ্ণুচিত্তেব অন্তব তৃপ্তি ও আনন্দে ভবপুব হয়ে উঠল। প্রভুব কণ্ঠে এ মালা আজ কি অতুলনীয শোভাই না ধাবণ কববে।

হাতের কাজ শেষ হযেছে। সাজিটি একপাশে সবিযে বেখে বিষ্ণুচিত্ত অণ্ডালকে বললেন, "মা, তুমি এখানে অপেক্ষা কবো। আমি একটু বাইবে যাচ্ছি, এখনই ফিবে আসবো. তাবপব মালাব সাজি নিযে দুজনে যাবো শ্রীমন্দিবে।"

বিষ্ণুচিত্ত চলে গিযেছেন ভজনকুটিব ছেড়ে। স্তূপীকৃত ফুলের মালা একে একে সাজিতে গুছিযে রাখেন অণ্ডাল। অন্তবপটে

---

১ হিস্টবিক্যাল ইভোল্যুশান অব্ বৈষ্ণবিজ্‌ম—বঙ্গাচার্য: কালচাবাল হেরিটেজ, ভল্যু ২

বাব বাবই কেবল ভেসে ওঠে পুষ্পমালায সুশোভিত কৃষ্ণেব মদন-মোহন ৰূপ। গোপীভাবে বিভাবিত হযে, বসাবিষ্ট হযে, অণ্ডাল ভাবতে বসেন—'কৃষ্ণকে সাজিযে আমাব অন্তবেব আনন্দ উপচে পডছে, কিন্তু তাব চেয়ে যে অনেক বেশী বড কাজ—কৃষ্ণেব আনন্দ বিধান। এ দেহ কৃষ্ণে সমর্পিত। তাহলে এ দেহেব ৰূপ-লাবণ্য ও মাল্যসজ্জাই যে উৎসাবিত কববে প্রাণপ্রিয প্রভুব তৃপ্তি ও আনন্দ। কৃষ্ণকে উপভোগ করাব চাইতে কৃষ্ণকে উপভোগ কবানোই যে মধুব বসসাধনাব মূল কথা। এই সাধনাই যে প্রেমিকাশ্রেষ্ঠ গোপীবা দেখিযে গেছেন।'

ভাবাবেশে অধীর হযে, বিষ্ণুচিত্তেব সযত্নে গাঁথা মালতীব মালা-ছডা অণ্ডাল তুলে নেন, পবমানন্দে দুলিযে দেন নিজেব গলায। এ মালা যে শ্রীবিগ্রহেব জন্য সংকল্পিত, বিস্মৃত হন সে কথা। এমন ভাবাবেগ, এমন বিস্মৃতি আজকাল প্রায বোজই হচ্ছে। গোপনে ঠাকুবেব মালা তিনি পরে ফেলেছেন। কিন্তু আজ যেন তাঁব হৃদযে এসেছে প্রেমবসেব এক দুর্বাব জোযাব। গোপনতাব আডালও বাখতে মন চায না।

সুন্দব সুঠাম, যৌবন ঢলঢল দেহে ঢেউ খেলে যায দীর্ঘাযত শুভ্র মালাব গুচ্ছ। অণ্ডালেব সাবা দেহ-মন ওঠে ঝলমলিযে। কৃষ্ণ-প্রেমিকা, কৃষ্ণবল্লভাব লীলা স্ফুবিত হযেছে তাঁব মানসলোকে। তাই তো নিজেব অনিন্দ্যসুন্দব, লাবণ্যময দেহটিকে মাল্য সজ্জিত ক'বে বাব বাব ঘুবিযে ঘুবিযে দেখছেন। আব ভাবছেন, 'এ দেহ তো আমাব নয। এ ৰূপ যৌবন, মাল্যভূষা, এ দুকূল ভাঙা প্রেম, এ সব তো আমাব নিজেব কিছুই নয, এ সব যে নওল কিশোব নীলমণিব, যাঁকে অধিষ্ঠিত কবেছি হৃদযেব বাসমঞ্চে।'

এ ভাবাবেশ ও প্রেমমত্ততাব মাঝে সেদিনকার ঐ মালা পবিধান এক মস্ত কাণ্ড বাধিযে বসল।

কাজ সেবে বিষ্ণুচিত্ত গৃহে ফিবে এসেছেন। দেবি হযে গেছে। ঠাকুবেব মালা-চন্দন-তুলসী এখনি গুছিযে নিতে হবে। তাডাতাডি

এসে দাঁড়ালেন ভজনকুটিবেব সম্মুখে। কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড। অণ্ডাল এ কি কবেছে ? এমন অসতর্ক অবাঞ্ছিত আচবণ তো সে আগে কখনো করে নি। শ্রীবিগ্রহেব জন্য যে মালা আচার্য এত সাধ ক'বে গেঁথেছেন, কি ভেবে অণ্ডাল তাব নিজেব গলায পবেছে ?

"অণ্ডাল, অণ্ডাল, এ কি দুঃসাহস তোমাব ? যে মালা এত যত্নে প্রভুব জন্য গাঁথা হযেছে, তা তুমি এভাবে নষ্ট কবলে।"—তিবস্কাব-পূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন বিষ্ণুচিত্ত।

ভাবাবেশে অণ্ডালেব নযন অর্ধ-নিমীলিত। পবমানন্দে মাল্য বিভূষিতা হযে চিত্রার্পিতেব মতো তিনি বসে আছেন। পিতাব কঠোব স্ববে হুঁশ ফিবে এল, লজ্জিত হযে তাড়াতাড়ি গলা থেকে মালা খুলে ফেললেন।

বিষ্ণুচিত্ত ভেবে নিলেন, কোনো কাবণে কন্যা তাঁব চিত্তেব স্থৈর্য ও সহজ ঔচিত্য বোধ হাবিযে ফেলেছে। এ অবস্থায আব তাঁকে তিবস্কাব ক'বে লাভ কি ?

বিষাদখিন্ন হৃদযে আচার্য তখনি ছুটে গেলেন উপবনে। আবাব একবাশ ফুল সংগ্রহ ক'বে তখনি গাঁথলেন প্রভুব মালা। তাবপব মন্দিবে গিযে এই নূতন মালা পবিযে দিলেন শ্রীবিগ্রহেব গলে, চবণতলে ঢেলে দিলেন পুষ্পার্ঘ্য।

সজল চক্ষে মিনতি ক'বে বিষ্ণুচিত্ত বললেন, "প্রভু, কন্যা আমাব অবুঝ বালিকা, ভুল ক'বে তোমাব মালা উচ্ছিষ্ট কবেছে। কৃপা ক'বে তাব অপবাধ নিও না। আমি নিজে পবম পবিত্রভাবে এই মালার্ঘ্য তৈবি ক'বে এনেছি, প্রসন্ন হযে এ তুমি গ্রহণ কবো।"

আগ্রহাকুল হযে বিগ্রহেব মুখেব দিকে আচার্য দৃষ্টি নিবদ্ধ কবলেন। কিন্তু কই, নিত্যকাব মতো প্রসন্নতাব আভা তো তাতে আজ নেই। তবে ?

হঠাৎ প্রভুব গলদেশ থেকে ছিঁড়ে পড়ে আচার্যেব প্রদত্ত মালাব গুচ্ছ। একি অমঙ্গলেব চিহ্ন আজ। প্রভু তো তাঁব দেওযা অর্ঘ্য গ্রহণ কবলেন না। আচার্য আর্তস্ববে হায হায ক'বে উঠলেন।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "প্রভু, কন্যা আমার মস্ত অপরাধ করেছে, তুমি তাকে মার্জনা করো। কাল থেকে পবিত্র, মনোরম পুষ্প আমি সংগ্রহ করবো, তোমার মাল্য উপচার নিশ্চয় হবে তোমার মনের মতো।"

বিগ্রহের চরণে বার বার মিনতি জানিয়ে বিষ্ণুচিত্ত মন্দিরকক্ষ থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ অদূরে দৃষ্টি পড়ল এক প্রিয়-দর্শন, শ্যামল কিশোরের ওপর। স্মিতহাস্যে আচার্যকে সে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কি যেন তাঁকে বলতে চায়।

এগিয়ে যেতেই কিশোর সরে যায় পার্শ্বস্থিত এক কক্ষে। তারপর হঠাৎ অন্তর্হিত হয় স্তম্ভের আড়ালে।

বিস্মিত বিষ্ণুচিত্ত আরো বিস্মিত হয়ে যান মৃদুকণ্ঠের দৈববাণী শুনে। স্তম্ভের ওপাশ থেকে আওয়াজ আসে, "বিষ্ণুচিত্ত, রোজ রোজ যে মালা তুমি আমায় পরিয়ে যাও, তা কোথায়?"

আচার্য বুঝলেন, এ তাঁর লীলাময় ইষ্টের এক নতুন অলৌকিক লীলা। করুণ স্বরে নিবেদন করলেন, "প্রভু, যে মালা প্রত্যূষে গেঁথেছিলাম তা আমার কন্যা গলায় পরে করেছে উচ্ছিষ্ট। তাই তো আবার তৈরি ক'রে এনেছি এই নতুন মালা।"

"তা তোমার কন্যা তো রোজই অমন করে। তুমি তার কোনো খোঁজ রাখ না তাই। কিন্তু তোমার মেয়ের গলায়-পরা মালাই যে আমায় প্রসন্ন করে বেশী। তাতেই যে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। না—আচার্য, তুমি রোজকার মতো মালাই আমায় দিও।"

"কিন্তু প্রভু, সব জেনেশুনে আমি কি ক'রে ঐ উচ্ছিষ্ট মালা তোমায় দিই?" ভীত কণ্ঠে উত্তর দেন আচার্য বিষ্ণুচিত্ত।

"না গো—না। তুমি তো জানো না, সে আমার প্রীতির জন্যই নিজেকে রোজ সাজায় আমার মালা দিয়ে। গলায়ই শুধু পরে না, দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেয়ে দেখে নিজের অঙ্গশোভা। নিজের উপভোগের দিকে না তাকিয়ে সে বড় ক'রে দেখে আমারই উপভোগকে, আমারই আনন্দকে। তাই তো তার সাথে আমার

এমনতব একাত্মকতা। তাই তো তার গলাব মালা আমাব কাছে উচ্ছিষ্ট হবে, সে প্রশ্ন কখনো ওঠে না। আমায় শ্রদ্ধাব মালা না দিযে অণ্ডালের ঐ প্রেমেব মালাই বোজ আমাব জন্য এনো!”

বিষ্ণুচিত্তেব নযন বেযে দবদব ধাবে বিগলিত হয পুলকাশ্রু। যুক্তকবে গদ্‌গদ কণ্ঠে ইষ্টদেবকে উদ্দেশ ক'বে বলেন, “প্রভু, তোমাব লীলা বুঝবে, সে সাধ্য কাব? আজ থেকে বুঝলুম, আমাব কন্যা পবম সৌভাগ্যবতী, তোমায প্রেমেব বাঁধনে বাঁধবার সামর্থ্য সে অর্জন কবেছে। বেশ প্রভু, তোমাব ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আজ থেকে তাব পবিহিত মালাই আমি নিবেদন ক'বে যাবো।”

ঠাকুবেব প্রত্যাদেশ ও অণ্ডালেব মধুব সাধনেব অভাবনীয সাফল্যেব কাহিনী অল্পকাল মধ্যে শ্রীবিল্লিপুত্তবে ব্যাপ্ত হযে পড়ে। সাধাবণের কাছে অণ্ডাল পরিচিতা হযে ওঠেন প্রভুব কৃপাধন্যা ভক্ত সাধিকারূপে। বিশিষ্ট ভাগবতগণও স্বীকৃতি দান কবেন তাঁর প্রেম-সাধনার সিদ্ধিকে। এই তরুণী সাধিকার এক নূতন নামও তাঁবা প্রদান কবেন। সে নামটি হচ্ছে—সুদিক্কোডুথ নাচ্চিযাব[1]—অর্থাৎ যে নাযিকা নিজের ব্যবহৃত মালিকা পবিযেছিলেন তাঁব প্রাণপ্রভুর গলায। এই নাম ও এই পবিচয় তরুণী সাধিকা অণ্ডালেব খ্যাতিকে আবো ব্যাপক ক'বে তোলে।

এব পব থেকে অণ্ডালের প্রেমভক্তি সাধনা প্রবাহিত হতে থাকে গভীবতব খাতে। প্রেমাবেশ, পূজা অর্চনা ও ধ্যান ভজনেব মধ্যে নিজেকে তিনি ডুবিযে বাখেন দিন বাত।

বিষ্ণুচিত্ত ও বীরাজয বড শঙ্কিত হযে ওঠেন। অণ্ডাল এখন পূর্ণযৌবনা, সাধনভজন যাই সে করুক, বিয়েব ব্যবস্থা তো একটা কবতেই হবে। গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন ক'বেও তো কম সংখ্যক সাধক ঈশ্ববলাভ কবেন নি। স্বামী স্ত্রীতে মিলে একদিন অণ্ডালকে

১ অণ্ডাল—পি, শঙ্কব নাবায়ণ—সেমিনাব অব্‌ সেইণ্ট্‌স।

চেপে ধরলেন, "বললেন, বয়স হয়েছে, এবার তোমার বিয়ে করা দরকার। তুমি মত দাও, আমরা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করি।"

দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্ট জবাব দেন অণ্ডাল, "সে জন্য তোমরা একটুও ব্যস্ত হয়ো না। আমার পতির সন্ধান যে আমি পেয়েছি। পরম প্রভু রঙ্গনাথ ছাড়া আর কাউকে আমি বরণ করবো না। যতদিন বেঁচে থাকবো, রঙ্গনাথের কৃষ্ণরূপ ও কৃষ্ণসত্তার ভজনই হবে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। কোনো মানুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না. সে চেষ্টা তোমরা কখনো ক'রো না।"

এবার শুরু হল কৃষ্ণপ্রাপ্তির আসল প্রস্তুতি। গোপীরা কাত্যায়নী ব্রত ক'রে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে কান্তরূপে লাভ করেছিলেন। অণ্ডাল স্থির করলেন, অনুরূপ ব্রত তিনিও উদ্‌যাপন করবেন, প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের মিলনকে করবেন ত্বরান্বিত।

গোপীদের মতো মার্গলি মাসেই করলেন অনুষ্ঠান—তিরুপ্পাবৈ। তামিল শব্দ তিরু অর্থে—শ্রী, আর পাবৈ হচ্ছে ব্রত। এই পবিত্র শ্রীব্রতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় অণ্ডালের কৃষ্ণপ্রেম-রসাশ্রিত অপূর্ব গাথাসমূহ। রাগাত্মিক বা মধুর ভজনের যে পরাকাষ্ঠা গোপীরা দেখিয়ে গিয়েছেন, তারই অনুসৃতি দেখা যায় অণ্ডালের তিরুপ্পাবৈ প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধের গাথাগুলো শুধু প্রেমমধুরই নয়, এগুলোর ভেতর কবিত্ব প্রতিভার বলিষ্ঠ স্বাক্ষরও রয়েছে।

কাত্যায়নী ব্রত উদ্‌যাপনে গোপীরা একমাস কঠোর কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন করেছিলেন। অণ্ডালও তার তিরুপ্পাবৈ ব্রত সাধনে নিষ্ঠা ও ত্যাগ বৈরাগ্য দেখিয়েছেন। শ্রীবিল্লিপুত্তুরের সকল কুমারীদের তিনি শেষ রাত্রে জাগ্রত করতেন। কৃষ্ণস্তুতি ও কৃষ্ণকাহিনী শুনিয়ে তারপর শীতের শেষ রাত্রে, সবাই মিলে নদীতে করতেন অবগাহন স্নান। বালুকাময় কৃষ্ণমূর্তিও রচনা ক'রে তাঁর ভজনে কেটে যেত এই কুমারীদের প্রহরের পর প্রহর। কৃষ্ণমিলন ও কৃষ্ণবিরহ, মান অভিমান ও প্রেমতপস্যার নানা কাহিনী অণ্ডালের ব্রত গাথা তিরুপ্পাবৈর মধ্যে বিধৃত রয়েছে।

তাঁর রচিত কৃষ্ণানুরাগে ভরা প্রবন্ধ-গ্রন্থ নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি তাঁর প্রতিভার আরো উজ্জ্বলতর স্বাক্ষর বহন করে। দুঃখের বিষয় এই মধুর পদাবলীর কতকগুলি অংশ আজ দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

তিরুপ্পাবৈ ও নাচ্চিয়ার তিরুমোড়িতে অণ্ডালের কৃষ্ণভজন ও গোপীভাবের অপরূপ প্রকাশ দেখা যায়। এই গ্রন্থ দুটি পদাবলী তাঁর রাগাত্মিকা ভক্তিসাধনার সুস্পষ্ট সাফল্যের পরিচয় দেয়।

অণ্ডালের সঙ্গে গোপীদের ব্রজরস সাধনার অর্থাৎ নায়কীভাবের কিছুটা পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, ব্রজগোপীদের সাধনপন্থার সঙ্গে আড়বারদের পার্থক্য যথেষ্ট। এ সম্পর্কে তামিল ভক্তিসাহিত্যের ব্যাখ্যাতা শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাসের বক্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লিখেছেন, "গোপীগণের নায়কীভাব সর্বত্র পরকীয়া। আড়বারগণের নায়কীভাব, তাহাদের অবস্থাবিশেষে, কোথাও স্বকীয়া—কোথাও বা পরকীয়া ভাবটি সুস্পষ্ট। পরকীয়া অপেক্ষা স্বকীয়া ভাবটি ব্যক্ত। তাঁহাদের নায়িকাভাবের এমন অনেক স্থল আছে যেখানে তাঁহাদের আকুলতা এবং আর্তি এত অধিক যে স্বকীয়া বা পরকীয়া ভাব নিশ্চয়রূপে ধারণা করা কঠিন। গোপীগণের পরকীয়া ভাবের ভাবনায় যে নিরবচ্ছিন্নতা এবং আতিশয্য, যে বৈলক্ষণ্য এবং বৈচিত্র্য—আড়বারগণের স্বকীয়া নায়কীভাবেও সে সমস্তই বহুলাংশে পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দেশকাল উপযোগী দু'একটি অতিরিক্ত ব্যাপারও আড়বারগণের নায়িকাভাবের আচরণে দেখা যায়। যেমন—নায়িকার মডল গ্রহণ ব্যাপারটি। আড়বার-গণের স্বকীয়া এবং পরকীয়া উভয় ভাবেই বিরহ অবস্থাটির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিরহিণী অবস্থায় চিন্তা, জাগরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাধি, মূর্ছা, এমন কি দশম দশার মৃত্যুর উদ্যম অবধি সকল দশারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠা, বাসকসজ্জা, আক্ষেপ দূতীপ্রেরণ এমন কি অধিরূঢ় দিব্যোন্মাদন দশাও তাঁহাদের এই বিরহ অবস্থায় প্রকট দেখা যায়।"[১]

১ শ্রীব্রত (তিরুপ্পাবৈ) শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস।

অণ্ডালেব নাযিকাভাবেব বিশেষত্ব হচ্ছে স্বকীয়া নায়িকা ভাব। কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ কবাব জন্যই তিনি বাগাত্মিকা সাধনে ব্রতী হযেছিলেন। কিন্তু তাঁব সাধনাব সর্বস্তরে তিনি অনুকবণ কবেছিলেন গোপীদেব পবকীযা নাযিকাভাবকে। তাঁব জীবনে তাই নৈষ্ঠিকতাব সঙ্গে সমন্বিত হতে দেখি বাগাত্মিকা ভক্তিব অমূল্য সম্পদ। খুব কম সংখ্যক ভক্তিসিদ্ধ সাধিকাব জীবনেই এই সমন্বয়েব পবিচয মেলে।

শুধু ভাবময অনুধ্যানে ও মানস-মিলনে অণ্ডালেব কৃষ্ণবিবহেব উপশম হচ্ছে না, হৃদযে তাঁব অহর্নিশি জ্বলছে তুষের আগুন। কন্যার এই অবস্থা দেখে আচার্য বিষ্ণুচিত্ত বড উদ্বিগ্ন হযে উঠলেন। কি ক'রে তাব হৃদযেব শান্তি আব স্থৈর্য ফিবিযে আনা যায, তা তিনি বুঝে উঠতে পাবছেন না। স্থান পবিবর্তন কবলে হয়তো মনেব অবস্থা কিছুটা ভাল হতে পারে, এই ভেবে আচার্য তাঁকে মালিবণ-পিল্লই নামক এক নিরিবিলি স্থানে সঙ্গে নিযে গেলেন। প্রাচীন এক গোবিন্দ মন্দিব এখানে বিরাজিত। চাবিদিকে বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান, পিক কাকলীতে তা সদা এটি মুখবিত। নিকটস্থ সরোবরে অজস্র জলকমল ফুটে আছে থবে থবে। কিছুদিন এ মনোরম পরিবেশে থাকা হল, কিন্তু অণ্ডালেব আর্তি ও উৎকণ্ঠা হ্রাস পাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

আচার্য এব পবে কন্যাকে নিয়ে উপনীত হন প্রসিদ্ধ তীর্থ তিরুপতি পর্বতে। অণ্ডালেব মানসিক অবস্থা কিন্তু বযে গেল পূর্ববৎ। ভাবোন্মাদনা বেড়েই চলল।

বিষ্ণুচিত্ত অবশেষে স্থিব কবলেন এদিকে ওদিকে আব ঘোবাঘুবি কবা নয, এবাব শবণ নেবেন ইষ্টদেব, প্রভু বঙ্গনাথের চবণে। কন্যাকে সঙ্গে নিযে কিছুদিন শ্রীবঙ্গমে গিযেই তিনি অবস্থান কববেন।

শ্রীবঙ্গমেব ভক্তসমাজে বিষ্ণুচিত্তেব—পেবিয আড়বাবেব—প্রচুর জনপ্রিযতা। অনেকেই এসে পিতা-পুত্রীকে জানালেন সাদব সংবর্ধনা। স্থানীয এক বিশিষ্ট ভক্তেব উদ্যান-বাটিকায় তাঁদেব বসবাসেব ব্যবস্থা কবা হল।

রঙ্গনাথজীর দর্শনের জন্য অণ্ডাল অধীর হয়েছেন। পিতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি উপনীত হলেন শ্রীমন্দিরে। দর্শনমাত্রেই সমগ্র সত্তায় নূতন ক'রে জেগে উঠল আলোড়ন, অণ্ডাল অধীর হয়ে পড়লেন মহাভাবের উন্মাদনায়। সম্মুখে এই তো তাঁর পরম প্রভু, তাঁর ইষ্ট, তাঁর দয়িত—প্রাণনাথ। বটপত্রশায়ী অর্চাবতার বিগ্রহের পরম মধুর কৃষ্ণরূপ বিলসিত হয়ে উঠল তাঁর মানসনেত্রে। নওল কিশোরের রঙ্গলীলার তরঙ্গে তরঙ্গে হলেন ভাসমান। অন্তরের অন্তঃপুরে শুরু হল রসব্রহ্মের অনাস্বাদিতপূর্ব রসলীলা।

অণ্ডালের প্রেমসিদ্ধ দেহে একের পর এক উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। ক্রমে তাঁর সর্বসত্তা একাত্ম হয়ে যায় প্রভু রঙ্গনাথের সাথে। একেবারে সংবিৎহারা হয়ে বেদীর সম্মুখে তিনি লুটিয়ে পড়েন।

মন্দিরের দর্শনার্থীরা হতবাক্ হয়ে নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন এই প্রেমঘন, মহিমাময়ী তরুণীর দিকে। পেরিয় আড়বারের, আচার্য বিষ্ণুচিত্তের, এই কন্যা-সৌভাগ্যের কথা সোৎসাহে সবাই বলাবলি করতে থাকেন॥

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে প্রাণবল্লভ রঙ্গনাথের পীঠস্থান রঙ্গক্ষেত্রে অণ্ডাল উপনীত হয়েছেন। এই পরম পবিত্র স্থান ত্যাগ ক'রে আর কোথাও যাবার তাঁর ইচ্ছে নেই। দিন অতিবাহিত হচ্ছে দিব্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে, প্রভুর অনুধ্যান, নামকীর্তন ও দর্শনে সময় কি ক'রে কেটে যায় সেদিকে হুঁশ থাকে না।

কিন্তু যে পরম মিলনের জন্য অণ্ডাল এতদিন এত কৃচ্ছ্র, এত তপস্যা ক'রে এসেছেন, সহ্য করেছেন দয়িত বিরহের দুঃসহ জ্বালা, সে মিলন ঘটে উঠছে কই? অণ্ডালের ধৈর্যের বাঁধ এবার টুটবার উপক্রম হয়। প্রাণপ্রিয় রঙ্গনাথকে পতিরূপে প্রাপ্ত না হলে নিশ্চয় এ দেহ তিনি বিসর্জন দেবেন কাবেরীর জলে।

বিপ্রলব্ধা নায়িকা হয় এবার হবেন প্রিয় মিলন সৌভাগ্যবতী, নয়তো, আত্মঘাতিনী হয়ে জুড়াবেন সমস্ত কিছু দহনজ্বালা।

দয়িত বঙ্গনাথেব সেদিন বুঝি টনক নড়ে। কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ হয অণ্ডালেব দিকে, ঝবে পড়ে সঞ্জীবনী প্রেমেব প্রবাহ। বাত্রে অণ্ডাল স্বপ্নযোগে দর্শন কবেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। পবম প্রভু বঙ্গনাথজী ববেবেশে দণ্ডাযমান, মাথায বত্নখচিত টোপব, গলায় জুঁই চামেলীব মালা, পবনে বহুমূল্য সাজপোশাক। চাবদিক লোকে-লোকাবণ্য। আলোয আলোময হয়ে গিয়েছে সমগ্র বিবাহবাসব। সখীবা সবাই মিলে অণ্ডালকে সযতনে সাজাচ্ছে নববধূবেশে। এই আনন্দময পবিবেশে, হাসি আনন্দ হৈ-হুল্লোড়েব ভেতব অণ্ডালেব বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হল।

স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু সাবা বাত আনন্দেব উচ্ছলতায় অণ্ডালেব ঘুম আব আসে না। পবদিন ভোবে শয্যা ত্যাগ কবাব পরও ঐ আনন্দেব আবেশ জড়িয়ে থাকে তাব দেহে মনে সর্ব অস্তিত্বে। কিন্তু বাতেব ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত অণ্ডাল কাৰুব কাছেই প্রকাশ কবলেন না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। কুটিবেব এক কোণে বসে বিষ্ণুচিত্ত সেদিন সবেমাত্র ভজন ও উপাসনা শেষ কবেছেন। হঠাৎ অঙ্গনেব বাইবে শোনা গেল তুমুল জনকোলাহল। এগিয়ে গিয়ে আচার্য দেখেন এক অপূর্ব মনোবম দৃশ্য। প্রভুব বঙ্গনাথজীব প্রতীক বিগ্রহকে চতুর্দোলায চড়িয়ে শোভাযাত্রা ক রে ভক্তেবা সোৎসাহে এগিয়ে আসছেন। পবম বম্য সাজে ঠাকুবকে সজ্জিত কবা হয়েছে। আলো আব বাদ্যভাণ্ডে আকাশ-বাতাস সবগবম।

সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আচার্য ভাবছেন, 'কিসেব এই উৎসব সমাবোহ? আজকেব দিনে বঙ্গনাথজীব কোনো পুজো বা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে তো শুনি নি?'

এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন কবতেই বঙ্গনাথেব এক প্রবীণ সেবক উত্তব দিলেন, "সে কি আচার্য, আপনি কি এ আনন্দ সংবাদ জানেন না? কেউ আপনাকে কিছু বলে নি।"

"না ভাই। ব্যাপাবটা আমায় খুলে বল তো। মনে হচ্ছে, প্রভু বঙ্গনাথ বিজয়ে বাব হয়েছেন। কিন্তু আজকেব দিনে উপলক্ষটি কি?"

"আপনার গৃহেই যে প্রভু শুভাগমন করছেন। গতকাল গভীর রাতে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ও সেবকরা সবাই স্বপ্নযোগে এক বিচিত্র প্রত্যাদেশ পেয়েছেন। প্রভু জানিয়েছেন,—তিনি আপনার কন্যা, সার্থকনামা সাধিকা অণ্ডালের পাণিগ্রহণ করবেন। আজকের এই গোধূলিতেই রয়েছে পরম শুভলগ্ন। তাই প্রভুর প্রতীক বিগ্রহকে এখানে আনয়ন করা হয়েছে। আপনি দয়া ক'রে এবার কন্যা সম্প্রদানে ব্রতী হোন।"

শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও আচারের ভেতর দিয়ে মহাসমারোহে শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে অণ্ডালের বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। প্রেমময়ী অণ্ডাল রঙ্গনাথ-দেবকে প্রাপ্ত হলেন তাঁর প্রাণপতিরূপে। প্রেম-জাগ্রত এই দেববিগ্রহ আর প্রেমসিদ্ধা মানবীর এ যে এক মহা বিস্ময়কর পরিণয় বন্ধন। এমন দৃশ্য রঙ্গক্ষেত্রের নরনারীদের আর কখনো নয়নগোচর হয় নি।

বিয়ের পর দিন আচার্য বিষ্ণুচিত্তের অঙ্গনে আনয়ন করা হল এক মনোরম চৌদোলা। রম্য বসনভূষণে সুসজ্জিত হয়ে অণ্ডাল চললেন তাঁর পতি সম্ভাষণে, রঙ্গনাথ মন্দিরে। জয়ধ্বনি দিতে দিতে শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রের অসংখ্য ভক্ত ও সাধক হলেন তার অনুবর্তী।

মাল্য চন্দন ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা, নববধূ অণ্ডাল প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে দাঁড়ালেন গিয়ে পরম প্রভুর মন্দিরকক্ষে। তাঁর প্রতীক্ষাময় জীবনে আজ এসেছে চরম লগ্ন। এসেছে পরমতমের মিলন ও সাযুজ্যের বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ। প্রেমাবেগে সারা দেহে মনে তাঁর জেগে উঠেছে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। মহাভাবের উদয় হয়েছে ব্রজরস সাধনার সার্থক সাধিকা অণ্ডাল আড়বারের সর্বসত্তায়।

পুষ্পমাল্য হস্তে ভাবপ্রমত্তা প্রেমিকা টলতে টলতে এগিয়ে যান রঙ্গনাথ বিগ্রহের সম্মুখে। কৌতূহলী সাধক, ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন রঙ্গনাথের এই প্রিয়তমার দিকে। সমবেতকণ্ঠে জয়-ধ্বনি ওঠে—জয় প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের জয়, জয় শ্রীরঙ্গনাথ-নায়কীর জয়।

ভাবাবিষ্ট হয়ে, অর্ধবাহ্য অবস্থায় অণ্ডাল এগিয়ে যান শ্রীবিগ্রহের

দিকে। মানসলোকে স্ফুরিত হয়ে ওঠে প্রভুর অসমোর্ধ্ব মাধুর্য আর তাঁর সর্বাতিশায়ী আনন্দলীলা। সে মাধুর্য আর সে আনন্দ অমোঘভাবে আকর্ষণ করে অণ্ডালকে। প্রমত্তা প্রেমিকা এবার বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে ছুটে যান মন্দিরের গর্ভগৃহে। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েন বটপত্রশায়ী রঙ্গনাথ বিগ্রহের বক্ষোপরি।

গর্ভগৃহের সমস্ত দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যায়—নববধূ অণ্ডাল লোক-লোচন থেকে হন অদৃশ্য। ঘটনার এই নাটকীয়তায়, এই আকস্মিকতায় ও অলৌকিকত্বে সমবেত ভক্ত জনমণ্ডলী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে। বিরাট মন্দিরকক্ষ গম্‌গম্ করতে থাকে তাঁদের ভীতি-বিস্ময় মিশ্রিত অস্ফুট গুঞ্জনে।

সেবক ও মন্দির পুরোহিতেরা সবাই মিলে এবার দ্বার উন্মোচন করলেন। দেখা গেল, প্রেমসিদ্ধা আণ্ডবার অণ্ডাল একেবারে লুটিয়ে পড়ে আছেন তাঁর প্রাণপতি রঙ্গনাথ বিগ্রহের বুকে, আলিঙ্গনে তাঁকে আবদ্ধ করে। দেহটি নিস্পন্দ, প্রাণহীন। নরলীলা সমাপ্ত ক'রে মহাসাধিকা প্রবিষ্টা হয়েছেন নিত্যলীলায়।

রঙ্গনাথের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, দুই সাযুজ্যই সেদিন লাভ করলেন অণ্ডাল রঙ্গনায়কী।

প্রেমঘন মর্ত্যলীলায় ছেদ টেনে দিয়ে অণ্ডাল আড়বার অন্তর্ধান করেছেন বহুদিন। তারপর প্রায় হাজার বৎসর হয়েছে অতিক্রান্ত। কিন্তু তাঁর প্রেম-সাধনার স্মৃতি আজও রয়েছে অম্লান হয়ে। আজও দাক্ষিণাত্যের ভক্তসমাজ তাঁদের এই একমাত্র মহিলা আড়বারকে স্মরণ করে অপরিসীম শ্রদ্ধায়। মহাসাধিকা অণ্ডালের রচিত যে প্রেম-মধুর তিরুপ্পাবৈ গাথা গেয়ে ভক্তপ্রবর আচার্য রামানুজ পথে পথে মাধুকরী ক'রে বেড়াতেন, তাঁর অনুসরণ ক'রে আজও বহু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবসাধক সেই প্রেম-পদাবলী সানন্দে গেয়ে বেড়ান। আজও শ্রীবিল্লিপুত্তুরের মন্দিরে আষাঢ় মাসের তিরুয়াডীপুরম উৎসবে ভক্ত নরনারীর দল তাঁদের অণ্ডাল আড়বারকে—অণ্ডাল রঙ্গনায়কীকে—অর্চনা করে পরম জাগ্রতা দেবীজ্ঞানে।

কৃষ্ণময়ী মীরা

ববাত্ আগয়া, ববাত্ আগয়া—সোবগোল পড়ে যায় মেড়তা গ্রামে। হাউই আব মশালেব আলোয আকাশ ঝলমলিযে উঠছে। বাদ্যভাণ্ডেব আওযাজে কান পাতা দায। সামনে সুসজ্জিত আশা-ববদাবেব দল, পেছনে ঘোড়ায চড়ে বব চলেছে বঙীন উষ্ণীষ মাথায, জমকালো পোশাক পরে।

রাস্তাব পাশেই বায দুদাজীব বিবাট ভবন। অন্তঃপুবিকাবা মহা উল্লাসে কলবব কবতে কবতে এসে দাঁড়ান বিযেব শোভাযাত্রা দেখবেন বলে।

সবাব সাথে বালিকা মীবাও কৌতূহলভবে, বিস্ফাবিত নযনে তাকিযে থাকে ববাতের জাঁকজমকেব দিকে। অবোধ মেযে হঠাৎ প্রশ্ন ক'বে বসে, "আচ্ছা, মা, আমাব বব কবে আসবে এমনি ক'বে ?"

মিছিল দেখতে সবাই ব্যস্ত, ক্ষুদ্র বালিকাব কথার উত্তব দেবে কে ? মীবা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বাব বাব মাযেব আঁচল টেনে কবে ঐ একই প্রশ্ন, "বলনা মা, আমাব বব কোথায ? কবে আসবে এমনি জৌলুস নিযে ?'

এবাব শুরু হয মেযেব কান্না। জননী মহাবিপদে পড়ে যান। বেযাড়া মেযে এ আবাব কি আব্দাব ধবেছে। তাকে ভুলিযে শান্ত না কবলেও যে চলে না। মা শেষটায প্রবোধ দিযে বলেন, "ওবে তোব বব তো আমাদেব ঘবেই আছে। ঠাকুবঘবে বযেছেন গিবিধাবী গোপালজী। ওব সঙ্গেই যে তোব বিযে হবে। নে বাপু, এখন চুপ কব, একটু শান্ত হযে বোস্।"

মেযে খুশী হযে ওঠে মাযেব কথায। পবমোৎসাহে আবাব দেখতে থাকে বব ও ববাতেব সাজসজ্জা আব আলোকমালা।

মেয়েকে ভোলাবাব জন্য জননী যে মন্তব্য কবলেন, সেই দিনই তিনি তা বিস্মৃত হযে যান। বালিকা মীবা কিন্তু বিস্মৃত হয নি, বালসুলভ মনোবৃত্তি নিযে ঠাকুব গিবিধাবীকেই সে ধবে নিয়েছে তাব বব বলে। বব আসলে কি বস্তু তা তাব জানা নেই, ভেবে নিযেছে, খেলাব সঙ্গী জাতীয একটা কিছু হবে।

কযেক মাস পবেব কথা। এক প্রবীণ বৈষ্ণব সাধু সেদিন গ্রামে এসে উপস্থিত। বোজ ভিক্ষা নিযে থাকেন বাও দুদাজীবই ভবনে। সাধুব ঝুলিতে বযেছেন তাঁব ইষ্টবিগ্রহ গিবিধাবী গোপাল। এই গোপাল তাঁব জীবনসর্বস্ব, নযনমণি। তাঁব নিত্য সেবা কবাই সাধুব সাধনাব প্রধান অঙ্গ।

এই গোপাল-বিগ্রহ বালিকা মীবাব বড ভাল লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মেযেব বাযনা, এটি তাকে দিতে হবে। বিগ্রহকে সে মনেব মতো কবে সাজাবে, খাওযাবে, নাওযাবে আব তাব সাথে খেলা কববে দিন বাত।

বাডিব লোকেবা প্রমাদ গণেন। তাঁবা বলেন, "সে কিগো, একি অসম্ভব কথা। গিবিধাবী গোপাল হচ্ছেন সাধুব ইষ্টবিগ্রহ, জীবন গেলেও এটি যে তিনি হাতছাডা কববেন না। না মীবা—এমন অন্যায আব্দাব কখনো কবতে নেই।"

মীবা কিন্তু কোনো যুক্তিই মানতে বাজী নয। গিবিধাবী গোপাল তাব চাই-ই, সে হবে তাব খেলাব সাথী।

সাধু তাঁব ইষ্টবিগ্রহ পবিত্যাগেব কথাটি হেসে উডিয়ে দেন, ওদিকে মীবাও তাব দাবি ছাডবে না। সে এক অদ্ভুত পবিস্থিতি। অবশেষে স্বযং ঠাকুবকেই এগিযে আসতে হয এই জটিল সমস্যাব সমাধানেব জন্য।

স্বপ্নযোগে সাধুব সম্মুখে সেই বাত্রেই ঘটল প্রভু গিবিধাবীজীব আবির্ভাব। প্রভু বললেন, "ওগো, এতকাল আমাব সেবা পূজা কবলে, ইষ্টরূপে ভজন কবলে পবম নিষ্ঠায। আমি তোমাব উপব প্রসন্ন হযেছি, বব দিচ্ছি—কৃষ্ণে বতি তোমাব বৃদ্ধি পাক দিন দিন।

কিন্তু একটা কথা। এবার যে আমায় বিদায় দিতে হয়। ইচ্ছে হয়েছে, আমি এই পরম ভক্ত রাজপুত-বালা মীরার কাছেই থেকে যাবো। তার খেলার সাথী হয়ে এই রাজপুত ভবনে কিছুদিন করবো অবস্থান।

প্রভুর এ প্রত্যাদেশ অলঙ্ঘনীয়। উদ্‌গত অশ্রুধারা কোনোমতে চেপে রেখে, সাধু মীরাকে অর্পণ করলেন তাঁর শ্রীবিগ্রহ। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বার হয়ে পড়লেন পরিব্রাজনের পথে।

এই বিগ্রহপ্রাপ্তি বালিকা মীরার জীবনে ঘটায় নব রূপান্তর। জন্মজন্মান্তের সাত্ত্বিক সংস্কার উন্মোচিত হয় এটিকে কেন্দ্র ক'রে। এখন থেকে গিরিধারীগোপাল হয়ে ওঠেন মীরার জীবনসর্বস্ব।

দিন রাত মীরা খেলা করে তার পরমপ্রিয় সাথী গিরিধারীর সঙ্গে, মনোহর পুষ্প চয়ন করে তাঁর জন্য, প্রেমভরে গাঁথে অজস্র অপরূপ মালা। আর প্রাণভরে শোনায় তাঁকে স্বরচিত ভজন।

স্পর্শমণির ছোঁয়া এবার যেন লেগেছে মীরার ভক্ত-জীবনে, আর অকারণে অবারণে উৎসারিত হচ্ছে অন্তস্তল থেকে প্রেম-ভক্তিরসের দুর্লভ সঞ্চয়।

এই বয়সে যে সব ভক্তিরসাত্মক ভজন সে রচনা করে, বর্ষীয়ানদের তা হতবাক্ ক'রে দেয়।

মীরার সংগীত পারদর্শিতাও বড় অপূর্ব। এমনিতেই সে মধুকণ্ঠী, তদুপরি সুর সংযোজনে রয়েছে তার অসামান্য দক্ষতা। বলামাত্র ভজনের পদ রচনা ক'রে আর সংগীত পরিবেশন ক'রে সবার চিত্ত সে জয় ক'রে নেয়।

অন্তঃপুরিকাদের সাথে জননী সেদিন রয়েছেন বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত। বালিকা মীরা ত্রস্তেব্যস্তে সেখানে এসে উপস্থিত। উল্লাসভরে জননীর কানে ফিসফিস ক'রে জানায়, "মাগো, জানো কাল রাতে আমি একটা ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। শ্যামল কিশোর গিরিধারীজীর

সঙ্গে আমাব বিয়ে হযে গেল। আব কত আলো, বাজি-বাজনা, কত হাসি গান সে উৎসবে।"

মেয়েব ছেলেমানুষী কথা শুনে মাযেব হাসি চাপা দায় হয। বলেন, "তাই নাকি, এতো ভাবী আনন্দেব খবব বে।"

"আবো একটা খবব আছে মা। আমি এক চমৎকাব গান বেঁধেছি সেই সুন্দব স্বপ্নেব, সুব দিযেছি তাতে। এক্ষুনি এখানে গেযে শোনাবো তোমায?"

মা আব তাঁব সঙ্গিনীবা উৎসুক হযে বলেন, "গাও মা মীবা, গাও তোমাব স্বপ্নে-দেখা বিযেব সেই গান।"

খুশীতে উচ্ছল, প্রাণ-চঞ্চল মীবা শুরু কবে তাব স্ববচিত মনোহব সংগীত :

মাঈ মহাঁনে সুপ্‌নে মে
পবণ গযা জগদীশ
অঙ্গ অঙ্গ হলদা মব
কবী জী সুধে ভীজ্যো গাত।
মাঈ মহাঁনে সুপ্‌নে মে
পবণ গয়া দীননাথ।
ছপ্পন কোট জহাঁ জান পধাবে
দুলহ্‌ শ্রীভগবান।
সুপ্‌নে মে তোবণ বাঁধিযা জী
সুপ্‌নে মে আই জান।
মীবাকে গিবিধব মিল্যাজী
পুবব জনমকো ভাগ।
সুপ্‌নে মে মহাঁনে পবণ গযা জী
হে গযা অচল সুহাগ॥

—মা, স্বপ্নে জগদীশেব সঙ্গে হযেছে আমাব মালাবদল। বিযের সময় সাবা অঙ্গে আমবা মেখেছি হলুদ। ছাপান্ন কোটি বাজপ্রাসাদে এসেছিলেন আমাব বব—স্বয়ং শ্রীভগবান্। স্বপ্নে দেখেছি, মনোহব

তোরণ বাঁধা হয়েছে, এসেছেন আমার পরাণপ্রিয়। পূর্ব জনমের পরম সৌভাগ্য বুঝি ছিল, তাই পেয়েছি গিরিধরকে আমার প্রাণ-পতিরূপে। স্বপ্নে বিয়ে ক'রে গিয়েছেন আমায়—সৌভাগ্যের নেই আমার পরিসীমা।

অবোধ বালিকার এই স্বপ্ন-কাহিনী জননী ও গৃহের অন্যান্য লোকেরা হেসে উড়িয়ে দেন বটে, কিন্তু মীরার বালিকা জীবনে তা রোপণ করে কৃষ্ণপ্রেমের এক অমোঘ বীজ। সে বীজ অঙ্কুরিত পুষ্পিত ও ফলিত রূপ—কৃষ্ণপাগলিনী, কৃষ্ণপ্রেমসিদ্ধা মহাসাধিকা মীরাবাঈ।

জীবনের বেদীতে মীরা স্থাপন করেন অখিল রসামৃতমূর্তি তাঁর ইষ্টকে, নবকিশোর নটবর ব্রজেন্দ্রনন্দনকে। এই আরাধ্য দেবতার পদমূলে আপনাকে তিনি নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দেন। তাঁর প্রাণোচ্ছলতা, প্রেমের আবেগ ও উদ্বেলতা হয় সুদূর বিস্তারী। তাঁর সংবেদনময় সুমধুর ভজনের মাধ্যমে উৎসারিত হয় দুর্লভ প্রেম, বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের অভীপ্সা, ভক্তিরসধারা ছড়িয়ে পড়ে সারা উত্তর ভারতে। লক্ষ লক্ষ নরনারী ভক্তি সাধনার পথে উজ্জীবিত হয় মীরার ভজনামৃতে অবগাহন ক'রে। প্রেমাবেগ ও আত্মনিবেদনের প্রেরণা লাভ করে তাঁর কৃষ্ণসর্বস্ব মহাজীবন থেকে।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানের উষর মরুঅঞ্চল বেষ্টিত কুড়কী নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মীরাবাঈ।[১] তাঁর আবির্ভাব যেন

১ মীরার জন্ম সাল সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়েছে। গুজরাট এণ্ড ইট্‌স লিটারেচার-এ শ্রী কে, এম, মুন্সী বলেন মীরা জন্মেছিলেন ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। রাজস্থানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এস, এস, গহলোৎ বলেন ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। হিন্দি শব্দ-সাগর-এ পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল লিখেছিলেন যে, মীরার জন্ম ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে। মীরাবাঈ 'পদাবলী'-তে পরশুরাম চতুর্বেদী ১৫১৬ খ্রীঃ-কে মীরার আবির্ভাব-বৎসর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মীরার জীবনের আধুনিক তথ্যানুসন্ধানীরা ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও তথ্যাদি বিচার করে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দকেই তাঁর জন্মসালরূপে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী।

মরুভূমিতে প্রেমভক্তির পুষ্পতরুর অলৌকিক আত্মপ্রকাশ—শ্রীভগবানের এক অপরূপ অবদান। পিতা রত্নসিংহ ছিলেন রাঠোর বংশের মেড়তিয়া শাখার সন্তান, আর মাতা ঝালাবংশীয় রাজপুত সুরতান সিংহের কন্যা, বীর কুঁয়রী।

রত্নসিংহ মেড়তার অধিপতি রাও দুদাজীর চতুর্থ পুত্র। কুড়কী অঞ্চলের বারোখানা গ্রামের জায়গীর তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন এবং কুড়কীতেই একটি গড় স্থাপন ক'রে বসবাস করতে থাকেন।

রত্নসিংহের প্রপিতামহ মাড়ওয়ার রাজরাও যোধাজীর বীরত্বের বেশ খ্যাতি ছিল। নিজ নাম অনুসারে যোধপুর নগর নির্মাণ ক'রে সেখানে তিনি স্থাপন করেন রাজধানী। রাও যোধাজীর অন্যতম পুত্র দুদাজী অসীম বিক্রমে মুসলমান শাসকের হাত থেকে মেড়তার সন্নিহিত অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। মেড়তায় তাঁর কীর্তি হচ্ছে একটি নূতন নগর ও দুর্গ নির্মাণ আর চতুর্ভুজজীর মন্দির স্থাপন। তাঁর সময় থেকে মেড়তিয়া ক্ষত্রিয়দের খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মীরার পিতা রত্নসিংহও ছিলেন এক সাহসী যোদ্ধা। ক্ষত্রিয় জনোচিত শৌর্য, উদারতা ও পরোপকারবৃত্তির জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। মীরা তাঁর একমাত্র কন্যা এবং এই কন্যাকে ছোটবেলা থেকে পরম আদর-যত্নেই তিনি লালন-পালন ক'রে আসছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রত্নসিংহের সংসারে হঠাৎ একদিন নেমে আসে নিয়তির নির্মম আঘাত। স্বল্পকাল রোগভোগের পর তাঁর পত্নী লোকান্তরিত হন। মীরার বয়স তখন সবে আট বৎসর।

এবার সমস্যা দাঁড়ায়, মাতৃহারা বালিকাকে লালনপালন করার ভার কে গ্রহণ করবে? এ সময়ে পিতামহ দুদাজী নাতনীকে পরম স্নেহভরে মেড়তায় আনয়ন করেন এবং তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় এবং শিক্ষাধীনে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকেন মীরা।

রাও দুদাজী এক ঐশ্বর্যবান্ রাজা আবার ভক্তিমান্ বলেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না। নিজের বিরাট প্রাসাদের কাছেই তিনি

প্রতিষ্ঠিত করেন চতুর্ভুজজীর এক সুরম্য মন্দির[১]। এই মন্দিরে উপস্থিত থেকে পূজা-অর্চনা করা ছিল তাঁর নিত্যকার কর্ম। তাছাড়া কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই দুদাজী নাতনী মীরাকে নিয়ে বসতেন মহাভারতের গল্প শোনাবার জন্য। এভাবে পুরাণের নানা কাহিনী ও ধর্ম-জীবনের আদর্শ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হতে থাকে বালিকার জীবনে।

সন্ধ্যার আরতি শেষে চতুর্ভুজ মন্দিরে পুরোহিত গদাধর পণ্ডিত প্রতিদিন পুরাণ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বালিকা মীরা রোজ সেখান গিয়ে উপস্থিত হয়, বুঝুক না বুঝুক, পরম ঔৎসুক্যভবে শ্রবণ করে নানা তত্ত্বকথা ও ধর্মকাহিনী।

সহজাত ভক্তি নিয়ে মীরা জন্মগ্রহণ করেছেন। তদুপরি রয়েছে ভক্তিরসাত্মক ভজন পদ রচনায় তাঁর-অসামান্য প্রতিভা। এই অল্প বয়সে কি ক'রে এমন সব রসসমৃদ্ধ রচনায় তিনি সমর্থ হন, সবার কাছে তা এক পরম বিস্ময়।

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, মীরা এখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন। অপরূপ রূপলাবণ্য উপচে পড়ছে তাঁর সারা অঙ্গে। নাতনীর বিয়ের জন্য পিতামহ রাও দুদাজী এসময়ে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। ঘটক আর ভাট পাঠানো হয় দিকে দিকে। সারা রাজস্থানে তখন চিতোরের শিশোদিয়া বংশের রানা সংগ্রাম সিংহের খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি। তাঁর প্রথম পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে মীরার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে যায়। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এই বিবাহের উৎসব। এর অব্যবহিত পরেই নববিবাহিতা মীরা চিতোরে তাঁর পতি-গৃহে নীত হন।[২]

---

১ এই চতুর্ভুজ মন্দিরের দেয়ালে মীরার কতকগুলি উৎকৃষ্ট ভজন উৎকীর্ণ রয়েছে। ভ্রমণকারী ও দর্শনার্থীদের কাছে এগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

২ কার্নেল টড তাঁর অ্যানাল্স্ অব রাজস্থান-এ মীরাকে রানা কুম্ভের পত্নী বলে উল্লেখ করেছেন। কয়েকজন ভারতীয় লেখকের রচনায়ও অনুরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। এই মত কিন্তু একেবারে ভ্রান্ত। রাজস্থানের বিশিষ্ট

মেবারেব প্রথম কুমাবেব মহিষী হযে চিতোবে পদার্পণ কবলেন মীরা। সৌন্দর্যে তিনি অনিন্দনীযা, সংগীতে পাবদর্শিনী, ভজন গান বচনায তাঁব জুড়ি নেই। স্বভাবতই তাই অল্পকাল মধ্যে বাজপ্রাসাদেব মধ্যমণিরূপে গণ্যা হলেন তিনি।

'ভাবতখ্যাত মহাবীব বানা সংগ্রামেব মতো শ্বশুব লাভ কযজনেব ভাগ্যে ঘটে? কুমাব ভোজবাজেব মতো কান্তিমান, উদাবচেতা ও চবিত্রবান্ স্বামীই বা কোথায মেলে? মেড়তিযা আব মেবাবেব বাজ-সংসাবেব সবাই বলা-বলি কবতে থাকে—মীবাব সৌভাগ্যেব অবধি নেই।

বাজ-ঐশ্বর্য, প্রাসাদেব বিপুল বৈভব আব শ্বশুবকুলেব স্নেহ-সমাদবেব মধ্যে মীবা কিন্তু নিজেকে একেবাবে হাবিযে ফেলেন নি, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বকীয়তা তিনি বজায বাখলেন। প্রেম ভক্তিবসেব যে মাধুর্যময ধারা উৎসাবিত হযেছে তাঁব জীবনে, কৃষ্ণ-প্রেমেব যে অমৃত উদ্‌গত হযেছে অজস্রধাবে, পবিবর্তিত জীবনেও তা বইল অব্যাহত।

পতিব আদব সোহাগ যেমন স্বাভাবিকভাবে মীবা গ্রহণ কবেন, তেমনি সোৎসাহে যোগদান করেন প্রাসাদেব সকল উৎসব ও আনন্দরঙ্গে। কিন্তু অন্তরেব অন্তস্তলে গিবিধাবী গোপালেব আকর্ষণ বযে যায তেমনি দুর্বাব। প্রাসাদেব হৈ-হট্টগোলেব মধ্যে যখনি অবসব পান, কুম্ভশ্যাম মন্দিবে গিযে উপস্থিত হন, ধ্যান ভজনে অতিবাহিত কবেন প্রহবেব পব প্রহব। প্রাসাদে সাধুসন্তেব আগমন

ঐতিহাসিক—মুন্সী দেবীপ্রসাদ, গৌবীশঙ্কব হীবাচন্দ ওঝা প্রভৃতি প্রমাণ কবেছেন যে, বানা সংগ্রামসিংহেব জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজবাজই মীবাব স্বামী। বানা কুম্ভ তাঁব বহু বৎসবেব পূর্ববর্তী। ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কুম্ভেব মৃত্যু, আব মীবাব পিতা মেড়তিযা বত্নসিংহ ভূমিষ্ঠ হন ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই ঐ বত্নসিংহেব কন্যা মীবাবাঈ কখনো বানা কুম্ভেব পত্নী হতে পাবেন না।

সর্বোপবি, মেড়তা বাজ্যেব বাঠোব তবাবিখীতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে—মীবা ভোজবাজেব সহধর্মিণী।

হলেই মীরা ছুটে যান সর্বাগ্রে তাঁদের কাছে, আত্মহারা হয়ে শোনেন তাঁদের মুখে হরি-কথা। কখনো কখনো ভাবপ্রমত্ত হয়ে নিজের কণ্ঠে শুরু করেন অমৃতময় ভজন গান।

মেবার রানাবংশের ইষ্টদেব—একলিঙ্গজী। কিন্তু চিতোরের প্রাসাদে কৃষ্ণ-উপাসনার ঐতিহ্যও কম ছিল না। রানা কুম্ভ নিজ নির্মিত কুম্ভশ্যাম মন্দিরে শুধু কৃষ্ণ বিগ্রহই স্থাপন করেন নি, বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রচর্চার ধারাও বিস্তারিত ক'রে গিয়েছেন নানা ভাবে। 'রসিক প্রিয়া' নামক, গীতগোবিন্দের টীকাটি তাঁরই রচিত। মীরাবাঈর চিতোরে আগমনের পর থেকে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা আবার নতুন ক'রে প্রবাহিত হল।

ভোজরাজ স্ত্রীর ভক্তিপরায়ণতার পথে কোনো দিন এতটুকু বাধা সৃষ্টি করেন নি। বরং পত্নীপ্রেম, উদার শুভবুদ্ধি এবং রসগ্রাহিতা তাঁকে চালিত করেছে মীরাবাঈর নানা আব্‌দার রক্ষায়। মীরার অন্তরের অভিলাষ জানতে পেরে তিনি এক রমণীয় শ্রীমন্দির গড়িয়ে দেন, শ্যামনাথ বিগ্রহ সেখানে স্থাপিত হয়। রানা কুম্ভের স্থাপিত কুম্ভশ্যাম মন্দিরের পাশে মীরার পূজিত শ্যামনাথের মন্দির আজও বহু ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে।

বাল্যকাল থেকেই মীরা মেড়তার চতুর্ভুর্জ মন্দিরের পুরোহিত পরমবৈষ্ণব গদাধর পণ্ডিতের পুরাণ-পাঠ পছন্দ করতেন। সেই গদাধর পণ্ডিতকেও সাদরে নিয়ে আসা হল নব স্থাপিত শ্যামনাথের মন্দিরের কাছে।

বিবাহিত জীবনের কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, কৃষ্ণপ্রেমের স্রোতধারা মীরার জীবনে ক্রমে উত্তাল হয়ে উঠেছে। সংসারের ভোগসুখে তাঁর বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই, নেই জাঁকজমক ও বিলাসব্যসনে কোনো আসক্তি। রাজভবনের পরিবেশে, রাজবধূর ছদ্মবেশে এ যেন এক সর্বত্যাগিনী তপস্বিনী।

আপন ভজনপূজন নিয়ে মীরাবাঈ প্রায়ই থাকেন ব্যস্ত, আর ইষ্টদেব প্রাণপ্রভু গিরিধারী গোপালের জন্য কেঁদে কেঁদে হন মুহ্যমান।

পতি ভোজবাজ মনে মনে প্রমাদ গণলেন বটে, কিন্তু মীবাব ভক্তি প্রবণতাব স্বরূপ তিনি বোঝেন, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মীবাকে ঘিবে বাখতে, আপন পক্ষপুটে আশ্রয় দিতে তাঁব চেষ্টাব যেন অবধি নেই। কিন্তু মীবা যেভাবে দিন দিন ইষ্টেব জন্য পাগলিনী হযে উঠছেন, সংসাবেব সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'বে নিচ্ছেন, তাতে আব তো বেশীদিন তাঁকে সামলানো যাবে না। তাছাড়া, আত্মীযবর্গ ও প্রাসাদেব পবিজনেবাই বা কতদিন তাঁকে সুচক্ষে দেখবে? ইতিমধ্যেই নিন্দা সমালোচনা উদগ্র হযে উঠেছে চাবদিকে। স্বামীব কাছে এটা হযে উঠল এক অস্বস্তিকব ব্যাপাব।

ভোজবাজ সেদিন একান্তে বসে পবম স্নেহভবে পত্নীকে বললেন, "মীবা, তোমার প্রাণেব বেদনা, প্রাণেব আকুতি আমায খুলে বলো। কি তুমি চাও? কি পেলে তুমি সুখী হবে, শান্তিলাভ কববে, অকপটে আমায জানাও।"

ভাববিগলিত হৃদযে, সুধাকণ্ঠী মীবা এ প্রশ্নেব উত্তব দিলেন স্ববচিত ভজনে—

মেবে তো গিবিধব গোপাল,
দুস্‌রো ন কোই।
জাঁকে সিব মোব মকুট,
মেবে পাতি সোই।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু
আপনো ন কোই।
ছাড দই কুলকী কান,
কা কবি হৈ কোন্।
সংতন ঢিগ বৈঠ্ বৈঠ্
লোক লাজ খোই।
চুনবীকে কিযে টুক,
ওঢ লই লোই।

মোতী মুগে উতাব,
বনমালা পোই।
অসুঁযন জল সীচ-সীচ,
প্রেম-বেল বোই।
অব্ তো বেল ফৈল গই,
আনন্দ ফল হোই।
দুধকী মথনিয়াঁ
বড়ে প্রেমসে বিলোই।
মাখন যব কাড লিযো,
ছাছ পিযৈ কোই।
ভাবই মৈ ভগতি কাজ,
জগত দেখ মোহী।
দাসী মীবা গিবিধব প্রভু,
তাবো তাব মেলী।

—ওগো, গিবিধাবী ছাড়া যে আমাব আর কেউ-ই নেই। যাঁব শিবে মযুব মুকুট, তিনিই যে আমাব পতি। তাত মাতা ভ্রাতা কেউ নয আপনাব, ছেড়ে দিযে কুলেব মান, এই কথাই আমি শুধু মনে ভাবি। ভক্ত সাধু সন্তদেব সাথে বসে দিন যাপন কবি। আব লোকলাজ ছেড়ে, ওড়না ছিঁড়ে ফেলে, পরি ছিন্ন বসন। মোতি মুক্তা পবিহাব ক'বে পরেছি বনমালা, অশ্রুজল সিঞ্চন কবে বাড়িযেছি প্রেমলতাকে। এখন সে লতা বৃদ্ধি পেযেছে, কিন্তু নেই আব তাতে আনন্দ ফল। দুধ যা করেছি সংগ্রহ, তা বিলাই আমি প্রেমভরে, মাখন যা তুলেছি তা নিয়ে যাক না আব কেউ। ভক্তির জন্য এসেছি আমি, জগৎ দেখছে দূব থেকে। হে গিবিধর, মীবা তোমাব দাসী—তাকে তবাও তুমি প্রভু।

পত্নীব হৃদয বেদনাব উৎস কোথায, সে কথা বুঝতে কুমাব ভোজবাজেব দেবি হয় না। মীরাব জীবনে এসেছে সেই প্রেমেব মহাপ্লাবন যা ঘবসংসাব তো দূবেব কথা, সাবা বিশ্বসংসাবকে তৃণেব

মতো ভাসিযে নিযে যায। এ প্লাবনেব তরঙ্গ বোধ করবে এমন শক্তি কাব ?

পত্নীব অবস্থা হৃদযঙ্গম ক'বে ভোজবাজ আবো কোমল, আরো সহানুভূতিশীল হযে পড়েন। মীবাব প্রেমভক্তিব সাধনধাবাকে অবাধে বযে যাবাব সুযোগ তিনি প্রদান কবেন।

কযেক বৎসবেব মধ্যেই মেবাবেব বাজপ্রাসাদে এক দুর্দৈব নেমে আসে। মীবাবাঈব স্বামী, মহাবানা সংগ্রাম সিংহেব জ্যেষ্ঠকুমাব এবং উত্তবাধিকাবী, ভোজবাজ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পতি বিযোগেব মধ্য দিয়ে সংসাবজীবনেব বৃহত্তম বন্ধন ছিন্ন হয, মীবাব সাধনজীবনে উন্মোচিত হয নূতনতব অধ্যায। এই সমযে একদিকে পবীক্ষাময জীবনে তাঁকে ববণ কবতে হয়েছিল বৈধব্যজীবনেব ক্লেশ, দুষ্ট আত্মীয অভিভাবকদেব অনাচাব ও অত্যাচাব অপর দিকে কৃষ্ণপ্রেমেব অমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হযে উঠেছিল তাঁব নিগূঢ় সাধনময় জীবন।

ভোজবাজেব দেহান্তেব পব তাঁর পিতা মহাবানা সংগ্রাম সিংহও ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে পবলোক গমন কবেন। এবাব মেবাবেব সিংহাসনে উপবেশন করেন বত্নসিংহ। তিন বৎসব পরে বত্নসিংহও লোকান্তবিত হন এবং তাঁব অনুজ বিক্রমজিৎ মেবাবেব শাসনভার গ্রহণ কবেন। মাত্র পাঁচ বৎসব তিনি বাজত্ব কবেছিলেন, এবই ভেতব জনসাধারণ তাঁব কুশাসন ও অনাচাবে জর্জবিত হযে উঠেছিল। মীরাবাঈব উপব নির্যাতন চালাতেও পাপাশয বিক্রমজিৎ কম চেষ্টা করে নি। কিন্তু ইষ্টদেব গিবিধাবীজীব কৃপাবলে তাব সমস্ত কিছু চক্রান্ত ও অপপ্রযাস বাব বাব ব্যর্থ হযেছে।

ইষ্টেব পূজা, ভজন গান, আর সাধু-সেবাযই দিনবাত মীবাব সময কাটে। তাঁর ভক্তিপ্রেমেব সাধনাকে কেন্দ্র ক'বে চিতোবে জমাট বেঁধে ওঠে একটি ভক্তগোষ্ঠী। এদের সাথে কৃষ্ণময়ী মীবা প্রাযই ইষ্টগোষ্ঠী কবেন, মেলামেশা কবেন। সমাজ ও লোকলজ্জাব

ভয না বেখে সোল্লাসে কবেন ভজন গান ও নৃত্যোৎসব। রানা বিক্রমজিৎ এসব সহ্য কবতে নাবাজ।

তাছাড়া, অধর্মাচাবী বিক্রমজিৎ-এব চিত্তে ধীবে ধীবে জেগে ওঠে মীবাব প্রতি এক দুরন্ত লালসা। মীবা পূর্ণযৌবনা, অনিন্দ্যসুন্দবী আব নৃত্যগীতে অতি নিপুণা। এমন একটি আকর্ষণীয ভোগেব বস্তু প্রাসাদেব অভ্যন্তবে বযেছে, অথচ বানা বিক্রমজিৎ তা কবাযত্ত কবতে পাবছেন না, সে কেমন কথা? কঠোব সংকল্প জেগে ওঠে তাঁব মনে—যে কোনো প্রকাবে মীবাকে বশে আনতেই হবে: কাম লালসাব পরিতৃপ্তি কবতে হবে তাঁকে দিযে।

পূর্ণিমা তিথিব গভীব বাত। চাঁদেব আলোক-স্রোত ছডিযে পডেছে চিতোব প্রাসাদেব আশেপাশে, দূব পাহাডেব গাযে গাযে। অলিন্দে দাঁডিযে কৃষ্ণবিবহিণী মীবা উদাস কণ্ঠে গেযে চলেছেন সদ্য বচিত মধুব ভজন:

প্যাবে দবসন দীজ্যো আয়,
তুম বিন্ রহো ন জায।
জল বিন কমল, চন্দ বিন বজনী,
ঐসে তুম দেখ্যা বিন সজনী,
আকুল ব্যাকুল ফিরু বৈণ দিন,
বিবহ কলেজো খায।
দিবস ন ভুখ নীঁদ নহি বৈনা
মুখসূ কথন ন আবৈ বৈনা।
কহা কহুঁ কছুত বহত ন আবৈ
মিল কব তপত বুঝায।
কুঁ তবসাযো অন্তবজামী—
আয মিলো কিবপা কব স্বামী।
মীবা দাসী জনম জনমকী
পডী তুমহাবে পায॥

—হে মোব প্রিয়, একবাবটি দবশন দিযে যাও এ দাসীকে

তোমা বিনা যে আব যায না থাকা। জল বিনা কমল, চাঁদ বিনা বজনী কি ক'বে থাকবে, বল ? আকুল ব্যাকুল হযে ঘুবছি দিনবাত, বিরহে অন্তব যাচ্ছে ক্ষযে। দিনে নেই ক্ষুধা, বাতে নেই নিদ্, মুখে না আসে তোমায বলাব মতো কথা। বলবাব আছে কতই কথা, কিন্তু তা যায় না তো বলা। এসো, ওগো এসো, আমাব প্রাণেব জ্বালা দাও জুড়িযে। ওগো অন্তর্যামী, কেন দাও আমায এত দুঃখ জ্বালা ? প্রাণের স্বামী তুমি, প্রাণে এসে করহ মিলন। জনম জনমেব দাসী মীবা লুটিয়ে পড়েছে তোমাব পাযে। ওগো, তুমি বিনা বইবে সে আজ কেমন ক'বে ?

শযনকক্ষের বাতাযনে দাঁড়িযে দাঁড়িযে বানা বিক্রমজিৎ শোনেন মীবাব এই বিবহ সংগীত। কিন্নবীর কণ্ঠমধু ঢালা বযেছে এতে, আব বযেছে হৃদয গলানো বিরহেব আর্তি।

চঞ্চল চবণে বিক্রমজিৎ তখনি মীবাবাঈব ভজনকক্ষেব দ্বাবে গিযে উপস্থিত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে, শ্লেষের সুবে বলেন, "বলি, এ বিবহ কান্নাব গান আসলে কাব জন্য ? হিন্দুঘবেব বিধবা—তার ওপর বাজপুত্রবধূ তুমি। কাকে উদ্দেশ ক'বে এ সব বলা হচ্ছে ? জল বিনা কমল, চাঁদ বিনা বজনী—এ অবস্থা কাব বিবহে ? সত্য কথা বলো।"

মীবাব নযন দুটি মুহূর্তে প্রদীপ্ত হযে ওঠে। তারপব শান্ত দৃঢকণ্ঠে উত্তব দেন, 'যাব জন্য সাবা নিখিলবিশ্ব বিবহাতুব হযে কেঁদে মবছে, যাঁব জন্য আকুল হবে তোমাব মতো অভাজনকেও শেষেব সে দিনে কেঁদে ভাসাতে হবে—সেই অনাদিবাদি গোবিন্দেব জন্য, মুবলীব শ্যামল-সুন্দবেব জন্যই যে আমার এ কান্না।"

"বটে, তোমাব এ নষ্টামি আমি বাব করছি। সাধুসঙ্গেব নাম ক'বে যত সব ভণ্ড প্রতাবকদেব ডেকে ডেকে প্রাসাদে নিযে আসছো, আব শিশোদিযা কুলে লেপন কবছো কলঙ্ক কালিমা। এ আব আমি হতে দিচ্ছিনে। কাল থেকে বাইবের সাধু-সন্তদেব আগমন বন্ধ হবে যাবে, এই সঙ্গে তোমাকেও কববো দমন।"

মীরার ওপর ক্রূর লোভাতুর দৃষ্টি হেনে রানা বিক্রমজিৎ দৃঢ় পদক্ষেপে নিজ কক্ষে ফিরে গেলেন।

পরদিন তিনি নানা অপকর্মের সহায়িকা, প্রাসাদের অন্যতমা কর্ত্রী ভগ্নী উদাবাঈর শরণ নিলেন। বললেন, "উদা, যে ক'রেই হোক রাজস্থান-মরুর এই 'পরম রমণীয় ফুল—এই রমণীরত্ন আমার চাই। বলপ্রয়োগে মীরা বশ্যতা স্বীকার করবে না। এজন্য ফাঁদ পাত্‌তে হবে সতর্কভাবে।"

"সে আবার কি রকমের ফাঁদ?"—কৌতূহলের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে উদাবাঈ।

"হ্যাঁ। আর সে ফাঁদের রজ্জু থাকবে তোমারই হাতে। তুমি আজ থেকে কয়েকটি বাছাই করা সঙ্গিনী নিয়ে মীরার একান্ত সহচরী হয়ে যাও। ধীরে ধীরে অর্জন করো তার বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব। তারপর তার মন ঘোরাও আমার দিকে। মীরা একটা কাল্পনিক প্রেমিক ইষ্ট খাড়া ক'রে তার বিরহে শুকিয়ে মরছে, আত্মঘাতনে রত হয়েছে। তাকে বাঁচানোও তো আমাদের একটা কর্তব্য।"

ব্যঙ্গের সুরে উদাবাঈ বলে, "সত্যি, বিপন্নের প্রাণরক্ষার জন্য আজকাল কি ব্যাকুলতাই না তোমার হয়েছে। যাক্ সে কথা। তোমার কত অন্যায় কাজেই এযাবৎ সাহায্য করেছি, এ কাজটাও ক'রে দেবার চেষ্টা করবো। তবে মনে রেখো, মীরাকে বশে আনা বড় কঠিন কাজ। সে যেন এ-জগতের মানুষই নয়। তবুও, তুমি যখন বলছো, আমি একাজ হাতে নেবো।"

এখন থেকে উদাবাঈ হয় মীরার নিত্যসঙ্গিনী। মীরার ভজন-পূজন সে অভিনিবেশ সহকারে দেখে। গিরিধারী গোপালের জন্য যখন তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে ওঠেন, তাঁর হাবভাব আচার আচরণ সে তখন সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

অচিরে পরিস্থিতি হয় অন্যরূপ। পরম পবিত্রা, শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণ-সাধিকা মীরার সাহচর্য ধীরে ধীরে উদাবাঈর চরিত্রকে কোমল ক'রে

তোলে। মীবার প্রতি, মীবাব ইষ্টদেব শ্যামল কিশোবেব প্রতি, এক অজানা আকর্ষণ জেগে ওঠে তাব চিত্তে।

মীবা সেদিন শ্যামনাথ মন্দিবে একলাটি বসে, দয়িত বিরহে বিলাপ কবছেন। গণ্ড বেয়ে দবদব ধাবে ঝবছে অশ্রুজল। অর্ধবাহ্য অবস্থায দেখে সাত্ত্বিক প্রেমবিকাবেব নানা লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে উদাবাঈ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হযে পডে।

প্রবোধ দিযে মীবাকে কিছুটা সুস্থ ক'রে তোলা হল। এবাব উদাবাঈ কৌতূহলভবে প্রশ্ন কবে, "আচ্ছা মীবা, যে গিবিধাবীব জন্য তুমি এত উতলা, তাঁব কোন্ রূপটি তোমাব নযনে বাসা বেঁধে আছে? তাঁব কোন্ মাধুর্য তোমায় এমন পাগলিনী ক'বে তুলেছে, আমাদেব একটু খুলে বলো ভাই।"

গিবিধাবীজীব রূপেব উল্লেখমাত্রই মীবা আত্মহাবা হযে যান। কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট হযে বসে থাকাব পব শুরু কবেন অপূর্ব ভজন:

বসৌ মেবে নৈনন মে নন্দলাল
মোব মুকুট মকবাকৃত কুণ্ডল,
তরুণ তিলক দিএ ভাল।
মোহনী মূবতী সাঁযবী সুবতী
নৈনা বনে বিলাস।
অধব-সুধা বস মুবলী,
বাজত উব বৈজন্তী মালা।
ছুদ্র ঘন্টিকা কটি-তট সোভিত
নূপুব সবদ বসাল।
মীবাঁ প্রভু সন্তন সুখদাই
ভকত বছল গোপাল।

—নযনে মোব এসে বিবাজ কবো নন্দলাল। ময়ূব-মুকুট, মকব কুণ্ডলে শোভিত তুমি। ভালে বিলেপিত বযেছে তরুণ তিলক। মোহন মূবতি, শ্যামল শোভাময, আয়ত-নযন—হে মোব সুন্দব। অধবেব মুবলীতে ঝবছে সুধাবস, আব কণ্ঠে দুলছে তোমাব

বৈজয়ন্তীর মালা। কটিতটে শোভিত ক্ষুদ্র ঘন্টিকা—চরণের নূপুর থেকে উঠেছে মধুর ঝঙ্কার। হে মীরার প্রভু, সাধু সন্তকে সদা তুমি বিতরণ করছো আনন্দ রস, ভক্ত-বৎসল হে মোর গোপাল।

প্রাণপ্রিয় গিরিধারীজীর রূপ বর্ণনা করতে করতে তীব্রতর হয়ে ওঠে বিরহের জ্বালা। আবার পাগলিনীপারা হয়ে ওঠেন মীরা। এ অলৌকিক প্রেমমত্ততা দর্শন ক'রে উদাবাঈর চোখেও আসে জল। মীরাকে সে বার বার প্রবোধ দিতে থাকে স্নেহভরে।

স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে যান মীরা। উদাবাঈকে তাঁর মনে হয় যেন জন্মান্তরের সখী, শুভানুধ্যায়িনী। সজল চক্ষে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন কৃষ্ণবিরহে উৎসারিত এক নূতন সংগীত ঃ

কোহ কহিয়ো রে প্রভু আয়ন কী
আয়ন কী মন ভাবন কী।
আপ ন আবৈ লিখ নহীঁ ভেজৈ
বাণ পড়ী ললচায়ন কী।
এ দোউ নৈন কহ্যো নহীঁ মানৈ
নদীয়া বহৈ জৈ সৈ সাযনকী।
কহা করু কছু নহীঁ বস্ মেরী
পাঁখ নহীঁ উড জাযন কী।
মীরা কহৈ প্রভু কব্ রে মিলোগে
চেরী ভই হুঁ তেরে দায়ন কী।

—সখী, ব'লো আমার জীবন-প্রভুকে আসবার তরে। তিনি আসবেন এ বার্তা যে পরম মধুর—কিন্তু না এলেন তিনি, না দিলেন পাঠিয়ে তাঁর লিপি। আমার হৃদয়ে বাণ হানাই যে তাঁর স্বভাব, নয়ন দুটি আমার বাধা মানে না, শ্রাবণের ধারার মতো ঝরে অবিরল। সখী, পরানে ধৈর্য আর মানে না, পাখা নেই—নইলে উড়ে যেতাম আমার প্রিয়ের পাশে। মীরা কহে, প্রভু আবার কবে এসে মিলবেন? চরণের দাসী হয়ে আমি যে তাঁর নিয়েছি শরণ।

মীরার এই বিরহলীলা চলে দিনের পর দিন রাতের পর রাত।

উদাবাঈ আব তাব সঙ্গিনীদের হৃদযেও অঙ্কুবিত হয় ভক্তেব বীজ। পরশমণি মীরাব স্পর্শে বুঝি তাবাও সোনায রূপান্তবিত হয়ে যায়।

বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ রাত্রি। বাজপ্রাসাদে নিজের ভজনকক্ষে বসে মীরা সেদিন প্রস্তাব কবলেন, "উদা, আজকেব দিন বড সুলক্ষণযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। আমাব শ্যামলসুন্দরের হাতছানি, তাঁর রূপের ঝিকিমিকি, আমি যেন নযনসমক্ষে বাব বার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সবাই তাঁর বিশেষ পূজাব আযোজন কবো। আজ সারা বাত আমি ভজনপূজনে অতিবাহিত করবো—হৃদয নিংড়ে দেবো আমার গিরি-ধারীজীব চরণতলে।

সাবা বাত চলল ভজনপূজন। ভক্তি প্রেমের আবেশে অধীর হযে মীবা গাইতে লাগলেন :

সুনী হো মৈ
হরি আবন কী অবাজ।
মহল চড চড়
জোউঁ মেবী সজনী
কব আয়ৈ মহারাজ।
দাছুর মোর পপাইযা বোলৈ
কোহর মধুবে সাজ।
উমগ্যো ইন্দ্র চহুঁ দিন
ববসৈ দামিণ ছোডী লাজ।
ধরতীরূপ নবা নবা
ধারয়া ইন্দ্র মিলন কৈ কাজ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগব
বেগ মিলো মহারাজ।

—শুনি আমি হবি আগমনেব আওযাজ। মহলের ওপর চডি আব খুঁজি, সজনি, কখন আসে আমার মহারাজ। দাছুব পাপিযা বোলে—কোকিল গান গায মধুর ঝঙ্কারে। গবজে ইন্দ্র, শুরু হয

মেঘের বর্ষণ, দামিনী যেন লজ্জাহীন। ধরণী ধরে নব নব রূপ, ইন্দ্র করে মিলনের সহায়তা। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর—এসো এসো, মহারাজ, তুমি দয়া ক'রে।

সাধনার গভীরতর স্তরে এসে পৌঁছেছেন মীরা। আকুতি ও আর্তির মিলেছে সাড়া। অভীপ্সিত প্রিয়-মিলনে এতদিন আজ তাঁর হয়েছে সম্ভব। ইষ্টদেব গিরিধারী গোপাল দর্শন দিয়েছেন তাঁকে কৃপা ক'রে। এই দিনের সৌভাগ্যোদয়ের বার্তা লিপিবদ্ধ আছে মীরার একটি অনুপম ভজনে :

সহেলিঁয়া সাজ ঘরি আয়া হো।
বহোত দিনাঁ কী জীবতী,
বিরহিণি পিয় পায়া হো।
রতন করুঁ নেবছাবরী
লে আরতি সাজুঁ হো।
পিয় কা দিয়া সনেসড়া,
তাহিঁ বহোত নিযাজুঁ হো
পাঁচে সখী একঠী ভাই,
মিলি মঙ্গল গাহি হো।
পিয় কা রলী বধাবণাঁ
আনন্দ অঁগন ভাবৈ হো।
হরি সাগর সুঁ নেহরো,
নৈণাঁ বঁধ্যা সনেহ হো।
মীরাঁ সখীকে আঁগণৈ
দুধাঁ বুঠা মেহ হো।

—সখীগো, প্রিয় আমার এসেছে মোর ঘরে। বহুদিন প্রতীক্ষায় থেকে বিরহিণী পেয়েছে তার প্রিয়কে। রতন আধারে সাজিয়ে এনেছি আরতির উপচার। প্রিয়ের এই শুভ আগমন ঘটল প্রিয়েরই কৃপায়। পাঁচ সখী মিলে গাও আজ মঙ্গলগীতি। প্রিয় মিলন-বাসরে আজ নেই যে আনন্দের সীমা। হরির রূপ-সাগরে

প্রেমাপ্লুত,নয়ন আমার বাঁধা পড়েছে সখী। মীবার আঙিনা আজ হুধে হযেছে সাদা।

এদিকে বানা বিক্রমজিতের ধৈর্যেব বাঁধ এবার ভাঙবাব উপক্রম হযেছে। সেদিন উদাবাঈব সঙ্গে গোপনে কথা বলে তিনি বুঝলেন, উদা ইতিমধ্যে নিজেই মীবাব ভক্তিপথের একান্ত অনুরাগিণী হযে পড়েছে। তারপব তার মুখে যখন শুনলেন, মীরার মতো সতীসাধ্বী মেযে জীবন থাকতে কোনোদিনই বিক্রমজিতের কাছে আত্মসমর্পণ কববেন না—ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায হযে গেলেন তিনি। স্থির কবলেন, মীরার মতো এমন ধৃষ্টা ও দুর্বিনীত নারীকে বেঁচে থাকবাব অধিকার দেবেন না, অচিবে কববেন তার প্রাণনাশ।

দযাবাম নামে এক বীজাবর্গীয বৈশ্য ছিল মেবারের তৎকালীন দেওযান। লোকটি শুধু কূটচক্রী নয়, যে কোনো পাপকার্য কবতেই সে পশ্চাদ্‌পদ হত না। তাব সঙ্গে ষডযন্ত্র এঁটে বানা ঠিক কবলেন, মীরাকে বিষ প্রযোগে হত্যা কবা হবে এবং দয়ারাম নিজেই এই বিষ তাঁব হাতে তুলে দেবে বিগ্রহেব চবণামৃতে মিশিয়ে।[১]

প্রাণঘাতী বিষ সংগ্রহ করা হল, তাব পর মন্দিরেব চবণামৃত-পাত্রে তা ঢেলে নিযে দযাবাম উপনীত হলেন মীরাব সমীপে। বিনয়নম্র বচনে নিবেদন কবলেন, "মা, আজ প্রভু কৃষ্ণশ্যামাজীর এক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হযেছে। আপনাব জন্য আমি নিজেই প্রভুর চবণামৃত নিয়ে এসেছি। এই নিন্ সেই পবিত্র বস্তু।"

---

১ বাজস্থানেব খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মুন্সী দেবীপ্রসাদজী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, বানা বিক্রমজিৎ তাঁব এক বৈশ্য (বীজাবর্গীয শ্রেণীব) দেওযানেব সহাযতায মীবাকে বিষ প্রদান কবেন। এই বীজাবর্গীয দেওযান বংশেব লোকেবা আজও বিশ্বাস কবে যে, মীবাকে বিষ দেবাব পাপে তাবা অভিশাপগ্রস্ত হযে আছে এবং বংশানুক্রমে দুঃখ দাবিদ্র্যেব নানা লাঞ্ছনা তাদেব ভোগ কবতে হচ্ছে। মীবাব এক ভজন পদেও বিষদান কাহিনীব প্রমাণ আছে :

কনক কটোবে লৈ বিষ ঘোল্যা,
দযাবাম পাণ্ডা লাযো

পরম আগ্রহে মীরা ঐ পাত্রটি গ্রহণ করতে না করতেই উদাবাঈ ব্যাকুল হয়ে সেখানে ছুটে এলেন। অধীর কণ্ঠে বললেন, "না—না, মীরা, এ তুমি কখনো পান করতে পাবে না। এক্ষুনি ঐ পাত্র দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। এতে চরণামৃতের সাথে মিশ্রিত করেছে তীব্র বিষ। রানা বিক্রমজিৎ আর দেওয়ান দয়ারামের ষড়যন্ত্রের কথা আমি জেনে ফেলেছি। তুমি শিগ্‌গীর ছুঁড়ে ফেলে দাও পাষণ্ডের দেওয়া ঐ পাত্র।"

চরণামৃতের পাত্রটি হাতে নিতেই মীরা ভাবাবেশে হয়ে পড়েছেন অভিভূত। প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে বললেন, "কিন্তু উদা, একি বলছো, চরণামৃত যে রয়েছে এতে। আমার প্রাণপ্রভুর চরণামৃত—সে যে আমার পরম ধন। ভক্তি-প্রেম সাধনার অনুগামী কোনো মানুষই যে এ পরম পবিত্র বস্তু উপেক্ষা করতে পারে না। তাছাড়া, রানা আর দয়ারামের অভিসন্ধির কথা তো আমার প্রভু গিরিধারী গোপালের অজানা নেই। এ বস্তু যখন তিনি এখানে পৌঁছুতে দিয়েছেন তখন আমায় তা পান করতেই হবে।"

উদাবাঈর নিষেধ ও আর্তনাদে মীরা কর্ণপাত করলেন না। ইষ্টনাম ভক্তিভরে স্মরণ ক'রে, পাত্রটি মস্তকে ঠেকিয়ে এই হলাহল অম্লান বদনে তিনি পান করলেন। উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখলেন, মীরার দেহে প্রাণঘাতী বিষ একটুও ক্রিয়া করল না, ভক্তিসিদ্ধার মুখবিবরে প্রবেশ ক'রে তা হয়ে উঠল অমৃত।

উত্তর ভারতে জনশ্রুতি আছে, সেদিন মীরার ঐ বিষ গ্রহণের সময় দ্বারকার জাগ্রত বিগ্রহ রণছোড়জীর শ্রীমুখ দিয়ে বার বার ফেনা উদ্‌গত হয়েছিল। আরাধ্য ভগবান্ ভক্তের দেহের প্রাণঘাতী বিষ আকর্ষণ ক'রে নিয়েছিলেন নিজেরই প্রতীক দেহে।

বিষ গ্রহণ ক'রেও মীরাবাঈ দণ্ডায়মান আছেন সুস্থদেহে, অচঞ্চল ভাবে। এ অলৌকিক ঘটনা দর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দয়ারাম দেওয়ান তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রানার সমক্ষে। সবিস্তারে নিবেদন করে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা।

হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে শুনে বিক্রমজিৎ আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। মীরাকে নির্যাতন করার জন্য, তাঁর প্রাণনাশের জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবনে তিনি ব্রতী হন।

জনশ্রুতি আছে, রানা বিক্রমজিৎ এর পর মীরার প্রাণনাশের জন্য বিষধর সর্পেপূর্ণ একটি ফুলের ঝুড়ি তাঁর ভজনকক্ষে পাঠিয়ে দেন। তিনি জানেন, মীরা ভোরে ভোরে পুষ্প সংগ্রহ করেন ইষ্টপূজার জন্য, তা দিয়ে নিবিষ্ট মনে মালা গাঁথেন রঙবেরঙের এবং প্রাণভরে অঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্প ঝুড়িতে কতকগুলি গোখরা সাপ রেখে দিলে নিশ্চয়ই তাদের দংশনে মীরার জীবনান্ত হবে। রানার এই আশা কিন্তু বিফল হয়ে গেল, কার্যকালে ঘটল অন্যরূপ। গিরিধারীজীর কৃপাবলে ঝুড়ির সমস্ত সাপ পরিণত হল পূজার সুগন্ধী ফুলে। আর দেখা গেল তার মধ্যে বিরাজিত রয়েছে একটি পবিত্র শালগ্রাম শিলা।

বিক্রমজিতের আদেশে মীরা এ সময়ে প্রাসাদের মধ্যে প্রায় বন্দিনীর মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। বাইরের সাধু-সন্তেরা সাধিকা মীরার কাছে আসা যাওয়া করতেন, তা বন্ধ হল। মীরার চলাফেরাও করা হল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাঁর শয়নকক্ষের চারিদিকে ব্যবস্থা থাকল বিশেষ প্রহরীর।

একদিন গভীর রাত্রে মীরা গিরিধারীর কাছে প্রেমার্তি নিবেদন করছেন। ইষ্টদর্শনের শেষে মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হয়ে আপন মনে নানা কথাবার্তা বলছেন, হাস্য পরিহাস চলছে।

প্রহরীদের সন্দেহ হল, মীরার কক্ষে বাইরে থেকে কোনো পরপুরুষ হয়তো গোপনে প্রবেশ করেছে। খবর পেয়েই রানা সেখানে এসে উপস্থিত। হাঁক দিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর দ্বারের সম্মুখে, রোষ-কষায়িত নেত্রে মীরাকে প্রশ্ন করলেন, "কে আছে তোমার কক্ষের ভেতর? কার সঙ্গে এতক্ষণ চলছিল তোমার এত প্রেমালাপ, হাস্য-পরিহাস। সত্য ক'রে বলো।"

"ওরে আমার গিরিধারী গোপাল। তাঁর সাথে যে এমন ক'রে প্রায়ই কথা বলি আমি। যখন প্রভু কৃপা ক'রে দেখা দেন, আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠি। আবার যখন পালিয়ে যান, তাঁর অদর্শনে ফেটে পড়ি কান্নায়। এই লুকোচুরির পালাই তো আমার সঙ্গে চলেছে দিনরাত।"

"চুপ কর কুল-কলঙ্কিনী"—গর্জে ওঠেন রানা, দরজা ঠেলে এগিয়ে যান কক্ষের মধ্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ ক'রে পিছন ফিরে আসেন। একি! এ যে সর্বধ্বংসী এক নৃসিংহ মূর্তি তাঁর সম্মুখে। যেমনি চকিতে এ মূর্তি আবির্ভূত হয় তেমনি আবার মিলিয়ে যায়।

অতঃপর কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে ভীতি জড়িত কণ্ঠে রানা বলেন, "মীরা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি। যদি দেবার্চনা করতেই হয়, বংশের ইষ্ট, ভগবান্ একলিঙ্গদেবকে ভজনপূজন না ক'রে এ কোন্ দেবতার আরাধনা তুমি করছো। এ যে সত্যই দুঃসহ—মহা ভয়ঙ্কর।"

মীরা হেসে বলেন, "সে কি রানা, আমার উপাস্য গিরিধারীজী যে প্রেমের ঠাকুর—নয়ন ভুলানো রূপ তাঁর, মুরলী হস্তে নটবর বেশে তিনি বিরাজিত। তিনি কেন ভয়ঙ্কর হতে যাবেন? রানা তুমি চঞ্চলমতি, ভগবৎবিদ্বেষী—দুর্ভাগা। তাই আমার গিরিধারীর প্রাণ-গলানো মাধুর্যমূর্তি তুমি দেখতে পাও নি।"

অতঃপর মীরাবাঈ আর বেশীদিন চিতোরে অবস্থান করেন নি। গিরিধারীজীর অপ্রাকৃত লীলাধাম বৃন্দাবন তাঁকে বার বার জানাতে থাকে দুর্বার আহ্বান। সেবার থেকে কিছুদিনের জন্য তিনি মেড়তায় যান, তারপর উপনীত হন শ্রীধাম বৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনে এসেই সাধিকা মীরা অপূর্ব প্রেমাবেশে অধীর হন, অপার ঔৎসুক্য নিয়ে প্রভু শ্যামল কিশোরের নানা লীলাস্থানসমূহ দেখে তিনি বেড়াতে থাকেন।

বৃন্দাবনধামে তখন চৈতন্যপন্থী গৌড়ীয় গোস্বামীদের প্রবল প্রতাপ। সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি আচার্যের শাস্ত্রজ্ঞান,

মনীষা ও ভক্তিসিদ্ধির আলোকে ব্রজমণ্ডলের এক একটি অঞ্চল প্রদীপ্ত ক'রে বসে আছেন।

রূপ গোস্বামীব ভক্তিমধুর বচনাবলীর কিছু অংশ মীরা পাঠ করেছিলেন। মনে তাই প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠেছে, এই ভজনসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করবেন, বাগানুগা ভজনের উপদেশাদি শ্রবণ করবেন তাঁর শ্রীমুখ থেকে।

ইষ্টভজন গাইতে গাইতে প্রেমপ্রমত্তা কৃষ্ণময়ী মীরাবাঈ সেদিন রূপ গোঁসাইর ভজনকুটিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। তাঁর অনুরোধ শুনে, সেবকেবা গোঁসাইজীকে জানালেন—মেবাবের রাজপুত্রবধূ, প্রসিদ্ধ ভক্তি-সাধিকা মীরাবাঈ তাঁব দর্শন প্রার্থিনী।

ভজনকুটিরে বসে রূপ গোস্বামী তখন ধ্যানজপেই দিন রাতের বেশী সময় অতিবাহিত করেন। সাধারণত স্ত্রীলোকদেব দর্শন দিতে আজকাল চান না। মীরাকে এড়ানোব জন্য সেবকদের মাধ্যমে বলে পাঠালেন, যোষিৎ-দর্শন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, ভক্তিমতী মীরা যেন তাঁকে মার্জনা করেন।

মীরা দৃপ্তস্বরে বলে উঠলেন, "সে কি কথা। গোস্বামীজী কি বৈষ্ণবদেব চিবনমস্য ভাগবতেব পরম বাণী বিস্মৃত হযেছেন? বাসুদেব পুমানেকঃ স্ত্রীযমযমিতরজ্জগৎ—বাসুদেবই যে একমাত্র পুরুষ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেব আর সব কিছু হচ্ছে প্রকৃতি। আমি তো এতদিন জানতাম, বৃন্দাবনেব একমাত্র পুরুষ হচ্ছেন শ্যামলকিশোর পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ,

১ ভক্তমালেব বচয়িতা নাভাজী ও বাজস্থানেব লেখকদেব মতে মীবা এ সময়ে বৃন্দাবনে গিযে সাক্ষাৎ কবেন শ্রীজীব গোস্বামীব সঙ্গে। কিন্তু আধুনিক গবেষকদেব তথ্য বিচাবে দেখা যাব, মীবাবাঈ যে বৎসব বৃন্দাবনে যান, তাব মাত্র তিন বৎসব আগে শ্রীজীব বাবাণসী থেকে বৃন্দাবনে আসেন এবং পিতৃব্যদ্বয় সনাতন ও রূপেব উপদেশ গ্রহণ ক'বে বৈষ্ণবীয সাধনা ও শাস্ত্রচর্চা শুরু কবেন। এ সময়ে নবীন গোস্বামী শ্রীজীবেব কাছে না গিয়ে স্বনামধন্য সাধিকা মীবা বর্ষীযান্ সাধক রূপ গোস্বামীব কাছে উপদেশ প্রার্থিনী হবেন, এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ।

আব সবাই—প্রকৃতি। তবে বহুজনবন্দিত তত্ত্বদর্শী গোস্বামী আমার দর্শনে এত কুণ্ঠিত বা ভীত হচ্ছেন কেন ?"

বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণব নেতা এবার সহাস্যে ভক্তদের বললেন, "কৃষ্ণপ্রাণা মহাসাধিকা মীবাকে দূবে ঠেকিয়ে বাখার উপায় নেই। তাকে নিয়ে এসো আমাব সাক্ষাতে।"

প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচাব ক'বে ও মীবার রচিত কোনো কোনো ভজন বিশ্লেষণ ক'বে দেখা যায, বৃন্দাবনে গৌড়ীয় গোস্বামীদের সান্নিধ্যে এসে মীরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি সাধনাব অনুরাগিণী হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যেব ভগবত্তাব তত্ত্বকেও আন্তরিকভাবে তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন এবং স্বভাবতই তাঁর বৈষ্ণবীয় সাধনজীবন গৌড়ীয় ভাবধারাব দ্বাবা অনেকাংশে প্রভাবিত হযেছিল। মীবাব এক পদে মহাপ্রভুব অবতাব-রূপটি অপরূপ মহিমায ফুটে উঠেছে।

অব তো হরি নাম নাম লৌ লাগী
সব জগ কো যহ মাখন চোরা,
নাম ধরস্যো বৈবাগী।
কিত ছোড়ী য়হ মোহন মুরলী
কহঁ ছোড়ী সব গোপী।
মুড় মুড়াই ডোরি কটি বাঁধি,
মাথে মোহন টোপী।
মাত-জসোমতি মাখন কাবণ
বাংধে জাকো পায।
শ্যাম কিশোর ভযো নব গোরা,
চৈতন্য জাকো নায।
পীতাম্বর ভাব দিখাবৈ
কটি কোপীন কসৈ
গৌব-কৃষ্ণকী দাসী মীবা,
বসনা কৃষ্ণ বসৈ।

মাতাজী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী

পুরীর সমুদ্রতীর। পূর্ণিমা চাঁদের উদয় হয়েছে অনেকক্ষণ। ভুবন-ভোলানো আলোকধারা ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশের গায়ে গায়ে। নিচেও সমুদ্রবক্ষে উদ্বেল উন্মত্ত হয়ে উঠেছে বিপুল জলরাশি —ফেনিল তরঙ্গভঙ্গে অশ্রান্ত গর্জনে, বার বার তা আছড়ে পড়ছে বালুবেলায়।

রাত ক্রমে গভীর হয়, সৈকতচারীদের বেশীর ভাগ ফিরে যেতে থাকে নিজ নিজ আবাসে।

স্বর্গদ্বারের কাছে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে নীরব নিশ্চল হয়ে বসে আছেন একটি সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নেপালী তরুণী, সঙ্গে তাঁর সমবয়সী আর একটি মেয়ে। রাত অনেক হয়েছে, বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তরুণীকে নড়ানো যাচ্ছে না। বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের দিকে নির্নিমেষে তিনি তাকিয়ে আছেন, আর আয়ত নয়ন দুটি কি এক অজানা ব্যথায় হয়ে উঠেছে অশ্রুসজল।

এমনি সময়ে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ান এক প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনী। দীর্ঘায়ত তনু শিরে জটার ভার, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু। সহাস্যে পরিষ্কার নেপালী ভাষায় সন্ন্যাসিনী প্রশ্ন করেন, "মাঈ, কি দেখছো এমন উৎসুক হয়ে? মনে মনে ভাবছোই বা কি? ভেতর থেকে কান্না কেবলই গুমরে উঠছে—না?"

"কে আপনি, মা? আপনি কি অন্তর্যামিনী? আমার এ মর্ম বেদনার কথা আপনি কি ক'রে জানলেন?" ডুকরে কেঁদে ওঠেন তরুণী। লুটিয়ে পড়েন তাঁর চরণতলে।

সস্নেহে তাঁকে তুলে ধরে প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে সন্ন্যাসিনী বলেন, "ছাখো মা, সাগরের এই কিনারাতেই যত উৎপাত উপদ্রব, যত ঢেউ-এর চঞ্চলতা, আর ফেনার আবিলতা। গর্জন, তোলপাড়,

আঘাত, উন্মত্ততা নিরন্তর চলছে। এ যেন এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড, সব কিছু ভেঙে চুরমার ক'রে ফেলতে চায়। কিন্তু ঐ দূরে বহুদূরে তাকিয়ে ছাখো—সব কিছু শান্ত মধুর, অভয় শ্যামসুন্দর মূর্তি।. নয়ন মনপ্রাণ ভরে উঠবে ওখানে পৌছুলো।"

"মাগো, এরই জন্যেই তো কেঁদে মরছি এতকাল, কিন্তু পরম শান্তির, পরম মুক্তির, পথটি তো আজও খুঁজে পাইনি।"

"ওখানে যেতে হলে যে কিনারার এই ঢেউগুলো পার হতে হবে। কিন্তু একা একা তো পারা যাবে না, এজন্য চাই কৌশলী ও সুদক্ষ নাবিকের সাহায্য। তাঁর দয়া পেলে তবেই মানুষ হতে পারে নির্ভয়, নিরাপদ। নইলে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে বার বার ফিরে আসতে হবে, আছড়ে পড়তে হবে কিনারায়।"

সন্ন্যাসিনীর উদাস দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেল তরঙ্গায়িত সাগরের মহাবিস্তারে। ভাবাবেশে কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, "মা, এই সমুদ্রের যেমন দেখছো দুটো রূপ—ভীষণ আর অভয়, সসীম আর অসীম, চির চঞ্চল আর চিরশান্ত, ভগবানেরও তাই। সংসারটা যেন তাঁর সীমাবদ্ধ এবং ভীষণ চঞ্চলভাব, আর সংসারাতীত পরম ভাবটি হচ্ছে তাঁর শান্ত মধুর অভয়পদ। আর বুঝলে, মা, নাবিকের হাতে নিজেকে একেবারে সমর্পণ না করতে পারলে কিনারার এই ঢেউগুলোর ভয়ে জন্মজন্মান্তর আড়ষ্ট হয়েই কাটাতে হবে। এখানে এপারে কোনো শান্তি নেই মা, সত্যকার পরম শান্তি রয়েছে ওখানে।"

সন্ন্যাসিনীর অপরূপ সুঠাম মূর্তি, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আর আশ্বাসভরা বাণী তরুণীর সম্মুখে সৃষ্টি করল এক স্বর্গীয় মায়াজাল।

সজল চক্ষে তিনি মিনতি জানান, "মা, আশৈশব আমি যে স্বপ্ন দেখে এসেছি, ভগবৎ কৃপায় আজ বুঝি তা সফল হবে। আমার অন্তরাত্মা ডেকে বলছে, আপনিই আমার পরমাশ্রয়। দয়া করে আমায় চরণে স্থান দিন।"

তরুণীর চিবুক ধরে সন্ন্যাসিনী বার বার আদর করলেন, "মা,

তোমার সঙ্গে আজকের এই সাক্ষাৎ যে বিধি নির্দিষ্ট। বাত অনেক হযেছে, আজ তুমি ঘবে যাও, আবাব আমাদেব দেখা হবে।"

"কবে, কোথায় দেখা হবে কে জানে? না মা, দযা ক'বে যদি দর্শন দিযেছেনই, চলুন একবার আমাদেব কুঠিতে। আপনার সেবার সুযোগ দিযে আমাদেব কৃতার্থ করুন।"

"বাছা, দেখা তোমাব সঙ্গে যে হতে হবেই। তুমি আমায় জানো না, কিন্তু আমি তোমাব সব জানি। নেপালেব সুপ্রসিদ্ধ শাসক ধীরসিং সমসের জং বাহাদুরের কন্যা তুমি। নাম তোমাব বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই না?"

"হ্যাঁ মা, আপনি আমার পরিচয় ঠিকই বলেছেন।"

"মহা ভাগ্যবতী তুমি বাছা। তাইতো ধনীব দুলালী হযেও বাল্যকাল থেকে বেছে নিযেছো ত্যাগ বৈবাগ্যেব পথ, মুক্তিব জন্য হযেছো এত উতলা। বাছা আশীর্বাদ করি, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক।"—বলতে বলতে সন্ন্যাসিনী অন্ধকাবাচ্ছন্ন বেলাভূমি দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হযে গেলেন। ভাবাক্রান্ত মনে, অশ্রুসজল-চোখে বিষ্ণুপ্রিযা তাঁর সঙ্গিনীকে নিযে ফিরে এলেন আপনার ভবনে।

অতঃপব কযেকদিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু কই সন্ন্যাসিনীর দর্শন তো আব পাওয়া গেল না? প্রাণের ব্যাকুলতায বিষ্ণুপ্রিযা অস্থির হযে ওঠেন। ধাত্রীকন্যা বিমলা, তাঁব সর্বসমযের সাঙ্গনী, অতি অন্তরঙ্গ। তাকে ডেকে অনুনয ক'রে বলেন, "সন্ন্যাসিনী মাতা চলে যাবাব সময থেকে সাবা হৃদয আমাব হুহু করছে, ধৈর্য ধরা আর সম্ভব হচ্ছে না। স্থির করেছি, তাঁর আশ্রয আমি নেবো, নেবো সন্ন্যাসদীক্ষা। বিমলা তুই একবার শহরের পথঘাট ঘুরে আয। যে ক'রেই হোক, তাঁব সন্ধান আমায এনে দে।'

একি কথা? বিমলা ভীতা হযে ওঠে, প্রমাদ গণে। বলে, "চুপ-চুপ, সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে ঘব ছেডে যাবে, একথা মুখেও এনো না। তোমার বড ভাই, বড় বানা বীরসিংজী যদি এসব শোনেন,

তাহলে কারুর আর বক্ষে রাখবেন না। তুমি শান্ত হয় বিষ্ণুপ্রিয়া। বিদেশে এই তীর্থস্থানে নতুন জটিলতার সৃষ্টি ক'রো না।"

চুপ ক'রে যান বিষ্ণুপ্রিয়া, কিন্তু অন্তরের আর্তি দূর হয় না। সৈকতে আবির্ভূতা সেদিনকার সেই সন্ন্যাসিনীর স্মৃতি যেন তাঁর সারা সত্তায় জুড়ে বসে আছে।

অতঃপর একদিন সন্ন্যাসিনীর দর্শন মিলল, একটি নবীনা শিষ্যাকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন ভোরবেলায় তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াদের বাসভবনে এসে উপস্থিত। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ তো দর্শন পেয়ে মহা আনন্দিত। সাদর সংবর্ধনা জানিয়ে সন্ন্যাসিনীকে গৃহের ভেতরে এনে বসালেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ছুটে এলেন দ্রুতপদে, সন্ন্যাসিনীর চরণে নিবেদন করলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

আলাপ পরিচয় শুরু হল। জানা গেল, সন্ন্যাসিনীও নেপালী কন্যা। শুধু তাই নয়, নেপাল রাজবংশের গুরুকুলে তাঁর জন্ম। আম্বালার প্রখ্যাত যোগীরাজ সহজানন্দ সরস্বতীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা এবং পিতামহও ছিলেন এই যোগীরাজের মন্ত্রশিষ্য। দীক্ষার পর গুরু নব নামকরণ করেছিলেন—অদ্বৈতানন্দ সরস্বতী। প্রধানত পরিব্রাজন ও তপশ্চরণ ক'রেই আজকাল অতিবাহিত হচ্ছে তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমের দিনগুলো।

মাতাজী ও তাঁর শিষ্যার যথোপযুক্ত অ্যাপায়ন করা দরকার। গৃহকর্ত্রী, বীরসিংজীর স্ত্রী তাই ত্রস্তব্যস্তে গৃহান্তরে চলে গেলেন। এই অবসরে বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনী মাতার সকাশে নিবেদন করলেন তাঁর প্রাণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। করজোড়ে বললেন, "মাতাজী, সেদিন সমুদ্রতীরে আপনার দর্শন পাবার পর থেকেই আমি যেন আর আমাতে নেই। এ ক'দিন সারা মনপ্রাণ তৃষিত চাতকের মতো আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আপনার চরণে আমি আত্মসমর্পণ ক'রে বসেছি। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, কৃপা ক'রে আপনি আমায় দীক্ষা আর সন্ন্যাস দিন। আপনার নির্দেশে তপস্যায় ব্রতী হয়ে এ জীবন সফল ক'রে তুলি।"

"কিন্তু মা, সন্ন্যাসজীবন যে বড় কঠোব। ধনীব ঘবেব দুলালী তুমি সে কঠোবতা কি সহ্য কবতে পাববে?" স্নিগ্ধস্ববে প্রশ্ন কবেন মাতাজী অদ্বৈতানন্দ।

"মা, আমাব চাইতে অনেকগুণ ভোগবিলাসময় জীবনে পালিত হযে আমাদেব নেপালেবই অন্যতম বাজপুত্র গৌতম কি সন্ন্যাসেব কৃচ্ছ্র হাসিমুখে সহ্য কবেন নি? তাঁব তুলনায আমবা তো অতি নগণ্য। না মা, নিজ সংকল্প থেকে আমি বিচ্যুত হচ্ছিনে। আপনি দযা ক'বে আমাব অভীষ্ট পূবণে সহায়তা করুন।"

"এজন্যই যে আমাব এখানে আসা মাঈ।" স্মিতহাস্যে মৃদুস্ববে বলেন মাতাজী।

বিষ্ণুপ্রিযাব ধাত্রীমা আব তাঁব কন্যা বিমলা এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। সভযে তাঁবা বলে ওঠেন, "বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তুমি কি কবতে যাচ্ছো? তোমাব দাদা বীবসিংজী একথা শুনতে পেলে যে মহাবিপদ হবে। আমবা সবাই তোমাব দেখাশুনা কবি, আমাদেব গর্দান তো যাবে সবাব আগে। তোমাব পিতাব দেহান্তেব পব থেকে বড ভাই বীবসিংজীই তোমাব সব কিছু দাযিত্ব গ্রহণ কবেছেন, পবম আদবে তিনি লালন কবেছেন আব হাসিমুখে সহ্য কবেছেন তোমাব যত কিছু আব্দাব। সাবা ভাবতেব তীর্থে তীর্থে সস্ত্রীক তিনি ঘুবে বেড়াচ্ছেন তোমাব প্রাণে শান্তি মিলবে বলেই। এ হেন ভাইকে না জানিযে, আব অনুমতি না নিযে, সন্ন্যাসিনী হওযা তোমাব উচিত হবে না, তা বলে বাখছি।"

মাতাজী অদ্বৈতানন্দ ঋজু হযে বসেন, ধীরে গভীব কণ্ঠে বলেন, "ছাখো, সন্ন্যাস নেবাব অনুমতি বিষ্ণুপ্রিযা তাব দাদাব কাছ থেকে কোনোদিন পাবে না। অথচ এ সন্ন্যাস তাকে নিতে হবেই। শ্রীভগবানেব বিধানে আগে থেকেই এটা নির্দিষ্ট হযে আছে। লগ্ন এবাব সমাগত। সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ কবাব পব বিষ্ণুপ্রিযা অবশ্যই তাব দাদাকে সব খুলে বলবে। শুভবুদ্ধি দিযে তিনি এ পবিস্থিতি মেনেও নেবেন।"

"কিন্তু আমরা কি ক'রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে প্রাণে বাঁচবো ?"— কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ধাত্রী-মা।

"ভয় নেই, তুমি আর তোমার মেয়ে বিমলাও তার সঙ্গিনী হবে— এই সন্ন্যাস আশ্রমে। হ্যাঁ, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তোমাদের দুজনকেও আমি দেবো সন্ন্যাস। শুভসংস্কার নিয়ে তোমরা জন্মেছো, সুফল ফলবার সময় এবার এসে গিয়েছে।"

ধাত্রী-মার নয়ন দুইটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "মাতাজী, তুমি পরম কৃপাময়ী, তাতে সন্দেহ নেই। জরা বার্ধক্যের ভারে দেহ ন্যুব্জ, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমি দাঁড়িয়েছি। এ সময়ে তোমার কৃপায় যদি উদ্ধার পাই, সে তো আমার জন্ম-জন্মান্তরের পরম সৌভাগ্য। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে আমার মেয়ে বিমলার ভারও তুমি নিচ্ছো—এ জেনে তার সম্বন্ধে আজ আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হলাম।"

নিম্নস্বরে তিনজনকে কিছু কিছু নির্দেশাদি দিয়ে মাতাজী নীরব হন। তারপর বীরসিংজী ও তাঁর স্ত্রীর আপ্যায়ন ও প্রণাম নিবেদন শেষ হলে, সঙ্গিনীসহ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসেন সেই ভবন থেকে।

রাত্রি তখন শেষ হয়নি, আকাশের ঘন অন্ধকার সবেমাত্র তরল হতে শুরু করেছে। দূর দিগন্তে জ্বল্‌জ্বল্ করছে দু'চারটি নক্ষত্র। ধাত্রীমা আর বিমলাকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া নিষ্ক্রান্ত হলেন গৃহ থেকে। দেহ নিরাভরণ, পরনে আটপৌরে শাড়ী, দেউড়ীর দারোয়ানেরা ভাব্‌ল এরা সবাই প্রত্যূষে সমুদ্র-স্নানে যাচ্ছেন।

তিনজনে দ্রুতপদে গিয়ে উপস্থিত হলেন মাতাজী অদ্বৈতানন্দের নিভৃত কুটিরে।

মাতাজীর চোখ মুখ প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন, "তোমরা ঠিক সময়েই এসে গিয়েছো। লগ্ন উপস্থিত। তাড়াতাড়ি মস্তক মুণ্ডন ক'রে সমুদ্রস্নান সেরে নাও।"

সব আয়োজন পূর্ব থেকেই ঠিক করা ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া ও তাঁর

সঙ্গিনীদ্বয় স্নান সেরে ফিরে এলে শুরু হল বিরজা হোম। সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করার পর বিষ্ণুপ্রিয়ার নামকরণ করা হল—জ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

অনুষ্ঠানের শেষে গুরু বহুক্ষণ ধরে সবাইকে দান করলেন সাধনোপদেশ। তারপর নির্দেশ দেওয়া হল, নব দীক্ষিতেরা যেন ভিক্ষায় বহির্গত হন এবং পূর্বাশ্রমের গৃহ থেকেও যেন তণ্ডুলকণা সংগ্রহে ভুল না হয়।

রানা বীরচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী ভোরে উঠে দেখলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁর ধাত্রী ও বিমলা ঘরে নেই। দারোয়ানের কাছে খোঁজ নেবার পর তাঁদের ধারণা হল, খুব সকালে উঠেই ওরা সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েছে। বেলা অনেক হল তবুও কারুর দেখা নেই। বীরচন্দ্রের স্ত্রী ক্রমে বড় উতলা হয়ে পড়লেন। সমুদ্রতটের সর্বত্র লোকজন পাঠানো হল, কিন্তু কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। পুরীর মন্দিরের আশেপাশে এবং রাজপথে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কোনো ফলোদয় হল না, রানাভবনে এবার নেমে এল নৈরাশ্য আর বিষাদের কালো ছায়া।

বেলা তখন প্রায় বারোটা। নগ্নপদ, মুণ্ডিতমস্তক, তিন নব সন্ন্যাসিনী রানাভবনে প্রবেশ করলেন, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন অন্দর মহলের দিকে। দেউড়ীর সিপাহীরা এ বেশে কাউকে চিনতে পারে নি, কিন্তু বাড়ির দাসীদের চিনতে ভুল হল না। রানার অতি আদরের দুলালীর একি ভিখারিণী বেশ। কাষায় পরিহিতা, মুণ্ডিত শির প্রভুকন্যার কাঁধে ঝোলানো রয়েছে ভিক্ষার ঝুলি। এ বড় মর্মান্তিক দৃশ্য। পরিচারিকারা আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল। বীরচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী কান্না ও কলরব শুনে ছুটে এলেন।

সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দ ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "তোমরা দয়া ক'রে আমায় কিছু তণ্ডুল ভিক্ষা দাও।"

রানা ও রানার স্ত্রী ভেঙে পড়লেন দুঃখ, ক্ষোভে আর কান্নায়।

একটু স্থির হবার পর শুরু হল তাঁদের অনুরোধ উপরোধের পালা। ভ্রাতৃজায়া মিনতি ক'রে বললেন, "বেশ, যদি তুমি চিরতরে গৃহত্যাগ ক'রে চলেই যাও, তোমার পিতার দেওয়া অর্থ, অলংকার, হীরা জহরৎ যা আমাদের কাছে গচ্ছিত রয়েছে সে সবও নিয়ে যাও। ভালো একটা মঠ তৈরি ক'রে স্থায়িভাবে সেখানে বসবাস করো। আমরাও তোমার সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হই।"

কিন্তু সব চেষ্টাই হল ব্যর্থ। ভিক্ষা ঝুলিতে শুধু একমুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ ক'রে নিয়ে মাতাজী জ্ঞানানন্দ সঙ্গিনী সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে ফিরে গেলেন গুরুর কুটিরে।

প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনে জীবনের চির অভ্যস্ত রানা কন্যার এবার অভিযাত্রা শুরু হল কৃচ্ছ্রময় সন্ন্যাস জীবনের পথে। দীর্ঘ ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপশ্চর্যার পর হলেন তিনি আপ্তকাম।

নেপাল রাজপরিবারের দুহিতা এই সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীই উত্তরকালে সারা ভারতে পরিচিতা হয়েছিলেন মাতাজী জ্ঞানানন্দ নামে। তাঁর তপস্যাপূত জীবনের কল্যাণধারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল পূর্বভারতের নানা অঞ্চলে। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়েছিল, এগিয়ে গিয়েছিলেন দিব্য জীবনের আলোক-দীপ্ত পথে।

ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতিময় জীবনে নেপাল রাজ্য এক অসামান্য স্থান অধিকার ক'রে আছে। হিমালয় ক্রোড়স্থিত এই পুণ্যভূমির হৃদয়ে বিরাজিত রয়েছেন পরম জাগ্রত বিগ্রহ পশুপতিনাথ, আর শীর্ষে তার ঝলমল করছে গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। তুষারমৌলি ধবলগিরি আর কাঞ্চনজঙ্ঘার মহিমময় রূপ যুগ যুগ ধরে উজ্জীবিত করে আসছে অগণিত সাধক ও শিল্পীজনকে। এই নেপাল থেকেই সমতলভূমে নেমে এসেছে পরম পবিত্র গণ্ডকী নদী—গর্ভে যার সতত আবির্ভূত হচ্ছেন নারায়ণ-শিলা। শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত

স্রোতস্বিনী সবয়ূ ও কৌশিকী হিমালয হতে নিঃসৃত হযে পুণ্যময় ক'বে তুলেছে নেপালভূমিকে।

এতো গেল প্রাচীন যুগেব কথা। আড়াই হাজাব বছব আগেও দেখি, এই নেপালেব বাজপুত্র গৌতম তাঁব ইহজীবনেব সমস্ত কিছু ত্যাগ ক'বে লাভ কবেছেন মহাসম্বোধি, আব অকৃপণ কবে তা ছডিযে দিযেছেন বহুজনেব হিতেব জন্য, মহামুক্তিব জন্য। হাজাব বছর আগেও নেপালেব পবিত্র ভূমিতে সাধনপীঠ বচনা কবতে দেখি শিবকল্প মহাসাধক মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোবখ্‌নাথকে।

মধ্যযুগেও আমবা দেখি, মুসলমানেব আক্রমণ ও অত্যাচাবে যখন সাবা উত্তব ভারত শঙ্কাকুল—বিপন্ন, তখন এই নেপালই আশ্রয় দিযেছে হিন্দু সাধনাব ধাবক ও বাহক শত শত পণ্ডিত ও সাধককে। আজও এই স্বাধীন, চিব উন্নত-শিব হিন্দুবাজ্যে সংবক্ষিত বযেছে অজস্র সংখ্যক মূল্যবান শাস্ত্রগ্রন্থেব পাণ্ডুলিপি।

এই মহিমময নেপালেই আবির্ভূত হন মাতাজী জ্ঞানানন্দ সবস্বতী। তাবপব উত্তবকালে তাঁব মহাজীবনেব পুণ্যলীলা ও কল্যাণ ধাবাকে ছড়িয়ে দেন এদেশেব দিগ্‌বিদিকে।

মাতাজীব পিতাব নাম ধীবসিংহ সমসেব জং বাহাদুব বানা। নেপালেব প্রশাসনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকাব কবতেন। ব্যক্তিগত জীবনে রানাজী ছিলেন উদাবচেতা পবমধার্মিক। বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানে ও যাগযজ্ঞে ছিল তাঁব প্রবল উৎসাহ। চিবকাল বিলাসে লালিত হযেও ধর্মাচবণেব জন্য যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্র তিনি স্বীকাব কবতেন, তা জনসাধাবণেব শ্রদ্ধা ও বিস্মযের উদ্রেক কবতো। বানা ভবনে নিত্য নাবাযণ-শিলাব অর্চনাব ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া, নিত্যকাব পূজা হোম ও ব্রত উদ্‌যাপনেব সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো সাধু এবং ব্রাহ্মণদেব ভোজন আব অনাথ-আতুব ভিক্ষুকদেব সেবা।

তখন মাঘ মাস। পশুপতিনাথজীব শিববাত্রি উৎসবের কযেকটি দিন মাত্র বাকী। ধীরসিংজী স্থিব কবলেন, এবাব উৎসব সমাপ্ত হযে

গেলে সপরিবারে ভারতের কয়েকটি তীর্থদর্শনে বহির্গত হবেন। একদল আত্মীয়স্বজন, কর্মচারী পুরোহিত এবং দাসীরাও সঙ্গে যাবে। প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেল।

চতুর্দশীর আগের দিন নিশীথরাত্রে ধীরসিংজী দর্শন করলেন এক বিচিত্র স্বপ্ন। কুলদেবতা নারায়ণ-শিলার পূজা ও ভোগরাগ এ গৃহে প্রতিদিন নিষ্ঠাভরে ও জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। দেখলেন, —মাঘ মাসের তীব্র শীতেও শ্রীবিগ্রহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর প্রস্তর কলেবর নিঃসৃত এই ঘর্মধারা উপাধান ও শয্যাকে সিক্ত ক'রে টপ্ টপ্ ক'রে গড়িয়ে পড়ছে মন্দিরতলে। আর রানাজী এগিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধাভরে অঞ্জলিপুরে তা পান করছেন।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ক'রেই রানা তাঁর পত্নীকে ডেকে তুললেন। সবিস্তারে খুলে বললেন গত রাত্রের স্বপ্ন বৃত্তান্ত।

রানা-পত্নী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "সে কি গো! আমিও যে রাত্রে ঠিক একই রকমের অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, আর ঐ ঘর্মজল আমিও করেছি পান।"

ত্রস্তপদে উভয়ে ছুটে গেলেন মন্দিরে। পূজারীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা হল শ্রীবিগ্রহের শয্যা ও কলেবর। সত্যিই তো, এখনো তা সিক্ত রয়েছে এবং পূজাবেদীর নিচে গড়িয়ে পড়েছে ঘর্মজলের ধারা।

পূজারী বেচারা তো ভয়ে কাঠ, এবার বুঝি তাঁর প্রাণ যায়। আর্ত কণ্ঠে করজোড়ে বলে ওঠেন, "রানাজী, দোহাই আপনার, প্রভুর সেবায় আমি কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর শীতের রাতে শ্রীঅঙ্গ যে এত ঘেমে উঠবে তা আমি বুঝতে পারিনি। একি অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাণ্ড। এ ব্যাপারে আপনারা যেন আমায় দোষী সাব্যস্ত করবেন না।"

ধীরসিংজী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। শ্রীবিগ্রহের সিক্ত শয্যা ও পরিচ্ছদ নিংড়ে ঘর্মজল বার করা হল, স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে তা পান করলেন পরম শ্রদ্ধাভরে।

শঙ্কিত পূজারীব দিকে তাকিযে বানা এবাব স্মিত হাস্যে বলেন, "আপনাব কোনো অপবাধই নেই। প্রভুজীই এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন, হয়তো আমাদেব কৃপা কববেন বলে। নিন, প্রভুব কষ্ট হচ্ছে, আপনি তাড়াতাড়ি শয্যা ও পরিচ্ছদ সব বদলে দিন।"

কয়েকদিনেব ভেতরেই ধীরসিংজী বেবিযে পড়েন তাঁর পবিকল্পিত তীর্থ ভ্রমণে। তাবপব বিগত হল মাসেব পব মাস। ভ্রমণের শেষেব দিকে সদলবলে তিনি পাটনায এসে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে জানা গেল, বানাপত্নী অন্তঃসত্ত্বা হযেছেন। এবাব পত্নীব বিশ্রাম অতি আবশ্যক। মনস্থ করলেন, সবাইকে নিয়ে কিছুদিন এখানকাব গঙ্গা বক্ষেই অবস্থান কববেন।

অতঃপব একদিন এক শুভলগ্নে মাতৃঅঙ্ক শোভিত কবে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেব এক প্রভাতে ভূমিষ্ঠ হলেন সুলক্ষণা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, উত্তব কালেব মহাতপস্বিনী মাতাজী জ্ঞানানন্দ সবস্বতী।

মাতাজী উত্তরকালে ভক্তদেব কাছে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার পিতাজীর বিশ্বাস ছিল, নাবাযণ বিগ্রহের ঘর্মজল পান করাব ফলেই আমার জন্ম। তাই আমার নাম বেখেছিলেন তিনি—বিষ্ণুপ্রিয়া। আদবেব ডাকনাম ছিল লিচু। পিতাজীর সবচাইতে আদবেব কন্যা ছিলাম। একটু কিছুতেই অভিমানে আমার চোখ বেয়ে দবদর ধাবে জল ঝবতো পাকা লিচুফলেব মতো। পিতাজী তাই বহস্য ক'রে ডাকতেন লিচু বলে।"

পাটনার নিকট অঞ্চলেব প্রধান তীর্থগুলি দর্শনেব পব বানা ধীরসিংজী কাঠমাণ্ডুতে প্রত্যাবর্তন কবলেন। কিন্তু দেশেব মাটিতে পদার্পণেব অল্পকাল মধ্যেই তাঁব জীবনে ঘটে গেল এক বিযোগান্ত ঘটনা। স্বামীব ক্রোড়ে নবজাত আদবিণী কন্যাকে তুলে দিযে বানা-পত্নী চিবতবে ত্যাগ ক'বে গেলেন মবধাম।

এখন থেকে এই শিশুকন্যাব লালনেব ভাব পড়ল ব্রহ্মচাবিণী পিসিমাতা আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর ওপব। বানা ধীবসিংজীব পুত্রকন্যা

কয়েকটি, কিন্তু এদের ভেতর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন পিতার সব চাইতে আদরের। বিশেষ ক'রে শৈশবে মাতৃহীনা হওয়ায় এ মেয়েটির জন্য রানার স্নেহ-মমতার অন্ত ছিল না। ছোটবেলা থেকে অতিরিক্ত আদরে যত্নেই তাকে তিনি লালন-পালন করতে থাকেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন পাঁচ-ছয় বৎসরের বালিকা। সুযোগ পেলেই পিসিমার কাছে গিয়ে তিনি উপস্থিত হতেন, শুনতেন পুরাণের নানা মনোরম উপাখ্যান। বালক রাজপুত্র ধ্রুবের বনগমনের কথা, শ্রীহরি দর্শন লাভের জন্য তার দুশ্চর তপস্যার কথা, কি জানি কেন বালিকার হৃদয় চঞ্চল ক'রে তুলতো—জন্মজন্মান্তরের শুভসংস্কার হয়ে উঠতো উজ্জীবিত।

প্রাসাদসংলগ্ন নিভৃত বাগিচায় প্রবেশ ক'রে, বৃক্ষতলে বসে, বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু এতো বালিকা-সুলভ আচরণ নয়। একি অদ্ভুত ব্যাপার? তার এধরনের কাণ্ড দেখে অন্তঃপুরিকাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকতো না।

এ বালিকার আর এক বিশেষত্ব, তার অসাধারণ ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা। ধীরসিংজী তাই এখন থেকেই কন্যার উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্যের পাঠ দেবার জন্য একটি দক্ষ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হল। কিন্তু এই শিক্ষাদান বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি, কারণ বাল্য এবং কৈশোরে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বাস্থ্য তেমন ভালো থাকতো না। অনেক কিছু ভেবেচিন্তে পিতা অগত্যা তার ওপর থেকে দৈনন্দিন পাঠের চাপ সরিয়ে নিলেন। এখন থেকে ব্রহ্মচারিণী সাধিকা, পিসিমাতার সান্নিধ্যে থেকেই এবং প্রধানত তাঁর প্রভাবেই, গড়ে উঠতে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্জীবন।

প্রাসাদের মন্দিরে পূজা পাঠ লেগেই আছে। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া দু'বেলাই সোৎসাহে এতে যোগদান করেন। পণ্ডিতদের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে শুনে বাল্মীকি রামায়ণ আর তুলসীর রামচরিতমানস তার প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে ওঠে।

রামসীতার ওপর বিষ্ণুপ্রিয়ার ছিল অচলা ভক্তি। পিতার কাছে

আব্দার শুরু হল—সোনার রামসীতা বিগ্রহ তাকে এনে দিতে হবে। ধীরসিংজী কন্যাকে যতই বলেন—এ বয়সে বিগ্রহ পূজার দায়িত্ব কেন নিতে যাবে? কিন্তু তাকে বোঝানো দায়, একথায় কর্ণপাত করতে সে রাজী নয়।

কন্যা আশৈশব মাতৃহীনা, তাই স্নেহশীল পিতার পক্ষে তাকে এড়ানো বড় কঠিন। রানাজীর আদেশে অচিরে স্বর্ণবিগ্রহ এসে গেল, আর এখন থেকে তা-ই হয়ে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান জ্ঞান।

ব্রহ্মচারিণী পিসিমাতার গুরুদেব সেবার প্রাসাদে এসে উপস্থিত। ইনি একজন উচ্চকোটির মহাত্মা। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে আবেদন জানায় তাঁর কাছে, "প্রভু, সীতারামজীর দর্শন আমি চাই, এজন্য কি সাধনভজন আমায় করতে হবে, বলে দিন।"

একি অদ্ভুত আব্দার এই বালিকার? গুরুদেব সবিস্ময়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তার দিকে। কিন্তু শেষটায় তাঁকে রাজী হতে হয়, সস্নেহে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোলে তুলে নেন, শিখিয়ে দেন ওঙ্কার সাধনের নিগূঢ় প্রক্রিয়া। স্নেহপূর্ণ স্বরে বলেন, "মা, তুমি এই নিয়ে অভ্যেস করো, ধীরে ধীরে ভেতরের কবাট খুলে যাবে।"

উপদেশ অনুযায়ী বালিকা ঐ সাধন শুরু ক'রে দেয়। কয়েক দিন যেতে না যেতেই দেখা যায়, এক অভূতপূর্ব অস্ফুট ধ্বনি অহরহ সে অনুভব করছে।

একথা শুনে মহাত্মাটি মন্তব্য করেছিলেন, "এ যে অনাহত ধ্বনি। বড় শুদ্ধ আধার তো এই বালিকা। উপযুক্ত গুরু ও সাধন প্রাপ্ত হলে উত্তর জীবনে অবশ্যই ঘটবে এর পরমপ্রাপ্তি।"

অতঃপর নিয়মিত ধ্যান ধারণা এবং সীতারামজীর অর্চনায় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রায় তিন বৎসর কেটে যায়। এবার সে পদার্পণ করে ত্রয়োদশ বৎসরে। পিতা ধীরসিংজী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মেয়ের বিয়ের জন্য, সুযোগ্য বরের জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া কিন্তু এবার একেবারে বেঁকে বসল। বিয়ে সে কখনো

করবে না, সংসার বন্ধনের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে সে রাজী নয়। সারা জীবন ইষ্টদেব সীতারামজীর পূজাধ্যানে কাটিয়ে দেবে; তাই তার সংকল্প।

ভ্রাতৃবধূ আর পিসিমা অনেক ক'রে মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, "কেন? সতী, সীতা, দময়ন্তী এই সব মহীয়সী নারী কি বিবাহিত জীবন-যাপন করেন নি? কোন্ সন্ন্যাসিনী বা যোগিনী তাঁদের চাইতে বড়, বলতো?"

কিন্তু কোনো যুক্তিতর্ক অনুরোধ উপরোধেই কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াকে টলানো সম্ভব হয় না।

এদিকে রানাজী দেশের এক সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে পাত্র নির্বাচন ক'রে ফেলেছেন। ছেলেটি সৎ, সুদর্শন ও অশেষ গুণসম্পন্ন। সে যে এই কন্যার উপযুক্ত বর সে-বিষয়ে কারুর দ্বিমত নেই। একদিন শুভক্ষণ দেখে বিয়ের পাকা কথাও দেওয়া হয়ে গেল।

বিষ্ণুপ্রিয়া কিন্তু অন্তঃপুরিকাদের দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দেয়—বিবাহের সে ঘোর বিরোধী, আজীবন ব্রহ্মচারিণী হয়েই সে কাটিয়ে দেবে। এ বিয়ের সম্বন্ধ যেন অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হয়। নতুবা সে জীবন বিসর্জন দিতে পশ্চাদ্‌পদ হবে না।

সকলে মহাপ্রমাদ গণলেন। বিয়ের পাত্র, দিন-ক্ষণ, সব কিছু যে স্থির হয়ে গেছে। এখন তবে উপায়? রানাজীকে সবিস্তারে সব কথা জানানো হল। কন্যার দৃঢ় মনোভাবের কথা শুনে চিন্তিত ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

সেদিন বিষ্ণুপ্রিয়া সবে তার পূজাধ্যান সমাপণ ক'রে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় পিতা প্রবেশ করলেন তার কক্ষে। ধীরসিংজী দক্ষ প্রশাসক ও সুচতুর রাজনীতিক। আসন পরিগ্রহ ক'রেই কন্যার সঙ্গে শুরু করলেন তার রুচি এবং প্রবণতা অনুযায়ী নানা প্রসঙ্গ। সীতারামজীর সিংহাসন কেমন হয়েছে, পূজা-অর্চনার আরো কি ভালো ব্যবস্থা করা যায়—এমনি সব কথা বলে কন্যাকে উৎসাহিত ক'রে তুললেন। তারপর বলে ফেললেন মনের আসল কথাটি,—

"দ্যাখো, মা, তোমাব ইষ্টদেব সীতাবামজীব কোন্ গুণটি আমাব কাছে সব চাইতে বড মনে হয, তা জানো ? তা হচ্ছে তাঁব অসাধারণ পিতৃভক্তি। পিতৃসত্য পালনেব জন্য বাজ্য ছেড়ে তিনি বনবাসে চলে গেছেন, চবম আত্মত্যাগেব পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অধিকাব করেছেন কালজযী আসন। এখানে আমাব প্রশ্ন, তোমাবও কি উচিত নয়, পিতৃসত্য পালনেব জন্য সর্ববকমেব ত্যাগ স্বীকাব কবা ? তোমাব বিযেব সম্বন্ধ স্থিব ক'বে পাত্রপক্ষকে আমি কথা দিযেছি, সে কথা বাখতে না পাবলে আমি ও আমাব পিতৃপুরুষ অধোগামী হবো। এব চাইতে আমাব মৃত্যু অনেক বেশী কাম্য। তুমি কি তোমাব ইষ্টদেবেব কথা স্মবণে বেখে, তোমাব পিতৃসত্য ও পিতাব প্রাণ মান রক্ষা কববে না ?"

বলতে বলতে রানাজীব চোখ দুটি অশ্রুসজল হযে এল, আব আদবিণী কন্যা বিষ্ণুপ্রিযাও ভেঙে পড়লেন কান্নায, লুটিয়ে পড়লেন পিতাব স্নেহময কোলে।

তাকে কিছুকাল সান্ত্বনা দেবাব পব বানা বলে উঠলেন, "তা হলে মা বিষ্ণুপ্রিযা, তোমাব এতে অমত নেই! বিয়েব দিন নির্ধাবিত হয়েই আছে, ঐদিনেব জন্য আমবা এবাব প্রস্তুত হই। কি বল ?"

"বেশ সীতাবামজীর চবণ স্মরণ ক'বে পিতৃসত্য আমি পালন কববো, পিতাজী,"—মৃদুস্ববে সম্মতি জানায বিষ্ণুপ্রিযা।

কযেকদিন অতীত হয়েছে। কন্যাব শুভবিবাহেব দিনটি প্রায় সমাগত। উৎসবেব প্রস্তুতিতে প্রাসাদ সরগবম। অন্তঃপুবিকাবা সবাই উৎসাহে আনন্দে ভবপুব। কিন্তু বিযেব কনেব মুখে নেই এতটুকু হাসি, নেই কোনো উৎসাহ, উজ্জ্বলতা। সাবাদিন থাকে সে চিন্তাকুল, বিষাদাচ্ছন্ন।

স্নেহময়ী গুরুজনেবা নানা কথায বিষ্ণুপ্রিযাকে সান্ত্বনা দেন, উৎসাহ দেন আসন্ন সংসাব-জীবনকে সানন্দে ববণ ক'বে নেবাব জন্য।

বিয়েব আব মাত্র তিনদিন বাকী। সেদিন ভোব হতে না হতেই বিষ্ণুপ্রিয়া চঞ্চলপদে ব্রহ্মচাবিণী পিসিমাব কক্ষে এসে উপস্থিত।

"হ্যাঁরে, আজ যে তোব চোখে মুখে আনন্দ উথ্‌লে পড়ছে? কি ব্যাপাব, বলতো?" স্মিতহাস্যে পিসিমা প্রশ্ন কবেন।

"সব কথা বলতেই তো তোমাব কাছে এলুম, পিসিমা। জানো, ইষ্টদেব সীতাবামজীব কৃপা হয়েছে। আমাব প্রাণেব কথা তিনি শুনেছেন। কাল বাতে স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে গেলেন। বললেন, 'ওগো, আগে থেকেই এত ভেবে মরছো কেন? তোমার বিয়ে যে এজন্মে হবে না, তাতো আগে থেকেই রয়েছে বিধি-নির্দিষ্ট। যাও, আব নিবানন্দে থেকো না।' আমাব মনে আর কোনো গ্লানি নেই, পিসিমা। তোমবা যতই হৈচৈ কবো, দেখো—এ বিয়ে ভেঙে যাবে। প্রভুজীব কথা কি কখনও মিথ্যে হয়?"

ভ্রাতুষ্পুত্রীব কথা শুনে চমকে ওঠেন পিসিমা, দুশ্চিন্তাও কম জাগে না। স্বপ্ন সব সময সত্য হয় না, আবাব হয়ও তো। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে? আদব ক'রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে টেনে নিযে বলেন, "লীলাময শ্রীভগবানেব যা অভিরুচি, তাই হবে। কিন্তু তুই যেন এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলবিনে। প্রাসাদেব কেউ যেন ঘুণাক্ষবে এ বিষয জানতে না পাবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়াব মনেব মেঘ, দুঃখভাব, সব কিছু এবাব অপসাবিত হযে গিযেছে। উৎফুল্ল অন্তবে চঞ্চলপদে সেখান থেকে ছুটে বেবিযে যায।

পবদিনই প্রাসাদে খবব এল বিবাহেব পাত্র আকস্মিক কালবোগেব আক্রমণে ইহলোক ত্যাগ কবেছে। বানা ধীবসিংজী নৈবাশ্যে ভেঙে পড়লেন, উৎসবমুখর প্রাসাদের আলো-গান-হাসি-আনন্দ নিযতিব নিষ্ঠুর আঘাতে একমুহূর্তে কোথায মিলিয়ে গেল।

কিছুদিন পবে ধীবসিংজীকে সবিস্তাবে জানানো হল কন্যাব এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত। এমনিতেই কিশোবী বিষ্ণুপ্রিযা বিবাহেব ঘোব বিবোধী, ব্রহ্মচাবিণী হযে সাধনভজনেব পথ অনুসবণ কববে বলে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তার ওপর দেখা যাচ্ছে দৈবের এই প্রতিকূলতা। তাই ধীরসিংজী ভেবেচিন্তে স্থির করলেন, অতঃপর কন্যার বিয়ের কথা নিয়ে আর তিনি মাথা ঘামাবেন না। এবার থেকে তার ঈপ্সিত অধ্যাত্মজীবনের পথই সে অনুসরণ ক'রে চলুক।

কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দের অবধি নাই। সংসারজীবনে আর তাকে জড়িয়ে পড়তে হবে না, প্রাণের ইচ্ছা এবার তার পূর্ণ হবে, ইষ্টপূজা ও ইষ্টধ্যানের মিলবে অখণ্ড অবসর।

এখন থেকে অষ্টপ্রহর তার জীবন আবর্তিত হতে থাকে সীতারাম-জীকে কেন্দ্র ক'রে। প্রভুজীর সাজসজ্জা, অর্চনা ও ভোগরাগ নিয়ে সদাই সে মহাব্যস্ত। কন্যার সাধন-জীবনের অনুকূল ব্যবস্থার জন্য পিতাও আজকাল পরম উৎসাহী। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, সিদ্ধসাধক ও সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রায়ই কাঠমাণ্ডুতে পশুপতিনাথজীর দর্শনে আসেন। ধীরসিংজী পরম সমাদরে আপন প্রাসাদে এদের আমন্ত্রণ ক'রে আনেন, কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াও সাগ্রহে এঁদের সেবা-যত্ন করেন, শাস্ত্রব্যাখ্যা আর তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ ক'রে হন কৃত-কৃতার্থ।

ইতিমধ্যে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স এখন পনের। এই সময়ে হঠাৎ একদিন বর্ষীয়ান রানা ধীরসিংজী পরলোকে প্রস্থান করলেন। প্রচণ্ডতম এই শোকের আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া।

শৈশবেই সে হয়েছে মাতৃহারা। তারপর থেকে স্নেহময় পিতার পক্ষপুটেই পেয়েছে আশ্রয়, তাঁর ওপরই করেছে একান্তভাবে নির্ভর। এবার সে আশ্রয় তার অপহৃত হল, সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল সাংসারিক জীবনের বৃহত্তম বন্ধন।

পিতার মৃত্যুর ভেতর দিয়ে মানবজীবনের অনিত্যতা, অসারতা প্রকটিত হয়ে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়ার সারা সত্তায়। এখন থেকে তীব্র বৈরাগ্য এবং কৃচ্ছ্রময় জীবন যাপন শুরু হল তাঁর।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা বীরসিংজী আর তাঁর স্ত্রীর পরম স্নেহের পাত্রী

বিষ্ণুপ্রিয়া। পিতৃবিয়োগের পর থেকে আরো অধিকতর যত্নে তাঁরা তাঁকে লালন করতে থাকেন। অবাধে তিনি যাতে নিজ ধর্ম-জীবন গঠন করতে পারেন, পূর্ববৎ পূজা পাঠ ব্রত নিয়ম ও দান-ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করতে পারেন সেজন্য থাকেন সদা তৎপর।

ক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ বৎসরে পদার্পণ করেন। এ সময়ে তীর্থ দর্শনে তাঁর অভিলাষ হওয়াতে রায়সিংজী ও পত্নী সোৎসাহে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ভারতের প্রধান তীর্থগুলি দর্শনের জন্য। এই সময়েই মহাধাম পুরীক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মাতাজী অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎ ঘটে। বিলাসলালিতা রানার কন্যা বরণ করেন সন্ন্যাসিনীর জীবন।

দীক্ষার পরদিন মাতাজী অদ্বৈতানন্দ নূতন শিষ্যাদের ডেকে এনে বসালেন তাঁর ভজনকুটিরে। প্রশান্তকণ্ঠে বললেন, "আমার গুরুজী শ্রীমৎ সহজানন্দজীর প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি চাইতেন, ভারতের নারীদের অধ্যাত্ম-উন্নয়ন ত্বরান্বিত হোক, ব্রহ্মবিদ্ নারী সাধিকারা আবির্ভূতা হোন এবং আচার্যপদ গ্রহণ করুন। প্রাচীন যুগে এদেশে অম্ভৃনী, বাক্, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ নারী কত মুমুক্ষুকে কৃপা ক'রে গেছেন। আজকের দিনেও আনতে হবে তেমনি ধরনের অধ্যাত্মজাগরণ। কিন্তু মাতৃজাতির ভেতরে ব্রহ্মবিদের সংখ্যা না বাড়লে জাতির প্রকৃত কল্যাণ কি ক'রে হবে বলতো? আমার গুরু তাই বেছে বেছে ভালো আধারযুক্ত কয়েকটি জ্ঞানপিপাসু গৃহস্থ কন্যা সংগ্রহ করেছিলেন। অকৃপণ করে তাঁদের কৃপাও ক'রে গেছেন। সেই ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই আমি এ কাজ ক'রে যাচ্ছি। তোমরাও সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে মাতাজী অদ্বৈতানন্দ আবার বললেন, "গুরু পরম্পরার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে সমাজের স্তরে স্তরে। কিন্তু এ আলো এ জ্ঞান, বিতরণ করতে হলে আগে তোমাকে পেতে হবে জ্ঞানময় সত্তাকে। নইলে লোকে তোমার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে কেন? লোকশিক্ষার অধিকারই বা তুমি

পাবে কি ক'রে? বহু ভাগ্য বলে সন্ন্যাস দীক্ষা পেয়েছো, এবার ত্যাগ তিতিক্ষা ও সমস্যার মধ্য দিয়ে এ জীবন সার্থক ক'বে তোল, লাভ করো জীবেব বহু আকাঙ্ক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞান।"

পুরীধামে আরো কিছুদিন অতিবাহিত হল। সেদিন শিষ্যাদেব সঙ্গে নিয়ে অদ্বৈতানন্দ সরস্বতী গোবর্ধন মঠ দর্শনে এসেছেন। মঠাধিপতি শঙ্করাচার্য তাঁর পূর্ব পরিচিত। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ নানা নিগূঢ় শাস্ত্রালাপ হল। কুটিরে ফিবে এসে সরস্বতীজী নবীনা সন্ন্যাসিনীদের বললেন, "তোমরা শঙ্কব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী। আচার্য প্রতিষ্ঠিত চাবটি আদি মঠ দর্শন কবা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। পুরীধামেব পরম পবিত্র গোবর্ধন আজ দেখলে। এরপর বাকী রইল শৃঙ্গেবী, দ্বারকা ও জ্যোতির্মঠ। সারা ভাবত তীর্থ পরিব্রাজনও সন্ন্যাস আশ্রমেব এক অঙ্গ। এই পরিব্রাজনের ভেতর দিয়ে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা লাভ করে কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তাছাড়া সাধকজীবন কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত হয আর অহমিকার কাঁটা ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে আসে। আমি নিজে সঙ্গে থেকে তোমাদের এই পরিব্রাজন ব্রত শুরু করাবো।"

পদব্রজে প্রতিদিন সবাইকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়। কাঁটার ঘায়ে এক একদিন পদযুগল রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ অবসন্ন হযে লুটিয়ে পড়তে চায়। কোনোদিন আহার জোটে, কোনোদিন থাকতে হয় একেবারে উপবাসী, তবুও মাতাজী জ্ঞানানন্দের মুখে একটি শব্দ নেই। তিনি বুঝে নিয়েছেন,—রানামহলের ভোগবিলাস-প্রাচুর্যময় জীবনে চিরদিনের তবে ছেদ পড়ে গিয়েছে, এবার থেকে পূর্বাশ্রমেব সকল কিছু সংস্কার, সকল কিছু অভ্যাস তাঁকে বর্জন করতে হবে। দূর করতে হবে মনের বিকার, সর্ব অভিমানের কাঁটা সমূলে করতে হবে উৎপাটন।

কয়েকদিন পরে গুরু লক্ষ্য কবলেন, নবীনা শিষ্যা জ্ঞানানন্দের নরম দুটি পায়ের তলা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, তাঁর পক্ষে এখন আর পথ চলা দায। তাই এবার থেকে তাঁর জন্য ব্যবস্থা হল

একজোড়া কাষ্ঠপাদুকা। পথশ্রমের কষ্ট ও আহারের অব্যবস্থা কিন্তু রয়ে গেল পূর্ববৎ।

শৃঙ্গেরী, রামেশ্বর এবং দাক্ষিণাত্যের আরও নানা তীর্থ দর্শন করে, পরিব্রাজিকার দল উপস্থিত হলেন দ্বারকাধামে। এখানে পৌঁছানোর পর মাতাজী জ্ঞানানন্দের বৃদ্ধা ধাত্রীমাতা, কন্যাসহ যিনি তাঁরই সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর সমাধি সংকার শেষ হবার পর পদব্রজে সবাই উপনীত হলেন পাঞ্জাবে।

এখানকার এক পল্লীগ্রামে বহুলখ্যাত হঠযোগী কাকা-বাপুজীর বাস। গ্রামে প্রবেশ ক'রেই গুরু অদ্বৈতানন্দ মাতাজীকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, "বেটী, আমি তোমার উপর খুব প্রসন্ন হয়েছি। রাজপ্রাসাদের দুলালী হয়েও পরিব্রাজনের পথে যে কৃচ্ছ্র তুমি সাধন করেছো, তা আমি সানন্দে লক্ষ্য করেছি। তোমার অসাধারণ গুরুনিষ্ঠা, ধীশক্তি, বিচার-বুদ্ধি ও তপস্যাপরায়ণতা আমার চোখে এড়ায় নি। মনে হচ্ছে, শ্রীভগবান্ যেন তোমায় বহুজনের হিতের জন্য, লোকগুরু হবার জন্য, চিহ্নিত ক'রে পাঠিয়েছেন। বহুলোকের ভার তোমায় নিতে হবে। কিন্তু এজন্য চাই বহুমুখীন প্রস্তুতি। দেহ, মন, প্রাণকে স্ববশে আনয়নের শক্তি করতে হবে অর্জন। আমার ইচ্ছা, প্রথমে হঠযোগ সাধন ক'রে দেহকে তুমি আয়ত্তাধীনে আনো। এখানকার কাকা-বাপুজী হচ্ছেন উত্তর ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ হঠযোগী। আমার সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তুমি এঁর কাছে হঠযোগ সাধনা গ্রহণ করো।"

গুরুর আদেশ মাতাজী জ্ঞানানন্দ পরম শ্রদ্ধায় শিরোধার্য করলেন। কাকা-বাপুজীর তত্ত্বাবধানে তাঁর হঠযোগের সাধন অগ্রসর হতে থাকল।

অসামান্য প্রতিভা এই নবীন শিক্ষার্থিনীর। শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে এক একটি প্রক্রিয়া তিনি প্রাপ্ত হন আর অবলীলায় অল্প সময়ের অভ্যাসেই তা হয়ে ওঠে তাঁর আয়ত্তাধীন।

হঠযোগী কাকা-বাপুজী মুগ্ধ ও বিস্মিত। একদিন তিনি প্রশ্ন ক'রে বসেন, "আচ্ছা মাঈ, তুমি কি আগে কখনো আর কারুর কাছে হঠযোগেব সাধন নিযেছো? আগে কি এসব অনুষ্ঠান কবেছো?"

"না প্রভু, এসব তো আমি নূতন অভ্যেস করেছি। কিন্তু কেবলই আমার মনে হচ্ছে এ সব যেন আগে থেকেই আমাব জানা, কোনো কিছুই নূতন বলে মনে হচ্ছে না।"

শিক্ষাগুরু এবং অন্যান্য সাধুবা বুঝলেন, পূর্ব জীবনের সিদ্ধি-সংস্কার নিযেই মাতাজী জ্ঞানানন্দ জন্মেছেন। তাই হঠযোগ সাধনে তাঁব এই অসামান্য পাবদর্শিতা। ক্রমিক অভ্যাসেব ফলে কাকা-বাপুজীব প্রদত্ত সাধনগুলো আয়ত্ত ক'রে এবং তাঁব আশীর্বাদ নিয়ে মাতাজী তাঁব গুরু ও গুরুভগ্নীসহ সেই স্থান ত্যাগ কবলেন।

এবাব পবিব্রাজনেব লক্ষ্য পরমগুরু সহজানন্দ সবস্বতীজীব আম্বালাস্থিত পবিত্র আশ্রম। দীর্ঘদিন এই প্রখ্যাত মহাত্মা মবদেহ ত্যাগ কবেছেন। কিন্তু আজও এ অঞ্চলেব জনমনে এই সর্বশাস্ত্র-বেত্তা, যোগসিদ্ধ মহাসাধকেব স্মৃতি প্রোজ্জ্বল হয়ে বয়েছে। উত্তর সাধকেরা আজও সযতনে এই আশ্রমে জ্বালিয়ে রেখেছেন তাঁব মহাসাধনাব আলোক-বর্তিকা। শত শত মুমুক্ষু ও আর্তের আশ্রয়-স্থান হয়ে আছে এই পুণ্যময় আশ্রমটি।

আশ্রমিকেবা পবম সমাদরে অদ্বৈতানন্দ ও তাঁব শিষ্যদেব গ্রহণ কবলেন। পবমগুরুব অসামান্য সাধননিষ্ঠা ও তাঁব যোগবিভূতির নানা কাহিনী শুনে মাতাজী জ্ঞানানন্দেব আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি নেই। এখানে কিছুকাল বিশ্রাম ক'বে সবাই এক নব ভাবে, নব প্রেবণায উদ্দীপিত হযে উঠলেন।

অতঃপর সবাই বওনা হযে যান কেদাব-বদবী পবিক্রমণে। একাজ সমাপ্ত ক'বে অদ্বৈতানন্দ সবস্বতী দুই নবীনা শিষ্যাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন কবলেন হবিদ্বাবে। এখানে পৌছেই তাদেব বললেন, পরিব্রাজনে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল, এবাব আমবা এখানেই

কয়েক মাস অবস্থান করবো। আমার এ দেহের পরমায়ু আর বেশী নেই। যাবার আগে দেখে যেতে চাই যে তোমাদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি, সাধন ও সিদ্ধির ভিত্তি, সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে।"

হরিদ্বার ও কন্‌খলে তখন স্বামী হরি ভারতীর খুব প্রসিদ্ধি। একাধারে এমন জ্ঞানী, শাস্ত্রবিদ্‌ ও ত্যাগ-তিতিক্ষাপরায়ণ মহাত্মা সুদুর্লভ। ভারতীজীর আশ্রয়ে ও-সময়ে হরিশঙ্করানন্দ গিরি নামে এক উচ্চকোটির রাজযোগীও অবস্থান করছেন। দুই মহাত্মা মিলিত হয়ে প্রতিদিন তত্ত্ব উপদেশাদি দিচ্ছেন, এই আশ্রমে তাই সাধক ও পণ্ডিতদের ভিড় সব সময়ে লেগেই আছে।

অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর পরমগুরু আম্বালা মঠের সহজানন্দ সরস্বতী মহারাজকে কন্‌খলের এই মহাত্মাদ্বয় ভালভাবে জানতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। অদ্বৈতানন্দ সরস্বতী সেদিন এঁদের কাছে এসে জ্ঞাপন করলেন তাঁর গুরু পরম্পরার কথা। আরো বললেন, "আমার শরীর প্রাচীন ও অপটু হয়ে পড়েছে, তাই আমার ইচ্ছে, আপনারা আমার এই নবীন শিষ্যা দুটির শিক্ষার ভার গ্রহণ করুন।"

দুই মহাত্মাই সানন্দে জানালেন তাঁদের সম্মতি। মাতাজী জ্ঞানানন্দ ও তাঁর সঙ্গিনীর শাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগসাধনা দুই-ই শুরু হয়ে গেল।

বেদান্ত, উপনিষদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি গ্রন্থ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাতাজী জ্ঞানানন্দ আয়ত্ত ক'রে ফেললেন। তাঁর এই অলৌকিক প্রতিভা প্রত্যক্ষ ক'রে উভয় মহাত্মাই বার বার জানাতে লাগলেন সাধুবাদ।

হরিশঙ্করানন্দ গিরি ছিলেন যোগশাস্ত্রে পারঙ্গম, যোগবিভূতিও হয়েছিল তাঁর করায়ত্ত। উপযুক্ত আধার পেয়ে, সাগ্রহে তিনি নানাবিধ নিগূঢ় সাধন দিতে থাকেন, আর মাতাজীও একের পর এক সাধনার ক্রমগুলো শেষ ক'রে চলেন অনন্য নিষ্ঠায়।

ছয়মাস কালও উত্তীর্ণ হয় নি, এরই মধ্যে দেখা যায়, মাতাজীর সাধনসত্তায় আবির্ভূত হয়েছে দূরশ্রবণ, দূরদর্শন ও পরচিত্তজ্ঞানের

শক্তি। এসময়ে যোগীবর হরিশঙ্করানন্দজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সতত তাঁকে ঘিরে রাখতো। এসব প্রসঙ্গ উঠলেই মাতাজীকে তিনি সতর্ক ক'রে দিতেন, "সব সময় স্মরণ রাখবে—প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা। অবলীলায় উপেক্ষা করবে এই সব শক্তির স্ফুরণ, পথ চলতে পথের ধূলি-আবরণ গায়ে জড়িয়ে যায়, সাধনজীবনের গায়েও তেমনি এগুলো লেগে যায় স্বাভাবিকভাবে। এ নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। পথের ধুলার চাইতে পথ অতিক্রমের দিকেই সতত নিবদ্ধ রাখবে তোমার দৃষ্টি।"

বৎসরেক কালের মধ্যেই মাতাজী যোগসাধনায় বিস্ময়কর উন্নতিলাভ করেন। দিনের পর দিন তাঁর কেটে যেতো গভীর ধ্যান-তন্ময়তায়। এক একদিন বাহ্য জগতের চেতনা ছাপিয়ে আবির্ভূত হতো দিব্য আনন্দের তীব্র স্রোতধারা, লহরীর পর লহরী তুলে এই আনন্দ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

এই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা উত্তরকালে মাতাজী কথাপ্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন, "ধ্যান-তন্ময়তা ভঙ্গের পরও দীর্ঘকাল এই আনন্দের অবস্থা স্থায়ী হতো। সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত, দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। আপাদমস্তক যেন ডুবে আছে অনির্বচনীয় আনন্দ-সমুদ্রে। যে দিকেই দৃষ্টি পড়ুক, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। ক্রমে এই অবস্থাটি এতই অভ্যস্ত হয়ে গেল যে ধ্যান করতে বসা মাত্র স্বতঃস্ফূর্ত এই দিব্য আনন্দের তরঙ্গ ভিতর বার একাকার ক'রে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো।"

এ সময়ে মাতাজীর সাধনপথে উপস্থিত হল এক বড় অন্তরায়। গুরু শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর দেহ ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। তাই সাধনভজনের তীব্রতা হ্রাস ক'রে মাতাজী নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করলেন গুরুর সেবা-শুশ্রূষার কাজে।

গুরু বুঝলেন, ব্রহ্মলীন হবার পরম লগ্নটি এবার এসে গিয়েছে। তাই হরিশঙ্করানন্দ গিরি এবং হরিভাবতী এই দুই মহাত্মাকে নিকটে আহ্বান করলেন। তারপর জ্ঞানানন্দ ও অপর দুইটি শিষ্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন, "আমার এই অধ্যাত্ম-সন্তানেরা রইল।

এই নরদেহ ত্যাগ ক'রে যাবার আগে আমার অনুরোধ—আপনারা এদের দিকে দৃষ্টি রাখবেন। সাধনবীজ এরা পেয়েছে, পরম প্রাপ্তির পথে এগিয়েও চলেছে। আমার অবর্তমানে এরা যেন সর্বপ্রকারে আপনাদের সাহায্য লাভ করে।

মহাত্মাদ্বয় প্রতিশ্রুতি দিলেন, এ অনুরোধ তাঁরা অবশ্যই রক্ষা করবেন। অতঃপর 'ওঁ নমো নারায়ণায়' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর নয়ন দুটি হল চিরতরে নিমীলিত।

মাতাজী জ্ঞানানন্দের জীবনে গুরুর এই মহাপ্রয়াণ পতিত হয় এক প্রচণ্ড আঘাতরূপে। কিন্তু এ আঘাত তাঁকে বিপর্যস্ত করতে পারে নি। কয়েকদিনের ভেতরই নিজেকে তিনি সামলে নেন। তারপর কনখলের মহাত্মাদের পরামর্শমতো তিন গুরুভগ্নী ফিরে যান আম্বালার পরমগুরু আশ্রমে।

সেখানে গুরু অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর নামে মহাসমারোহে এক ভাণ্ডারা প্রদত্ত হয়। তারপর গুরুভগ্নীদের সঙ্গে নিয়ে মাতাজী বহির্গত হন উত্তর ভারত পরিব্রাজনে।

পথ চলতে চলতে সকলে জলন্ধরে এসেছেন। এখানে ভবানী-মা নাম্নী এক বৃদ্ধা ভৈরবীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। মাতাজী জ্ঞানানন্দকে দেখা মাত্রই ভবানী-মা তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্টা হলেন, মনে মনে তাঁকে ভালবেসে ফেললেন।

আলাপ-পরিচয়ের পর ভবানী-মা স্মিতহাস্যে বললেন, "তোমরা দেখছি শাঙ্কর মতের অনুগামিনী। শক্তি মানো না। অথচ ছাখো, সারা বিশ্বপ্রপঞ্চ জুড়ে নিরন্তন শক্তির খেলাই কেবল চলছে।"

মাতাজী সবিনয়ে নিবেদন করেন, "আচার্য শঙ্কর শক্তি ও শক্তিমানকে অভিন্ন বলেছেন ঠিকই। কিন্তু অনির্বচনীয়া মায়া, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া যে ব্রহ্মের শক্তি, তাকে স্বীকার করেছেন। এই ব্রহ্মশক্তিই তো মহামায়া সাধন চতুষ্টয়, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন

প্রভৃতি যা কিছু ব্রহ্ম-উপলব্ধিব উপায তা যে মহামাযাবই কৃপা-সাপেক্ষ।"

মাতাজীব এই উদাব অসাম্প্রদাযিক মতবাদ শুনে ভবানী-মাব চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হযে উঠল। প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "বাছা, তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি প্রকাশিত হযেছে তোমাব জীবনে, তাই তোমাব দৃষ্টি হয়ে উঠেছে এমন সর্বব্যাপক।"

এই তন্ত্রসিদ্ধা প্রখ্যাতা সাধিকাব সনির্বন্ধ অনুবোধে সঙ্গিনীগণসহ মাতাজী জ্ঞানানন্দ কিছুদিনেব জন্য এখানে তাঁব সঙ্গে অবস্থান কবতে লাগলেন।

মাতাজীকে একদিন সঙ্গোপনে ডেকে নিয়ে ভবানী-মা বললেন, "ত্থাখো বাছা, কাছেই একটি পবিত্র শক্তিপীঠ বযেছে। আমি চাই, তুমি সেখানে থেকে কিছুকাল ত্রিপুবাসুন্দবীব সাধন সমাপ্ত কবো। এই সাধনায সিদ্ধা হলে তোমাব অশেষ কল্যাণ হবে। উত্তবকালে ঈশ্ববেব নির্ধাবিত অনেক কিছু কাজ তোমায কবতে হবে। এই সিদ্ধি কবায়ত্ত হলে তোমাব কাজ হয়ে উঠ্‌বে সহজতব। এ সাধনায আমি তোমায় যথাশক্তি সাহায্য কববো।"

মাতাজী সানন্দে বাজী হলেন। অল্প সমযেব মধ্যে জগন্মাতা ত্রিপুবাসুন্দবীব দর্শনলাভে হলেন তিনি কৃত-কৃতার্থা।

কতকগুলি বিশেষ ধবনের শক্তি অর্জনেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁব সাধন-আধাবে উপস্থিত হল ঐশ্ববীয কৃপা ও স্নেহবসেব উদাব অমৃতধাবা। উত্তবকালে মাতাজী যখন আচার্যা ও লোকগুরুব ভূমিকা গ্রহণ কবেন তখন এই ত্রিপুবাসুন্দবী-সিদ্ধি তাঁকে অশেষভাবে সাহায্য কবেছিল।

ভবানী-মাব আগ্রহ ও অনুবোধে মাতাজী এসমযে হিংলাজ, জ্বালামুখী, কাংডা প্রভৃতি জাগ্রত শক্তিপীঠগুলিও দর্শন কবেন।

কাংড়া অবস্থানকালে একটি চাঞ্চল্যকব ঘটনা সংঘটিত হয। যে কয়দিন মাতাজী এখানে ছিলেন, প্রত্যূষে স্নানকৃত্যাদি শেষ ক'বে

দেবী মন্দিরে গিয়ে বসতেন, বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে ধ্যানস্থ থাকতেন সারাদিন, তারপর নিশাযোগে প্রত্যাবর্তন করতেন আপন কুটিরে।"

একদিন ধ্যান সমাপ্ত হবার সময় দেখতে পেলেন এক বিস্ময়কর অলৌকিক দৃশ্য। দেবীর মূর্তিটি যেন বিশাল আকার ধারণ করেছে, আর সেটি বার বার হচ্ছে প্রকম্পিত। আয়ত নয়ন দুটি থেকে নির্গত হচ্ছে তীব্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

মাতাজীর মানসপটে ভেসে উঠল অতি-আসন্ন ধ্বংসের এক ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি। ধ্যানাসন ছেড়ে তখনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, পাণ্ডাদের ডেকে ব্যাকুল কণ্ঠে বিবৃত করলেন সব কথা। বললেন, "বাবা, আমি একটা ঘোরতর অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছি। তোমরা আজই মায়ের মূর্তিটি কোথাও স্থানান্তরিত করো, আর যাত্রীদেরও এখানে আসতে বারণ ক'রে দাও।'

পাণ্ডারা মাতাজীর এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। ভাবে, অতিরিক্ত ধ্যান-ধারণার ফলে নবীনা সন্ন্যাসিনীর মস্তিষ্ক গরম হয়ে উঠেছে তাই এই সব এলোমেলো কথা।

"মাঈ, মিছেমিছি তুমি ভেবে মরছো। বিপদের কোনো আশঙ্কা থাকলে দেবী নিজেই তাঁর বড় পূজারীকে সতর্ক ক'রে দিতেন। তুমি নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাও।"—আশ্বাস দেয় পাণ্ডারা।

মাতাজী বলেন, "ছাখো, মা ইঙ্গিত দিলেন তা তোমাদের আমি জানালাম। এখন যা তোমাদের অভিরুচি তাই করো। আমি নিজের জন্য এতটুকুও ভীত হই নি। সকলের কল্যাণের জন্যই আমি তোমাদের সতর্ক হতে বলেছি। নিজে আমি রোজকার মতোই আসবো মন্দিরে, মায়ের পূজা ধ্যান যথারীতি করবো। কিন্তু তোমরা খুব সাবধানে থেকো।"

পরদিন প্রত্যূষে মাতাজী সবেমাত্র দেবীমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসেছেন, অকস্মাৎ শুরু হয় প্রচণ্ড গুম্‌গুম্‌ শব্দে ভূমিকম্প আর অগ্নি উদ্‌গিরণ। বিশাল মন্দিরের দেয়াল গম্বুজ ভেঙে পড়তে থাকে, ধূম্ররাশিতে চারিদিক হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই ধ্বংস তাণ্ডবের মধ্যে

আবির্ভূতা হন এক দেবীমূর্তি, মাতাজীর হস্ত ধারণ ক'রে তাঁকে টেনে আনেন নিরাপদ স্থানে। মুহূর্তমধ্যে দেবীর মন্দিরটি পরিণত হয় ভগ্নস্তূপে।

আপনার বাসস্থানে ফিরে আসবার সময় মাতাজী দেখেন, ধ্বংসলীলা তখনো একেবারে নিবৃত্ত হয় নি। পাণ্ডাপাড়ার গৃহগুলো ধসে পড়েছে। মৃত্তিকা ভেদ ক'রে পথের নানা স্থানে নির্গত হচ্ছে ধূম্র আর উষ্ণ জলস্রোত। কিন্তু বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে সবাই দেখলেন, যে অঞ্চলে তাঁর কুটিরটি অবস্থিত সে অঞ্চলের কোনো ক্ষতিই হয় নি, তাঁর সঙ্গিনীরাও সবাই নিরাপদে রয়েছেন। অলৌকিকভাবে মাতাজীর জীবন রক্ষা পাওয়াতে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

সেদিনকার এই ভূমিকম্পের ফলে কাংড়ার বহু গৃহ ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হয় এবং কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণনাশ ঘটে। এই ধ্বংসলীলার পূর্বাভাস মাতাজী তাঁর ধ্যানে পেয়েছিলেন এবং পাণ্ডাদের তা জানিয়েও দিয়েছিলেন। একথা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে মাতাজীর অলৌকিক শক্তির খ্যাতি রটে গেল। পাণ্ডা এবং তীর্থচারী যাত্রীরা দলে দলে ভিড় করতে লাগল এই শক্তিমতী নবীন সন্ন্যাসিনীর কাছে।

এরূপ লোক সমাগমে সাধনার বিঘ্ন হতে থাকায় মাতাজী সঙ্গিনীদের নিয়ে কাংড়া অঞ্চল ত্যাগ করলেন। পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে উপনীত হলেন প্রভু রামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যায়। কৈশোর ও যৌবনে নিষ্ঠাভরে শ্রীরাম বিগ্রহের উপাসনা ও আরাধনা ক'রে এসেছেন মাতাজী। তাই তাঁর স্মৃতিপূত মহাতীর্থে এসে তাঁর আনন্দের অবধি রইল না। এখানে বেশ কিছুদিন পরমানন্দে অতিবাহিত করবার পর দুই গুরুভগ্নীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন সীতাদেবীর জন্মভূমি জনকপুরের দিকে।

জনকপুরের সন্নিহিত এক গ্রামে উপস্থিত হতেই এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটল। দূর থেকে মাতাজী জ্ঞানানন্দকে দর্শন ক'রে এক

ব্রাহ্মণ দ্রুতবেগে ছুটে এলেন, লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদমূলে। ভাবাবেগে ব্রাহ্মণ উন্মত্তপ্রায়, অবিরত কেবল কেঁদে ভাসাচ্ছেন আর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলছেন, "এই যে আমার সীতামাঈ, এই যে আমার ইষ্টদেবী।"

বলা বাহুল্য, অল্প সময়ের মধ্যে পথে ভিড় জমে গেল। ভাবাকুল ব্রাহ্মণটিকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করা হল, তারপর শোনা গেল তার কাহিনী।

ব্রাহ্মণের নাম রঘুজীবন ত্রিবেদী। এ অঞ্চলের সবাই জানে, তিনি একজন উন্নত স্তরের সাধক এবং সীতারামজীর বিশিষ্ট ভক্ত। কয়েকদিন আগে ত্রিবেদীজী স্বপ্ন দেখেছেন, মা-জানকী তাঁকে বলছেন, "বাবা, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। স্থির করেছি, শিগ্‌গীরই তোমার কুটিরে উপস্থিত হবো, করবো তোমার সেবা গ্রহণ। এ কয়দিন-প্রতীক্ষায় থাকার পর ত্রিবেদীজীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। অতঃপর তিনি গ্রহণ করেন প্রায়োপবেশনের সংকল্প। স্বপ্নের কথা অনুযায়ী মা-জানকী যদি তাঁর গৃহে পদার্পণ না করেন, তবে এ ছার জীবন ত্রিবেদী আর রাখবেন না, ইষ্টদেবার চিন্তন করতে করতে অনাহারে করবেন প্রাণত্যাগ।

মাতাজীকে দর্শন করা মাত্র তাঁর প্রতীতি জন্মালো, এই নবীনা সন্ন্যাসিনীর দেহেই হয়েছে মা-জানকীর আবির্ভাব। সেবা নেবার জন্য, ভক্তের প্রাণ রক্ষার জন্য, সন্ন্যাসিনী-রূপিণী মা এসে দাঁড়িয়েছেন দ্বারের কাছে। এবারে এঁর সেবার ভেতর দিয়েই পূর্ণ হবে ভক্ত ত্রিবেদীজীর মনস্কাম।

মাতাজীর নয়ন-দুটি স্নেহসজল হয়ে উঠল। ভাবাবিষ্ট, ভূলুণ্ঠিত ভক্তের হাত দুটি ধরে ওঠালেন। স্নেহ-মধুর স্বরে বললেন, "বাবা, তুমি স্থির হও। বেশ তো, আমি তোমাদের কাছে কিছুদিন অবস্থান করবো। কিন্তু আমি সন্ন্যাসিনী, তোমাদের গৃহে আমি বাস করবো না, প্রাঙ্গণের ধারে আমার জন্য ছোট একটি তৃণকুটির তৈরী ক'রে দাও।"

রঘুজীবন ত্রিবেদী সানন্দে তাঁর এ আদেশ পালন করলেন। সপরিবারে মাতাজীর সেবায় হলেন অভিনিবিষ্ট।

গৃহে রামসীতাজীর বিগ্রহ স্থাপিত ছিল, আর তুলসী রামায়ণ পাঠ হতো প্রতিদিন। এই পরিবেশে থেকে সীতারামজীর অনুধ্যানে মাতাজী একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এক একদিন সারা দেহে উথ্‌লে উঠতো অশ্রু-স্বেদ-কম্পময় সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। কখনো বা দিব্য আনন্দে বিহ্বল হয়ে হারিয়ে ফেলতেন বাহ্যজ্ঞান। প্রহরের পর প্রহর চলতো তাঁর দেহে ভাবৈশ্বর্যের নানা বিস্ময়কর লীলা।

প্রেমভাবে বিভাবিত মাতাজীর সাধনসত্তায় এসময় থেকেই শুরু হয় লোককল্যাণের পালা। ত্রিবেদী পরিবারের আকুতি এড়াতে না পেরে তাঁদের সবাইকে তিনি দীক্ষা দান করেন। অতঃপর এ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক ভক্ত নরনারীও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়, এগিয়ে যায় সাধনজীবনের পথে।

একদিন দিব্য ভাবাবেশের মধ্যে ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে মাতাজী বসে আছেন। হঠাৎ দেখা গেল তাঁর ভাববৈলক্ষণ্য, ব্যাকুল স্বরে আপন মনে বলে উঠলেন, "আহা! অভাগিনী তুলসীর ছেলেটা কুয়োয় পড়ে গেল। ছেলেটাকে না বাঁচানো গেলে ওর মা তো প্রাণে বাঁচবে না।"

তুলসী এই গ্রামেরই এক দরিদ্র বিধবা, মাতাজীর ওপর তার অসীম শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। উল্লিখিত ছেলেটি তার একমাত্র সন্তান—নয়নের মণি। মাতাজীর এই স্বগত ভাষণ শুনে সবাই মর্মাহত। দুই একজন ভক্ত তখনই তুলসীর গৃহের দিকে ছুটে গেলেন, ব্যাপার কি জানবার জন্য। যে তথ্য সংগৃহীত হল তার মর্ম এই, আপন মনে খেলা করতে করতে বিধবার ছেলেটি গৃহসংলগ্ন কূপে পতিত হয়। মাতার আকুল কান্না শুনে তখনি কোথা হতে এক দীর্ঘকায় বলশালী পুরুষ সেখানে এসে উপস্থিত হয়, কূপ থেকে অসহায়

ছেলেটিকে উদ্ধার ক'রে আনে, তার প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা উদ্ধারকারী ঐ ব্যক্তিটি লোকের হট্টগোলের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যায়। তার পরিচয় বা সন্ধান আর পাওয়া যায় নি।

ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে মাতাজী সংক্ষেপে শুধু বললেন, "ভগবৎ কৃপা নানারূপ ধরে, নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ পায়। এমনটি তো অনেক সময় ঘটেই থাকে।"

এই ঘটনার পর থেকে ঐ অঞ্চলে মাতাজীর যোগৈশ্বর্যের খ্যাতি রটে যায়। দলে দলে আর্ত ভক্ত ও দর্শনকামীরা ত্রিবেদী ভবনে আসতে শুরু করে।

লোকসংঘট্ট দেখে মাতাজী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। স্থির করেন, আর তিনি এ স্থানে অবস্থান করবেন না। কোনো নিভৃত স্থানে গিয়ে পাতবেন তাঁর তপস্যার আসন।

একথা শুনে রঘুজীবন ত্রিবেদী ও তাঁর পরিবারস্থ সবাই ভেঙে পড়েন কান্নায়। কোনো মতেই মাতাজীকে তাঁরা ছেড়ে দিতে রাজী নন। বরং তারা এখানকার বাস ভেঙে তাঁর সঙ্গেই বার হবেন পরিব্রাজনে।

মাতাজীর হৃদয় বিগলিত হয়, বলেন, "আচ্ছা বাবা, আমি তোমাদের এখানে আরো ছয় মাস থাকবো। কিন্তু এ সময়টা থাকতে হবে নিভৃত সাধনায়। আমায় তোমরা কথা দাও, কাউকে এ কয়মাস গৃহপ্রাঙ্গণে ঢুকতে দেবে না, আমার সাধনায় করবে না বিঘ্ন উৎপাদন।"

ভক্ত পরিবার সানন্দে এ ব্যবস্থায় স্বীকৃত হলেন। এরপর থেকে মাতাজী জ্ঞানানন্দের নব পর্যায়ের সাধনা অনুষ্ঠিত হয়ে চলল একান্তে। তাঁর এই নির্জন সাধনার ব্যাঘাত না ক'রে গুরুভগ্নীদ্বয় রওনা হয়ে গেলেন হরিদ্বারের দিকে।

মাতাজীর এ সময়কার অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা তাঁর শ্রীমুখাৎ অবগত হয়ে বিশিষ্ট শিষ্য ভাস্করানন্দজী লিখেছেন[১]

১ পরমহংস জ্ঞানানন্দ সরস্বতী . স্বামী ভাস্করানন্দ

"তৃণময় ধ্যানকুটিরে আমাদের মাতাজী প্রায় সর্বদাই সমাধি-মগ্ন অবস্থাতেই থাকিতেন। কিন্তু পূর্বে যেরূপ সমাধিকালে অথবা সমাধিভঙ্গের পর কিয়ৎক্ষণ প্রচুর উল্লাস অনুভব করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া সে ভাব কাটিয়া যাইত, এখন আর সেরূপ না হইয়া সেই সমাধির আনন্দ যেন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল এবং বহুক্ষণ স্থায়ী, এমনকি, সারাদিন স্থায়ী হইয়া ক্রমশ শান্তভাবে বিলীন হইতে আরম্ভ করিল। এখন আনন্দের সে উচ্ছলতাও নাই, অথচ নিস্তব্ধ ভাবও থাকে না।

"কয়েক দিন অতীত হইলে আর তাঁহার আসন করিয়া বসিবার প্রয়োজন হইত না। সারা দিন রাত্রি সমানভাবে এক নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত অবস্থায় কাটিয়া যাইত। এইরূপ অবস্থার মধ্যেই কোনো এক শুভ মুহূর্তে তাঁহার সাধনার ধন—নিত্যস্থির, সর্বব্যাপী, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ চৈতন্য সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"পূর্বে বেদান্ত উপনিষদাদি বহু শ্রবণ মনন করিয়াও যাহাকে আভাসে ইঙ্গিতে কিছুটা ধারণা করিয়াছিলেন; কিন্তু কত প্রশ্ন, কত সংশয়, কত সমস্যা অন্তরে জাগিয়া উঠিত। আজ তাহার আবির্ভাবে সর্ব সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, সংশয়ের লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। দৃশ্যমান জগৎ যেন এক অভিনবভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যেন তাঁহার আর জানিবার বা পাইবার কিছুই বাকী রইল না। পরিপূর্ণ তৃপ্তির আস্বাদে বিভোর হইয়া রহিলেন। যাহাকে পাইবার জন্য এত কঠোর সাধনা, এত তীব্র তপস্যা, তিনি যে চিরকালই তাঁহাকে ধরিয়া এত নিকটে রহিয়াছেন ইহা উপলব্ধি করিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।"

ছয়মাস ক্রমে অতীত হয়ে গেল। মাতাজী জ্ঞানানন্দের এবার বিদায় নেবার পালা। স্থির করেছেন, কিছু দিনের জন্য হরিদ্বার কনখলে স্বামী হরিভাবতী ও হরিশঙ্কর গিরিজীর সান্নিধ্যে থাকবেন এবং গঙ্গাতীরে স্বেচ্ছামত হবেন আপন তপস্যায় মগ্ন।

বিষাদখিন্ন হৃদয়ে রঘুজীবন ত্রিবেদী এবং তাঁর ভক্তিমতী পত্নীও মাতাজীর সঙ্গ নিলেন। স্থির হল, হরিদ্বারে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে স্বগৃহে আবার তাঁরা ফিরে আসবেন।

হরিদ্বারে পৌঁছে এক পাণ্ডার বাড়িতে সবাই আশ্রয় নিলেন। পরদিন স্নান সমাপন ক'রে গঙ্গাতীরে বিশ্রাম করছেন, ত্রিবেদী ও তাঁর স্ত্রীর অভিলাষ হল, এই পবিত্র পীঠে শ্রদ্ধেয়া মাতাজীকে তাঁরা পুষ্প-চন্দন দিয়ে আরাধনা করবেন। অঞ্জলি দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মাতাজী সংবিৎহারা, সমাধিস্থা। সারা দেহখানি নিস্পন্দ, জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। এই স্বর্গীয় স্মৃতির সম্মুখে বসে ভক্তদ্বয় প্রাণভরে পূজা করছেন, আর অঞ্জলি নিবেদন করছেন।

গঙ্গায় নিত্যকার স্নান তর্পণাদি সেরে বিশ্বনাথজী নামে এক কাশ্মীরনিবাসী পণ্ডিত সেখান দিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও তরুণী বিধবা কন্যা। মাতাজীর সমাধিস্থ, দিব্যচেতনায় প্রোজ্জ্বল মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন, এসে বসলেন পূজারত ত্রিবেদী দম্পতির পাশে।

অনেকক্ষণ পরে মাতাজী জ্ঞানানন্দ সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হলেন। স্বাভাবিক চেতনা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরী পণ্ডিতজীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "বাবা, তোমাদের কি দীক্ষা নেবার অভিলাষ হয়েছে? আমার কাছেই চাও দীক্ষা? বেশ তো, আজই এখানে তা পেতে পারো।"

বিস্ময়ে আনন্দে পণ্ডিত অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। যুক্তকরে, অশ্রুসজল চক্ষে, বললেন, মাতাজী বহু বৎসর ধরে আমি হরিদ্বারে বাস করছি। সাধুসঙ্গ আর সাধুসেবাও কম করিনি। দীক্ষার জন্য প্রাণ সদাই ব্যাকুল। কিন্তু ভাগ্যদোষে তা লাভ করতে পারি নি। কারণ, মনে সংকল্প ছিল, যিনি আমার ঈশ্বরনির্দিষ্ট গুরু তিনি নিজে থেকেই আমায় খুঁজে নেবেন, দেবেন পরমাশ্রয়। বুঝতে পারছি, আপনিই আমার সেই সদ্‌গুরু। আমায় কৃপা করুন।"

"বাবা, আমি যে তোমাদের মা। জান তো, সন্তানের খিদে

পেয়েছে কিনা, মা একবারটি তার মুখ দেখলেই বুঝতে পারেন। হ্যাঁ, তোমাদের সবাইকে আমি মন্ত্রদীক্ষা দেবো। পতিতপাবনী গঙ্গা-স্নান সমাপন ক'রে তোমরা প্রস্তুত হয়ে এসো।"

দীক্ষাদানের শেষে সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাদের গৃহেই তিনি অবস্থান করতে লাগলেন।

এই কাশ্মীরী পরিবারটিকে উপলক্ষ করেই যেন মাতাজীর কৃপার ধারা সমাজের সম্মুখে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হতে থাকে। আচার্য জীবনের কল্যাণকর প্রভাবগণ্ডী ক্রমে ব্যাপক হয়ে ওঠে।

হরিশঙ্করানন্দ গিরিজীর ছিল বাঙালী শরীর। গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হলেও ভক্তিমার্গের সাধনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। মাতাজীর সঙ্গে অধ্যাত্ম-আলোচনায় বসে প্রায়ই সীতারাম তত্ত্ব, রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব প্রভৃতি বিশদভাবে তিনি বর্ণনা করতেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি সাধনার নিহিতার্থও মাতাজীকে বোঝাতেন পরম উৎসাহে।

গিরি মহারাজ একদিন বললেন, "ছাখো মা, গুরুকৃপায় ও সাধননিষ্ঠার বলে তুমি আপ্তকাম হয়েছো। যে পরম বস্তু তুমি পেয়েছো, এবার তার কিছুটা বিলিয়ে দাও মুমুক্ষু মানুষকে। তোমার গুরুর ইচ্ছে ছিল, নারীজাতির কল্যাণে সিদ্ধ নারী-সাধিকাদের নিয়োজিত করবেন। তুমি তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করো, আর কর্ম-ক্ষেত্ররূপে বেছে নাও বাংলাদেশকে।"

মাতাজী কথা দিলেন, গিরি মহারাজের এই নির্দেশ পালন করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

ভক্ত বিশ্বনাথ পণ্ডিত ও তাঁর স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে মাতাজী অতঃপর কিছুকালের জন্য বৃন্দাবনধামে বাস করেন। সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যপ্রেমের ভাবোচ্ছ্বসময় রসসাগরে তিনি নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। এ সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ভক্তপ্রবর স্বামী ভাস্করানন্দ লিখেছেন, "ভাগবত বর্ণিত ব্রজধামের

রাধাকৃষ্ণলীলা অন্তরে অন্তরে প্রতিক্ষণ অনুভব করিতে করিতে ঘন ঘন সমাধির আবেশে বিভোর হইয়া থাকিতে লাগিলেন। জোর করিয়া আহারাদি করাইতে হইত। হয়তো কয়েকদিন ক্রন্দনেই অতিবাহিত হইত। আবার কয়েকদিন হাসিতে হাসিতেই কাটিয়া যাইত। সাধারণে মনে করিত, বোধহয় ইনি পাগল হইয়াছেন। প্রতিদিন উন্মাদনা বাড়িতেই লাগিল। আহার নিদ্রা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন। বিশ্বনাথ পণ্ডিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বৃন্দাবন হইতে সরাইয়া হরিদ্বারে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করিলে তিনি বলিতেন, "তোরা কি জানিসনে—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি? ওকথা মুখে আনিসনে। আমি এখানেই আছি, আর এখানেই থাকবো।"

অতঃপর মাতাজীকে নানাভাবে বুঝিয়ে প্রবোধ দিয়ে পণ্ডিত দম্পতি তাঁকে নিয়ে চলে আসেন বারাণসীতে। এখানে পৌঁছে মাতাজী শুনিলেন, তাঁর প্রাক্তন সহচরী ধাত্রীকন্যা বিমলা, যিনি তাঁর সঙ্গেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, সম্প্রতি দেহত্যাগ করেছেন। মাতাজী সখেদে বলতে লাগলেন, "বিমলা আর তার মা—অর্থাৎ ধাত্রী-মা—এই দুজনে আমার এই নশ্বরদেহের মমতায় নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। এ কথাটি সকৃতজ্ঞভাবে আমায় সব সময় মনে রাখতে হতো, তাদের কল্যাণের কথা ভাবতে হতো। যাক্, এবার যাঁকে পেয়ে তারা আমায় ছাড়লো, সেই চিন্তামণিই এখন থেকে তাঁদের ভালো-মন্দের কথা চিন্তা করুন।"

পণ্ডিত পরিবারের সাগ্রহ অনুরোধে মাতাজী সেবার তাঁদের দেশ কাশ্মীরে এসেছেন। এবার তাঁর সঙ্গে রয়েছেন প্রবীণা গুরুভগ্নী কৈলাসানন্দ সরস্বতী। সকলেরই ইচ্ছা, অমরনাথ পরিব্রাজন শেষ ক'রে তবে ফিরবেন। প্রকৃতির এক রম্যরচনা এই কাশ্মীর। নদী নির্ঝরের কলতান, পাইন অরণ্যের শ্যামলিমা আর বরফান্ পাহাড়ের তরঙ্গ দিয়ে লীলাময় শ্রীভগবান্ যেন এখানে এক দিব্য সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র রচনা ক'রে রেখেছেন। মাতাজী যেদিকে নয়নপাত

করেন, সেই দিকেই দেখতে পান পরমপ্রভুর রসমধুর রূপ। দুই নয়নে তাঁর প্রেমাশ্রুর ধারা ঝরতে থাকে অবিরাম।

এখানে থাকতে মাতাজীর ঘন ঘন সমাধি হতে লাগল। ভক্তপ্রবর বিশ্বনাথ পণ্ডিত আর গুরুভগ্নী কৈলাসানন্দ সরস্বতী তো মহা চিন্তিত। ভালো ভালো পণ্ডিতদের ডেকে এনে মাতাজীর সম্মুখে ভাগবত পাঠ ও কীর্তনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হল না, সমাধি-প্রবণতা ক্রমে বেড়েই চলল। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর মাতাজী একটু প্রকৃতিস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

অমরনাথ দর্শন ও পরিক্রমার শেষে মাতাজী তাঁর শিষ্যা দম্পতিকে বললেন, "অনেক দিন তোমরা আমায় নিয়ে ঘুরেছো। তোমাদের কাজকর্মের কত ক্ষতি হচ্ছে। এবার তোমরা হরিদ্বারে ফিরে যাও। প্রভু শিবজীর দিব্যচৈতন্যে এই পীঠস্থান সদা উদ্ভাসিত। এখানে আসবার পর থেকেই অপূর্ব উদ্দীপনায় মন ভরে আছে। স্থির করেছি, কিছুকাল এখানে অবস্থান ক'রে ধ্যান সমাধিতে ডুবে থাকবো।"

বিশ্বনাথ পণ্ডিত এবং তাঁর স্ত্রী সজল নয়নে কত অনুরোধ কত মিনতি জানালেন, কিন্তু মাতাজীকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব হল না। পণ্ডিত দম্পতি দুঃখিত চিত্তে প্রত্যাবর্তন করলেন। মাতাজীর দেখাশোনার জন্য সঙ্গে রইলেন স্নেহশীলা গুরুভগ্নী কৈলাসানন্দ সরস্বতী।

সেদিন এক নির্জন গুহায় মাতাজী সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন। কাশ্মীররাজের অন্যতম দেওয়ান, বর্ধমান জেলার মানকর নিবাসী মহেশ বিশ্বাস, তখন সপরিবারে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন অমরনাথ দর্শনে। মাতাজীর দিকে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। বাহ্যজ্ঞান নেই, আসনস্থ ঋজু দেহটি নিশ্চল নিস্পন্দ। চক্ষু দুটি নিষ্পলক,

আনন দিব্য আভায় সমুজ্জ্বল। দর্শনমাত্রেই তিনি ও তাঁর পত্নী এই সন্ন্যাসিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কৈলাসানন্দ সরস্বতী, অদূরেই অবস্থান করছিলেন, তাঁর কাছ থেকে মাতাজীর পূর্বাশ্রমের পরিচয় এবং সাধনা ও সিদ্ধির কথা শুনে তাঁরা আরো বেশী শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠেন।

সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হবার পর সবাই মাতাজীর চরণ বন্দনা করেন, বার বার মিনতি করতে থাকেন তাঁদের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করার জন্য।

মহেশ বিশ্বাস নিজে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন প্রসিদ্ধ তন্ত্রসিদ্ধ সাধক কৈলাসপতি মহারাজের কাছ থেকে। কিন্তু সুদূর কাশ্মীরে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় গুরুর সান্নিধ্য জীবনে খুব বেশী পান নি। বয়স এবার ভাটার দিকে। সংসারধর্ম তো অনেক দিন পালন করা হল, এবার বন্ধন মুক্তির ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মাতাজীর সান্নিধ্যে থেকে তাঁকে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ ক'রে নিজের সাধনভজনে অগ্রসর হতে চান। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাও ইতিমধ্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন মাতাজীর কাছে দীক্ষা নেবার জন্য।

মাতাজীর আননে ফুটে ওঠে স্মিত হাসির আভা। গুরু অদ্বৈতানন্দের ইচ্ছা ছিল, মাতাজী জ্ঞানানন্দ বাংলাদেশের নারী সাধিকাদের অধ্যাত্মজীবন উদ্দীপিত ক'রে তুলুন, ব্রহ্মজ্ঞান তাদের ভেতর বিস্তারিত করেন। শিক্ষাগুরু হরিশঙ্করানন্দ গিরি মহারাজও সেদিন এই আশা ব্যক্ত করেছেন। নূতন ভক্তটি বর্ধমানের প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাঁর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এক নিগূঢ় ঐশ কর্মের সূচনা দেখতে পেলেন মাতাজী। এখন থেকে কাশ্মীরে তাঁর গৃহেই করতে লাগলেন অবস্থান।

কিছুদিন পরে বিশ্বাসমশাই ছয়মাসের ছুটি নিয়ে সপরিবারে নিজ দেশ মানকরে গিয়ে বাস করেন। মাতাজী জ্ঞানানন্দকেও পরম সমাদরে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। এই কয় মাসের অবস্থানের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে এই মহাসাধিকার অন্তরের যোগ

স্থাপিত হয়। একদল আর্ত ও মুমুক্ষু ভক্ত কৃতার্থ হয় তাঁর কৃপা লাভে। ছয়মাস অন্তে, বিশ্বাস পরিবারের আগ্রহাতিশয্যে, আবার কিছুদিনের জন্য তিনি কাশ্মীরে যান। কিন্তু এবার থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলই বার বার তাঁকে যেন আকর্ষণ করছে। কিছুদিনের ভেতরই হরিদ্বার কন্‌খল হয়ে একদল ভক্তের সঙ্গে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল, একদল মহিলা-ভক্ত চন্দ্রনাথ এবং কামাখ্যা তীর্থ দর্শনে যাচ্ছেন। পূর্বভারতের এই দুটি শক্তিপীঠ মাতাজী এ-যাবৎ দর্শন করেন নি। এদের সঙ্গে তিনিও তাঁর দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

চন্দ্রনাথ দর্শন সমাপ্ত ক'রে সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন কামাখ্যা পাহাড়ে। এখানে পৌঁছেই মাতাজী দিব্যভাবে উদ্দীপিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গিনীদের হয়েছে মহাবিপদ। মাতাজী দেবীমন্দিরে প্রবেশ ক'রেই গভীর সমাধিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। বহু চেষ্টার ফলে সেদিন তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হয়।

কয়েকদিন পরের কথা। সঙ্গিনীরা সেদিন কামাখ্যাধাম ত্যাগ করার উদ্যোগ আয়োজন করছেন। মাতাজী জ্ঞানানন্দ বলে বসলেন, "তোমরা সবাই চলে যাও। এ স্থান ত্যাগ করতে আমার ভালো লাগছে না। আমায় আরো কিছুকাল এই পীঠে অবস্থান করতে হবে।"

সঙ্গিনীরা অনেক ক'রে বোঝালেন, মিনতি করলেন, কিন্তু মাতাজীকে রাজী করানো গেল না। অগত্যা তাঁকে একলা রেখেই সবাইকে চলে যেতে হল।

নিত্যকার মতো সেদিনও মাতাজী দেবী-মন্দিরে ধ্যান জপ সেরে শেষবেলায় পাহাড় থেকে অবতরণ করছেন হঠাৎ কম্প দিয়ে এল প্রবল জ্বর। পার্বত্য পথে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছে। পথ জনবিরল, কাছাকাছি কেউ নেই যে তাঁকে একটু

সাহায্য করে। তপ্ত শ্রান্ত দেহটি একটি বৃক্ষতলে এলিয়ে দেওয়া মাত্র মাতাজী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলেন, অসুস্থ অবস্থায় এক সহৃদয় পাণ্ডার গৃহে উত্তম শয্যায় তিনি শয়ন ক'রে আছেন। সবাই তাঁর সেবা যত্নের জন্য মহাব্যস্ত।

এ কোথায় তিনি এসেছেন, কি ক'রেই বা এলেন, ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন মাতাজী।

উত্তরে গৃহকর্ত্রী বলেন, "মা, সেদিন রাত্রে দশ বৎসর বয়সী এক বালিকা তোমায় বয়ে নিয়ে এল। মেয়েটি দেখতে ভারী সুন্দরী, শ্যামলা রং, অপূর্ব লাবণ্যশ্রী সারা দেহে। ডাগর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। এসে বললে, সে তোমার ছোট বোন। প্রবল জ্বরের ঘোরে তুমি তখন বেহুঁশ। মেয়েটি বললে—আমার দিদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে তোমরা একটু আশ্রয় দাও। তারপর তোমায় সযত্নে শুইয়ে দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল. আর এ ক'দিন তার কোনো খবর নেই। এদিকে তোমায় নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত, তার উপর আবার তোমার বোন কোথায় গেল, তাই ভেবে মরছি।"

"আমি সন্ন্যাসিনী। একলা পরিব্রাজন ক'রে বেড়াই। গৃহস্থাশ্রম ছেড়েছি বহুকাল। তাছাড়া, মা, পূর্বাশ্রমেও তো আমার ছোট বোন ছিল না।" উত্তর দিলেন মাতাজী জ্ঞানানন্দ।

পাণ্ডাগৃহের সবাই তো বিস্ময়ে হতবাক্। অতঃপর তারা বলাবলি করতে থাকে, "ঐ শ্যামা মেয়েটি দেবী কামাখ্যা-ছাড়া আর কেউ নয়। তা হলে এ সন্ন্যাসিনীও নিশ্চয়ই উচ্চকোটির সাধিকা। একলা পথ চলতে গিয়ে বিপন্ন হওয়ায় জগজ্জননী কামাখ্যা মাঈ স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে এঁকে ভালো আশ্রয়ে রেখে গেছেন।"

দেখতে দেখতে কামাখ্যা পাহাড়ে রটে যায়,—মাতাজী হচ্ছেন কামাখ্যা দেবীর কৃপাপ্রাপ্তা মহাসাধিকা, শুধু তাই নয় প্রচুর যোগ-বিভূতির তিনি অধিকারিণী।

ঐ সময়ে পাণ্ডাগৃহে পূর্ববঙ্গের এক ধর্মপ্রাণা জমিদার গৃহিণী বাস করছিলেন কামাখ্যাদেবীর দর্শনের জন্য। অসুস্থা মাতাজীর সেবা-শুশ্রূষায় তিনিও অংশ গ্রহণ করেন। মাতাজীকে দেখে, তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ ক'রে এই ভক্ত মহিলাটি তাঁর প্রতি অতিশয় আকৃষ্টা হয়ে পড়লেন, একান্তভাবে ধরে বসলেন দীক্ষা গ্রহণের জন্য। মাতাজী সানন্দে এঁকে কৃপা করলেন।

পাণ্ডাগৃহে দর্শনার্থী ভক্ত ও কৌতূহলী নরনারীর ভিড় কিন্তু ক্রমে বেড়েই চলল। তাই আর কালবিলম্ব না ক'রে কামাখ্যা পাহাড় ত্যাগ ক'রে মাতাজী উপনীত হলেন কলকাতায়।

আরও তিন চার বৎসর উত্তর ও দক্ষিণের নানা স্থানে পরিব্রাজনের পর বর্ধমান অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রে মাতাজী তাঁর কৃপালীলা বিস্তার করতে থাকেন। কাশ্মীর, জম্মু, পাঞ্জাব, বাংলা এবং উড়িষ্যার বহু সাধক, পণ্ডিত এবং বিশেষ ক'রে ধর্মপ্রাণা মহিলারা তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ ক'রে ধন্য হন। পুরুষ, নারী, ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত যে-ই হোক না কেন আর্ত বা মুমুক্ষু হয়ে একবার শরণ নিলে মাতাজী তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। তাঁর মাতৃহৃদয়ের কল্যাণধারা ঝরে পড়ত অজস্রধারায়। এঁদের অধ্যাত্মজীবন গঠনে তাঁর দৃষ্টি থাকত সতত জাগ্রত।

ইতিমধ্যে উপযুক্ত আধার বুঝে কিছুসংখ্যক মহিলা ভক্তকে মাতাজী সন্ন্যাস দিয়েছেন। একান্তে, অনুকূল পরিবেশে এবং নিরাপদে কোথায় এরা তপস্যা করবে—সে এক বড় সমস্যা। এই সন্ন্যাসিনীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়। গৃহস্থ ভক্তেরা পরমোৎসাহে একাজে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। সকলের সমবেত চেষ্টায়, ১৩৪০ সালে কালনার ছোট দেউড়ী পল্লীতে একটি মঠ নির্মিত হল, বিগ্রহ স্থাপন করা হল জ্ঞানেশ্বর মহাদেবের। মাতাজী এই মঠের নাম দিলেন আনন্দ আশ্রম।

দীর্ঘ-জীবনের সাধনবলে মাতাজী জ্ঞানানন্দ পৌঁছে গিয়েছিলেন অধ্যাত্মতত্ত্বের মর্মমূলে, তাই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের এক অপরূপ সমন্বয় দেখা গিয়েছিল তাঁর মহাজীবনে। ভিন্নপন্থী সাধকদের কখনও তিনি খণ্ডবুদ্ধি নিয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না, আর তাঁরাও এই মহীয়সী সন্ন্যাসীর মধ্যে লক্ষ্য করতেন আত্মজ্ঞানের মহিমময় প্রকাশ। অজানা অচেনা যে কোনো সিদ্ধ সাধকই তাঁকে গ্রহণ করতেন পরম শ্রদ্ধায়।

মাতাজী তখন মানকরে মহেশ বিশ্বাসের ভবনে বাস করছেন। বিশ্বাসমহাশয়ের দীক্ষাগুরু প্রখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কৈলাসপতি মহারাজ হঠাৎ একদিন সেখানে এসে উপস্থিত। মাতাজী জ্ঞানানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। নানা উচ্চতর তত্ত্ব আলোচনা চলল উভয়ের মধ্যে। মাতাজীর জ্ঞান, ভক্তি ও যোগবিভূতির পরিচয় পেয়ে আচার্য কৈলাসপতি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিশ্বাসমহাশয়ের কাছে বার বার মাতাজীর সাধুবাদ ক'রে বললেন, "তোমার পরম সৌভাগ্য যে এমন একটি উচ্চকোটি মহাত্মার সান্নিধ্য ও আশ্রয় তুমি লাভ করতে পেরেছো, যতটা পার এঁর থেকে গ্রহণ করো।"

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর এক প্রবীণ শিষ্য, রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতাজীর সাধন-ঐশ্বর্যের সংবাদ পেয়ে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। মাতাজীর সঙ্গে কিছুকাল ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করার পর বিস্ময়ে ও আনন্দে তিনি অভিভূত হন। এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে মাতাজী তাঁর কয়েকটি দীক্ষিতা শিষ্যার শিক্ষা-ভার গ্রহণ করেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি ছিল বাঁকুড়ার সোনামুখী গ্রামে। প্রসিদ্ধ সাধক পাগল-হরনাথও বাস করতেন এখানে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে মাতাজী একবার তাঁদের গ্রামে উপনীত হন। পাগল-হরনাথ তাঁকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গেই সহর্ষে চীৎকার ক'রে ওঠেন, "ওগো, ইনি তো মানবী নন, ইনি যে স্বর্গের দেবী—স্বর্গের দেবী!"

যে কয়দিন মাতাজী সেখানে ছিলেন, সিদ্ধপুরুষ পাগল-হরনাথ তাঁকে দেবী জ্ঞানেই নিবেদন করেছিলেন তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা।

মঠে, মন্দিরে, পরিব্রাজনে বা গৃহস্থগৃহে যখন-যেখানে মাতাজী বাস করতেন, আর্ত ও মুমুক্ষুদের পরম কল্যাণসাধনে থাকতেন সদা তৎপর। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষ মূলসত্তা ব্রহ্ম থেকে এসেছে, সেই মূলেই আবার সে অনিবার্যরূপে যাবে মিলিয়ে। তাই প্রত্যেক মানুষই সাধনার অধিকারী—প্রত্যেকেই ব্রহ্মরসের এক একটি আধার। সাধনা ও সিদ্ধির ভেতর দিয়ে এই আধারকে শুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে, করতে হবে ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত।

শিষ্যদের ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়ে মাতাজী বলতেন, "ডাবের জল খেতে হলে দা' দিয়ে কেটে ছাল, খোল বাদ দিয়ে খেতে হয়। জলটুকু অবশ্য আস্বাদনের জন্যে উপকারের জন্যে ব্যবহার হল। কিন্তু ডাব বললে শুধু জলটুকুই বুঝায় না। ছাল, খোলা, এই সব নিয়ে তবে তো ডাব। তেমনি জীবজগৎ সব নিয়েই ব্রহ্ম। তবে যেভাবে লোকে জগৎ দেখে, জগৎ কিন্তু সেভাবের নয়। ব্রহ্ম আর জগৎকে যদি আলাদা আলাদা মনে করো তবে জগৎ নাই। বিশাল সমুদ্র, তার কতকটা বরফ আর কতকটা বুদ্বুদ, বাকী সব জল। আবার দেখ, বরফটাও জল—ফেনা বুদ্বুদ এরাও তো জল। জলেই উৎপত্তি, জলেই স্থিতি আবার জলেই লয়। তেমনি এই জগতের। ব্রহ্মই উৎপত্তি, স্থিতি আর লয়। সমুদ্রকে বাদ দিয়ে যেমন বরফ নেই, ফেনা নেই, বুদ্বুদ নেই, তেমনি ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ বলে কিছু নেই।"

সমদর্শিতা আর সমন্বয় দৃষ্টি ছিল মাতাজীর সাধনসত্তার সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য। শঙ্করের মতাদর্শের কথা বলতে গিয়ে এক শিষ্য সেদিন শুষ্ক জ্ঞানের বুলি আওড়াচ্ছিলেন। মাতাজী দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, "আমরা শঙ্কর সম্প্রদায় বলে কি আমি শঙ্করের কেনা চাকর? শঙ্কর যা বলেছেন, তাও ঠিক, আবার রামানুজ যা বলেছেন

তাও ঠিক—নিম্বার্ক যা বলেছেন তাও ঠিক। তাঁর সম্বন্ধে যিনি যা বলেছেন বা বলতে পারেন—তিনি তাই। তিনি যে কি আর কেমন—তা কেউ বলতে পারে না, ভাবতেও পারে না। ঈশ্বরের বিভূতি চরম। বিভূতি মানে বিভিন্ন হওয়া। রকমারিই হল তাঁর প্রকৃতি; প্রকৃতি মানেই তো প্রকার। তাঁরই তো রকমারি ভাব। আগে দ্বৈতটাই ভাল ক'রে হোক। তারপরে অদ্বৈত যখন হবে, তখনি আপনিই হবে। এখন বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। ঘটকালি থাকুক বিয়ে হোক্, দু'হাত একহাত হোক্, ঘন ঘন পরিচয় হোক্, ভয় সংশয় ভাঙুক। তারপর যখন দুই-প্রাণে এক প্রাণ হবে তখন আর অদ্বৈত শেখাতে হবে না। আর শঙ্করাচার্য বেদান্তে কত যে উপাসনার কথা বলেছেন। উপাসনা মানে কি? নিকটে বসা তো? তবেই তো দ্বৈত হল। আগে তাঁর কাছে বসতেই দে।"

সাধনার মূল তত্ত্বটি বিবৃত করতে গিয়ে একদিন বলতে লাগলেন —"রাধিকা আর সাধিকা একই মানে। মানুষ যখন সাধন করে তখনই সাধিকা বা রাধিকা হয়। সাধনার শেষে বুঝি—আমি তাঁর প্রকৃতি বা শক্তি। আমি তাঁকে ছেড়ে আলাদা নয়। একেবারে যখন চরমে ওঠে, তখন সে আর আমি দুজন থাকে না, এক অদ্বিতীয় হয়ে যায়। বহির্মুখবৃত্তি ছেড়ে যখন অন্তর্মুখবৃত্তি হয়, তখনই আত্মশক্তির নাম হয় রাধিকা। রাধিকার কৃপা না হলে কৃষ্ণ লাভ হয় না। শাস্ত্রে বলে—গুরুকৃপা, শাস্ত্রকৃপা আর আত্মকৃপা এই তিনটি একত্র না হলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। আত্মকৃপা মানে আত্মশক্তির কৃপা—রাধিকার কৃপা। তোমার অন্তরে তাঁকে পাবার জন্যে ব্যাকুল আগ্রহই হচ্ছে কৃপার চিহ্ন। এটাই হচ্ছে রাধিকার অঙ্গ জ্যোতিঃ।

আবার কখনো-বা নির্দেশ দিতেন, "মন যখন চঞ্চল হবে তখন প্রাণকে অবলম্বন করো। যথাশক্তি ধীরে ধীরে প্রণবসহ শ্বাস টেনে খানিক ধরে আস্তে আস্তে প্রণবসহ ছাড়বে। এই রকম খানিক ক'রেই দেখবে মন বাগে আসছে। প্রাণ আর

প্রণব, চঞ্চল মনের চাবুক—আর ধমক। ওঁকার তো মনোজয়ীর হুঙ্কার।"

সংসারীদের জন্য তাঁর নিষ্কাম কর্মের উপদেশ ছিল বড় প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী। তাদের উদ্দেশ ক'রে বলতেন, "সংসারীদের পক্ষে তাঁকে সর্বদা স্মরণ রাখা অসম্ভব কিসে? সাধারণ গৃহস্থ মেয়েরা কেমন করে, দেখ না। স্বামী ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন স্ত্রী তাঁর পদসেবা কচ্ছেন, কোলের ছেলেকে স্তন্য দুগ্ধ খাওয়াচ্ছেন, বড় ছেলেকে বাজারে কি কি জিনিস আনতে হবে তার বরাত কচ্ছেন, পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আবার দাসী বাসন-কোসন কেমন ক'রে ধুয়েছে, ঘরে কোন্ জায়গায় ভাল ক'রে ঝাড়ু দেয় নাই, সেদিকেও লক্ষ্য করছেন। অথচ স্বামীর পায়ের কোন্ জায়গায় কেমন ক'রে টিপলে তাঁর সোয়াস্তি হবে, তাই বুঝে বুঝে টিপছেন আর স্বামীর অঙ্গস্পর্শের সুখটুকুও অনুভব কচ্ছেন। তবে-তোমার কেন সংসার করা আর তাঁকে স্মরণ করা এক সঙ্গে হবে না, বলছ। সংসার করো, তাঁকে স্মরণও করো। অভ্যাস করো, সব সোজা হয়ে যাবে। এই যে আমি তোমাদের এই-সব কথা বলছি, কিন্তু আমার নজর সেখানে।"

প্রায় নব্বই বৎসর কাল মাতাজী নরদেহে অবস্থান করেন। দীর্ঘ সাধনজীবনে ও আচার্যজীবনে বহু নরনারীকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, কৃপা ক'রে পৌঁছে দিয়েছেন পরমপ্রাপ্তির পথে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে এই সব আশ্রিত ও কৃপাপ্রাপ্তদের মাঝে মাঝে বলতেন, "ছাখ, আমার এই ভঙ্গুর দেহটার ওপর কখনো গুরুত্ব দিবিনে। সদা লক্ষ্য স্থির রাখবি এর ভেতরকার চৈতন্যময় সত্তার ওপর। আর একটা কথা যেন স্মরণ থাকে। আমার এই দেহের খোলস যেদিন ছেড়ে যাব, অগ্নি-সংকারের পর এর ভস্ম বা অস্থি তোরা কেউ সংগ্রহ করবিনে। দেহাত্মবোধ ছাড়বার জন্যে তোদের উপদেশ দিচ্ছি—তার দৃষ্টান্ত কি পাকা হবে পুরোপুরি পাকা দেহাত্মবোধ দিয়ে? তাতে যে আসল গুরুত্ব কোথায় হারিয়ে যাবে।

দেবী সারদামণি

জয়রামবাটীর অখ্যাত পল্লীবালিকা সারদামণি আবির্ভূতা হয়েছিলেন মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপে, উত্তর-সাধিকারূপে। ব্রহ্মবিদ্ স্বামীর তপস্যার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এই তাপসীর অধ্যাত্ম-জীবন, এই স্বামীরই দিব্য কৃপার ইন্দ্রজাল-স্পর্শে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তিনি শ্রদ্ধাভক্তির মূর্ত বিগ্রহরূপে, আপ্তকাম সাধিকারূপে।

রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর সারদামণির জীবনে দেখা যায় গুরুভাবের পরম অভ্যুদয়। নবতর চেতনায়, নবতর মহিমায়, উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। একাধারে তখন তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জননী ধারয়িত্রী ও পালয়িত্রী। শত শত ভক্ত-নরনারী ধন্য হয় তাঁর পরমাশ্রয় লাভে।

উত্তর-জীবনে এই সঙ্ঘমাতার ভেতরে ফুটে উঠতে দেখি আর একটি ঈশ্বরনির্দিষ্ট দূরপ্রসারী ভূমিকা, দেখি তাঁর সর্বজনীন কল্যাণময়, লোকোত্তর সত্তা। দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল ভক্ত মানবের হয়েছেন তিনি আলোক-দিশারিণী। দেবী মানবীরূপে ঘটেছে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরণ। সারদামণির সেই জ্যোতির্ময়ী দেবীসত্তা আজো বিশ্বমানবের মনোলোকে, ঊর্ধ্বাকাশে, ফুটে রয়েছে ধ্রুব নক্ষত্রের মতো। সেই অনির্বাণ নক্ষত্রের সুধাস্নিগ্ধ আলো পথ দেখিয়ে চলছে অগণিত মুমুক্ষুদের।

রামকৃষ্ণ-শক্তি, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী আর দেবী-মানবী—এই তিনটি সত্তার বিকাশ ও উদ্ভাসনে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন সারদামণি। মানবীয়তা, আর দেবীত্বের যে অপরূপ সমাহার ঘটেছিল তাঁর জীবনে —কৃপারূপে, পরমকল্যাণরূপে অজস্র ধারায় তা ঝরে পড়েছিল মাটির মানুষের বুকে, দেখিয়েছিল দিব্যজীবনের অমৃতময় পথ।

রামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর থেকে তিন মাইল পশ্চিমে জয়রামবাটী। হুগলী জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র গ্রামটি বিধৌত করে বয়ে চলেছে দামোদর নদ। এখানকার স্বল্পবিত্ত একশতটি পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে বিরাজিত রয়েছে সিংহবাহিনীর মাড়ো বা দেবদেউল। এই মন্দিরেরই পূজারী ছিলেন মুখোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণেরা এবং এই বংশেই আবির্ভূতা হয়েছিলেন সারদামণি। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন রামচন্দ্রের উপাসক, সদাচারী, ইষ্টনিষ্ঠ ব্যক্তি। জননী শ্যামাসুন্দরীও পরিচিতা ছিলেন তাঁর ধর্মপ্রাণতা, সরলতা ও হৃদয়বত্তার জন্য।

রামচন্দ্রের অর্থসাচ্ছল্য কোনোদিনই ছিল না। সংসার চালাতেন, যজন যাজন ও চাষবাস ক'রে। সম্বলের ভেতর ছিল কয়েক বিঘা একফসলা জমি, তাতে যে ধান হতো তা দিয়ে পরিবার ভালোভাবে প্রতিপালন করা যেত না। পৌরোহিত্য থেকে কিছুটা উপার্জন হতো, তাছাড়া তুলোর চাষ ক'রেও আয়ের ব্যবস্থা করতেন রামচন্দ্র।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠা হন মহাসাধিকা সারদামণি। পিতামাতার তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান।

উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে নিজের জন্ম বিষয়ে অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন সারদামণি।

মা শ্যামাসুন্দরী সেদিন শিহড় গ্রামে ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। মন্দিরের কাছে এক গাছতলায় বসেছেন, হঠাৎ একটা দমকা বায়ু যেন প্রবেশ করল তাঁর উদরে। দেখলেন, লাল চেলী-পরা একটি পাঁচ বৎসরের সুন্দরী মেয়ে, গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে, কোমল দুটি হাত দিয়ে পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। মধুর কণ্ঠে বলল, "আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।"

এই দিব্য দর্শন ও দিব্য কণ্ঠস্বর শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন শ্যামাসুন্দরী। অতঃপর সঙ্গিনীরা তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করেন, তারপর সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

পিতা রাম মুখোপাধ্যায়ও নাকি ঐ সময়ে স্বপ্নযোগে লাভ করেন দিব্যলোকের ইঙ্গিত। বৃহৎ পরিবারের, অন্ন সংস্থানের জন্য সদাই তাঁকে বিব্রত থাকতে হয়। ভাবলেন অবিলম্বে কলকাতায় যাবেন, সেখান থেকে পৌরোহিত্য ক'রে আয় বাড়ানো যায় কিনা চেষ্টা ক'রে দেখবেন। রওনা হবার আগের দিন মধ্যাহ্নভোজন সেরে শয্যায় একটু গা গড়িয়ে নিচ্ছেন। তন্দ্রার ঘোরে দেখলেন এক মনোরম স্বপ্ন। মূল্যবান আভরণে সজ্জিতা কাঞ্চনবর্ণা এক বালিকা সস্নেহে তাঁর কণ্ঠলগ্না হয়ে তাঁকে আদর করছে।

"কে-গো, মা, তুমি? কি চাও আমার কাছে, বলতো?" স্নেহভরে প্রশ্ন করেন রামচন্দ্র।

আনন্দোচ্ছল হয়ে কন্যাটি উত্তর দেয়, "আমি যে তোমার কাছেই এলুম গো।"

ঘুম তখনি ভেঙে গেল, রামচন্দ্র ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন শয্যায়। সহর্ষে ভাবতে লাগলেন, তবে কি স্বয়ং মা-লক্ষ্মী কৃপা ক'রে আবির্ভূতা হচ্ছেন তাঁর ঘরে?

কলকাতায় গিয়ে অর্থ উপার্জন সম্বন্ধে কিন্তু তেমন কিছু সুরাহা করতে পারেন নি রামচন্দ্র। কিছুদিন পরে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে শুনলেন তাঁর শিহড়ের দৈবী অভিজ্ঞতার কথা। সরল, ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, ঐশ্বর্যময়ী এবং দেবী-অংশে জাত এক শিশুকন্যা এবার ভূমিষ্ঠা হবে তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট কুটিরে।

সারদার বয়স তখন সবেমাত্র পাঁচ বৎসর। এরই মধ্যে এসে গেল তাঁর এক বিয়ের প্রস্তাব। পাত্র হচ্ছেন কামারপুকুর গাঁয়ের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধর। জানাশোনা ঘরের ছেলে, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়ির অন্যতম পূজারীরূপে কাজকর্ম করেন। সদাচারী, স্বভাবভক্ত, সাধননিষ্ঠ এই পাত্রটিকে পেয়ে সারদার পিতা রামচন্দ্র খুবই খুশী, বিয়ের কথা পাকা ক'রে ফেলতে আর তিনি দেরি করেন নি। পরে কিন্তু জানা গেল, এ বিয়ের ঘটকালি আসলে করেছেন পাত্র নিজেই।

জননী চন্দ্রমণি দেবী পুত্র গদাধরের জন্য দুশ্চিন্তায় অধীর। এই তরুণ বয়সেই সাধনভজন নিয়ে সে মেতে উঠেছে, কখন যে তার বায়ু চড়ে যায়, ভাবোন্মত্ত হয়ে পড়ে, তার কিছু ঠিক নেই। শান্তি স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়-ফুঁক, চণ্ড নামানো, অনেক কিছু অনুষ্ঠান করা হয়েছে, তেমন কিছু ফল হয় নি। মা ভাবলেন, ছেলের বিয়ে দিলে হয়তো এই বায়ুরোগ আর ভাবোন্মাদ সেরে যাবে। স্ত্রীর দিকে, সংসারের দিকে, মন আকৃষ্ট হলে হয়তো ক্রমে উঠবে সে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে। ফলে আত্মীয়-স্বজনেরা ঐ অঞ্চলের চারদিকে শুরু করলেন পাত্রীর অনুসন্ধান।

সাধক গদাধরের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে ইতিমধ্যে কিছুটা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের দৃশ্যপট। জেনে নিয়েছেন তিনি সংসারী না হলেও সংসারাশ্রম তাঁকে মেনে নিতে হবে ঐশী প্রয়োজনে। আর এজন্য তাঁকে গ্রহণ করতে হবে সাত্ত্বিক-সংস্কারযুক্তা বিদ্যারূপিণী স্ত্রী হবেন তাঁর ধর্মপথের পরম সহায়িকা। ঈশ্বরনির্দিষ্ট এই ভাবী স্ত্রীর ছায়াছবি ফুটে উঠেছে তাঁর মনের মুকুরে।

তাই আত্মপরিজনেরা যখন পাত্রীর জন্য ছুটাছুটি করছেন, সহাস্যে নিজেই তিনি বলে দিলেন, "কেন হেথা হোথা তোমরা ছুটোছুটি ক'রে মরছো? জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে যাও, দেখবে বিয়ের কনে কুটো-বাঁধা হয়ে আছে।"

নির্দিষ্ট স্থানে পাত্রীর সন্ধান ঠিকই পাওয়া গেল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। পাত্র গদাধরের বয়স তখন চব্বিশ, আর সারদামণি পাঁচ বৎসরের বালিকা।

ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেন তাঁর রামকৃষ্ণ পুঁথিতে বিবাহ বাত্রের অনুষ্ঠানের একটি ঘটনার কথা লিখেছেন :

জ্বালিয়া সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে যবে বরে ঘেরি রমণী সকলে॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা॥

হরিদ্রা মাখানো সূতা ছিল বাঁধা হাতে।
অপূর্ব প্রভুর খেলা দেখিতে শুনিতে॥
চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা বন্ধন॥

কবিভক্ত অক্ষয় সেনের নিজ ভাষ্য যাই হোক না কেন, পরবর্তীকালে, রামকৃষ্ণ ও সারদার জীবনলীলায় এ সত্যটি প্রকটিত হয়েছে যে, মানবীয় সংস্কারধর্মী বিবাহজীবনকে এই দেবমানব দম্পতি ঊর্ধ্বায়িত ক'রে তুলেছিলেন। দিব্য জীবনের মহামিলন ক্ষেত্রে নরনারীর লোকোত্তর সম্ভাব পূর্ণতম বিকাশ ও একীকরণ ঘটেছিল তাঁদের আত্মিক যোগবন্ধনের মাধ্যমে।

কন্যাপক্ষকে তিনশত টাকা দিতে হয়েছে, তদুপরি করতে হয়েছে অনেক কিছু আনুষ্ঠানিক খরচ। গদাধরের জননীর হাতে তখন টাকাকড়ির বড় অভাব। নূতন বউ সারদার জন্য গহনাপত্র গড়াতে না পেরে তিনি বড় মনঃক্ষুণ্ণ। পাত্রীপক্ষের অবস্থাও মোটেই সচ্ছল নয়। তাঁরাও মেয়েকে কোনো অলংকার দিতে পারেন নি। কি ক'রে নিজেদের মানসম্ভ্রম বজায় রেখে নূতন বউ বরণ করবেন, শাশুড়ী চন্দ্রমণি ভেবে থেই পাচ্ছেন না। শেষটায়, লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে কয়েকটি অলংকার ধার নিয়ে এসে সারদাকে সজ্জিত করা হল।

আনন্দ উৎসব শেষ হয়ে গেল, এবার তো পরের বাড়ির অলংকার ফেরত দিতে হবে। চন্দ্রমণির দুশ্চিন্তার অবধি নেই। নূতন বালিকা বধূর অঙ্গ থেকে ঐ সব গহনা কোন্ প্রাণে তিনি খুলে আনবেন?

মায়ের এ সংকটে আশ্বাস দিলেন গদাধর। বললেন, "মাগো, এজন্য তুমি ভেবে মরছো কেন? সারদা যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়বে, আলগোছে একটা একটা ক'রে আমি সব খুলে নেবো। লাহাদের জিনিস তাদের ফেরত দিয়ে দিও।"

অতি সন্তর্পণে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ সাঙ্গ করলেন গদাধর, জননী চন্দ্রমণি এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু গোল বাধালেন বধূ সারদা। ঘুম থেকে উঠেই তিনি শুরু করলেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন, তাঁর হাতে গলায় যে সব গয়না ছিল, তা গেল কোথায়?

শাশুড়ীর নয়ন দুটি তখন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। সারদাকে বুকে টেনে নিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন সান্ত্বনা দিয়ে, "মা, তুমি ভেবো না। আমার গদাই তোমায় এর চেয়েও কত ভালো ভালো গয়না দেবে।"

সারদা শান্ত হলেন, গহনার কথা বিস্মৃত হতেও দেরি হল না। কিন্তু গোল বাধালেন তাঁর খুল্লতাত। ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি দেখতে এসেছিলেন, বিয়ের রাতের অলংকার তার গায়ে নেই দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি, তখনি সারদাকে কোলে তুলে দ্রুতপদে চলে গেলেন জয়রামবাটীতে।

শাশুড়ী চন্দ্রমণির সেদিনকার আশ্বাস কিন্তু নিছক স্তোকবাক্যে পরিণত হয় নি। পুত্র গদাধর, উত্তরকালে সর্বজন বন্দিত মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ, মায়ের বাণীর সত্যতা ঠিকই রক্ষা করেছিলেন। সারদামণি সজ্জিত হয়েছিলেন নানাবিধ স্বর্ণ অলংকারে। শুধু তাই নয়, বহুজনের আলোকদিশারী, ব্রহ্মবিদ্ মহাসাধক, এই স্বামীই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম অলংকার। স্বামীর লোকোত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্তা হয়ে সারদামণি নিজেও রূপান্তরিত হয়েছিলেন বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠা সাধিকারূপে। সাধনজীবনের পরম ঐশ্বর্য অবলীলায় হয়েছিল তাঁর করায়ত্ত। আর এ ঐশ্বর্য অকৃপণ করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি শত শত অধ্যাত্মসন্তানদের ভেতর।

স্বামী দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কর্মস্থানে চলে গেলেন, বালিকা সারদাকে অবস্থান করতে হল জয়রামবাটীতে তাঁর পিতৃগৃহে।

বয়স একটু বাড়লে দেখা গেল, মায়ের সাংসারিক কাজকর্মের তিনি বড় সহায়িকা। তাছাড়া, সারদা যেমন বুদ্ধিমতী ও চটপটে তেমনি প্রচুর শুভ সংস্কার নিয়ে করেছেন জন্মগ্রহণ। ধান ভানা, গরুর জাব দেওয়া, বাগিচার গাছ থেকে তুলো সংগ্রহ করা, ক্ষেতের

কৃষকদের মুড়ি দিয়ে আসা, অনেক কিছুই তাঁকে করতে হতো। এই সঙ্গে ছিল ছোট ছোট ভাইবোনদের লালনের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সদাই তিনি বহন করতেন হাসিমুখে ও সানন্দে।

পিতার উপার্জনে কোনো মতে সবাইর ভরণ-পোষণ চলতো বটে, কিন্তু কাপড়-চোপড় কেনা সম্ভব হতো না। এজন্য মায়ের সঙ্গে বসে দিনের পর দিন সুতো পাকাতেন, পৈতে কাটতেন, তা বিক্রি ক'রে কেনা হতো প্রয়োজনীয় জামাকাপড়।

দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতো গ্রাম্য জীবনের আমোদ-আহ্লাদে অংশ গ্রহণ। শরৎকালে হতো গ্রামের সিংহবাহিনীর সাড়ম্বর পূজা। রাধাষ্টমী ও শ্যামা পূজাতে হতো কত হৈচৈ আনন্দোৎসব। শিবরাত্রিতে গ্রামের বধূরা শিহড়ে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতেন, এতে সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করতেন সারদা। ব্রত পার্বণ উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তে প্রায়ই কীর্তন আখড়াই আর যাত্রা অভিনীত হতো, এসবের ভেতর দিয়ে ধর্মজীবনের রস আহরণ করতেন তিনি। লেখাপড়ার সুযোগ তাঁর জীবনে কমই জুটেছিল, দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষার বেশী তা অগ্রসর হয় নি। কিন্তু গ্রামের পূজা পার্বণ এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শাস্ত্র পুরাণের কাহিনী ও সার সত্য ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে তাঁর দেরি হয় নি।

বাল্যকাল থেকেই অলৌকিক শক্তির এক বেষ্টনীতে ঘেরা ছিল সারদামণির জীবন। এ সম্পর্কিত দর্শন ও অনুভূতির কথা উত্তরকালে ভক্তদের কাছে নানা সময়ে তিনি বর্ণনা করেছেন।

জয়রামবাটীতে বাল্যকালের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ছেলেবেলায় দেখতুম, আমারই মতো মেয়ে সদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতো, আর আমার নানা কাজে সাহায্য করতো। আমার সঙ্গে কত আমোদ আহ্লাদ করতো। কিন্তু অন্য কোনো লোক কাছে এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ এগারো বছর অবধি এরকম চলেছিল।"

গরুর জন্য জল ঘাস চাই, সারদা বুক জলে নেমে তা কাটতে শুরু

করতেন। প্রায়ই লক্ষ করতেন, একটি সমবয়স্কা মেয়ে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আঁটির পর আঁটি কেটে দিচ্ছে। তিনি হয়তো এক আঁটি পাড়ে রাখতে গিয়েছেন, ইতিমধ্যে ঐ অচেনা মেয়েটি আরো কয়েক আঁটি কেটে রেখেছে তাঁর জন্যে। তারপর এক সময়ে হঠাৎ এই মেয়ে কোথায় হয়ে যেতো অদৃশ্য।

সারদামণির বয়স তের বৎসর। কামারপুকুরে শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। হালদার পুকুরে তাঁকে স্নান করতে যেতে হবে। পথের দুই ধার জঙ্গলাকীর্ণ এবং সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ পুষ্করিণী। একলা এ পথটি অতিক্রম করতে তাঁর ভয় হচ্ছিল। ভাবছিলেন, নূতন বউ একলা কি ক'রে নাইতে যাবো?

এ কথাটি ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, আটটি মেয়ে কোথা থেকে এসে দাঁড়ালো তাঁর সম্মুখে। ভরসা পেয়ে সারদাও রাস্তায় নেমে গেলেন। ঐ মেয়েদের চারজন দাঁড়ালো তাঁর সম্মুখে, অপর চারজন সারিবদ্ধ হয়ে রইল তাঁর পিছনে। তারপর নীরবে পথ চলে স্মিতহাস্যে সবাই পৌঁছুলেন স্নানের ঘাটে। স্নান সমাপনের পর পূর্ববৎ এই সঙ্গীরা সারদাকে নিয়ে ফিরে এল তাঁর বাড়ির কাছাকাছি তারপর কোথায় তারা হল অন্তর্হিত।

এই সঙ্গিনীরা রোজই তাঁকে স্নানের সময় এমনি ক'রে ঘিরে চলতো। সারদা জানতেন না তারা কে ও কোথা থেকে আসা যাওয়া করছে। লজ্জাশীলা নববধূ তিনি, সাহস ক'রে তাঁদের কিছু জিজ্ঞেসও করেন নি কোনোদিন। পরে বুঝেছিলেন, এরা ছিলেন অষ্টসখী, ঈশ্বরীয় ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হতো এঁদের এই বিস্ময়কর আসা যাওয়া।

স্বামী রামকৃষ্ণ সেবার স্বগ্রাম কামারপুকুরে এসেছেন, সারদাও রয়েছেন তাঁর সান্নিধ্যে। মধুর সান্নিধ্যে, হাসি আনন্দে, দিন অতিবাহিত হচ্ছে এবং এই সঙ্গে রামকৃষ্ণ সবার অলক্ষ্যে পত্নীর লৌকিক ও ধর্মজীবনকে গড়ে তোলবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন।

সারদামণির ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী, রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী, লক্ষ্মী দেবী সে সময়কার অন্তরঙ্গ জীবনের এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন:

ঠাকুব প্রাযই কিশোবী স্ত্রীকে সংসাবেব অনিত্যতা, দুঃখ-কষ্টের কথা বুঝাতেন, 'বৈবাগ্য ও ভগবৎ ভক্তিই সাব'। বলতেন, 'শেযাল কুকুরের মতো কতকগুলো কাচ্চা বাচ্চা বিইযে কি হবে ?'

মাযেব মাব অনেকগুলো ছেলেমেযে হয়েছিল, কযেকটি মারাও গিযেছিল। মা তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনদেব কত কোলে কাঁখে কবেছেন, তাদেব মৃত্যুতে তাঁব মা-বাপেব শোককষ্টও দেখেছেন, নিজেও শোকতাপ পেযেছেন,—সেই সকল উল্লেখ ক'রে ঠাকুব বলতেন—তোমাবও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হযেছে। দেখেছো তো কত দুঃখকষ্ট। হাঙ্গামে দবকাব কি ? ওসব না হলে, আছো ঠাকৃরুণটি, থাকবেও ঠাকৃরুণটি।

মা ঠাকৃরুণ সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কামাবপুকুবেব সংসাবেব যাবতীয কাজ নিজ হাতে কবতেন। একদিন সকালবেলায মা বাড়ির ভেতবে নিজ হাতে গোবব মাটি দিযে লেপছেন, ঠাকুব বাইবে দাঁতন কবছেন, আব নানাবূপ বঙ্গরসেব কথা ব'লে সকলকে হাসাচ্ছেন। মা-ঠাকৃরুণকে লক্ষ্য ক'বে বললেন; "ছেলেব অন্নপ্রাশনে যে কোমবে গোট পবে নাচবে গাইবে, সেই ছেলে মবে গেলে সেই কোমব ভুঁইযে আছড়ে কাঁদতে হবে।"

লজ্জাশীল মা নীববে সব শুনছিলেন। ঠাকুব বাব বাব ছেলেব মৃত্যুর কথা বলতে থাকলে তিনি অবশেযে আস্তে আস্তে বললেন, 'সবগুলোই কি আব মবে যাবে ?'

মা'ব কথা বেব হতে না হতেই ঠাকুব চেঁচিযে বললেন, "ওবে জাত সাপেব ন্যাজে পা পড়েছেবে, জাত সাপেব ন্যাজে পা পড়েছে। ওমা, আমি বলি, সাদা-সিদে ভালো মানুষ; কিছু জানে না—পেটেব ভেতব সব আছে। বলে কিনা সবগুলো কি আব মবে যাবে ?"

এবপব মা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ছুটে পালিযে এলেন।

সাবদামণিব এই সমযকাব মানসগঠন ও তার প্রস্তুতি সম্পর্কে সাংবাদিক শিবোমণি, মনীষী, বামানন্দ চট্টোপাধ্যায লিখেছেন :

"রামকৃষ্ণ এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্তব্য-সাধনে যত্নবান হইলেন। পত্নীর আসা-না আসা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ উদাসীন থাকিলেও যখন সারদামণি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শিক্ষা-দীক্ষাদি দিয়া তাঁহার কল্যাণ সাধনে তৎপর হইলেন।

"রামকৃষ্ণকে বিবাহিত জানিয়া শ্রীমদাচার্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময় বলিয়াছিলেন,—তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ বৈরাগ্য বিবেক বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে বহুদূর রহিয়াছে।[১]

"তোতাপুরীর এই কথা রামকৃষ্ণের মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনলব্ধ নিজের বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল। কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি কোনো কাজ উপেক্ষা করিতে বা আধসারা করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। এই বিষয়েও তাহাই হইল।

"ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অর্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন না। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা ও গৃহকর্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশকাল পাত্র ভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন, তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।[২]

"চৌদ্দবৎসর বয়সের সময় যখন সারদামণি দেবীর স্বামীর নিকট

---

১ লীলাপ্রসঙ্গ: সারদানন্দ

২ ঐ

হইতে শিক্ষালাভ আবন্ত হয়, তখন তিনি স্বভাবতই নিতান্ত বালিকা-স্বভাবসম্পন্না ছিলেন। 'কামাবপুকুব অঞ্চলেব বালিকাদিগের সহিত কলিকাতাব বালিকাদিগেব তুলনা কবিবার অবসব যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগেব দেহের ও মনেব পরিণতি স্বল্প বযসেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামার-পুকুর প্রভৃতি গ্রামেব সকল বালিকাদিগেব তাহা হয না। পবিত্র নির্মল গ্রাম-বায়ুসেবন এবং গ্রামমধ্যে যথাতথা স্বচ্ছন্দ বিহাবপূর্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবাব জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে'।[১]

"পবিত্রা বালিকা বামকৃষ্ণেব দিব্য সঙ্গে ও নিঃস্বার্থ আদব লাভে ঐকালে অনির্বচনীয আনন্দে উল্লসিত হইযাছিলেন। পবমহংসদেবেব স্ত্রীভক্তদিগেব নিকট তিনি ঐ উল্লাসেব কথা অনেক সময এইরূপ প্রকাশ কবিযাছিলেন—

'হৃদয় মধ্যে' আনন্দেব পূর্ণঘট তখন স্থাপিত বহিযাছে—ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব কবিতাম। সেই ধীব স্থিব দিব্য উল্লাসে অন্তব কতদূব কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবাব নহে।

কয়েক মাস পবে বামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুব হইতে কলিকাতায ফিবিলেন, সাবদামণি তখন অত্যন্ত আনন্দ-সম্পদেব অধিকাবিণী হইযাছেন—এইরূপ অনুভব কবিতে কবিতে পিত্রালযে ফিরিযা আসিলেন।"

সাবদামণিব এই সমযকাব আভ্যন্তবীণ বিবর্তনেব চিত্রটি স্বামী সাবদানন্দেব নিপুণ তুলিকায চমৎকাব রূপে ফুটে উঠেছে :

"উহা তাঁহাকে চপলা না করিযা শান্তস্বভাবা কবিযাছিল, প্রগল্‌ভা না কবিযা চিন্তাশীলা কবিযাছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না কবিযা নিঃস্বার্থ প্রেমিকা কবিযাছিল এবং অন্তব হইতে সর্বপ্রকাব অভাব-বোধ তিবোহিত কবিয়া মানব-সাধাবণেব দুঃখকষ্টেব সহিত অনন্ত

১ লীলাপ্রসঙ্গ · সাবদানন্দ

২ ঐ

সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক-উল্লাস প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।"

অতঃপর পিতৃগৃহে অবস্থান করেন সারদামণি। স্বামীর সঙ্গে যে কয়টি মাস বাস করেছেন, তার সুখস্মৃতি অন্তরে তাঁর পূর্ণ হয়ে আছে। দেবতুল্য স্বামী তাঁর। সেই সুগৌর তনু, সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ, প্রেমভরা চাহনি, কখনো কি বিস্মৃত হওয়া যায়? স্নেহ ভালবাসা ও মমত্ব দিয়া সারদাকে তিনি শুধু অভিভূতই করেন নাই, নিজের ধর্মধ্বুত জীবনের দিকে ধীরে ধীরে তাঁকে আকর্ষণ করেছেন, তাঁর সম্মুখে তুলে ধরেছেন কল্যাণময় জীবনের আদর্শ। স্বামীর সেই ভাবমূর্তিটি প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সারদার অন্তরপটে। এখন তিনি শুধু দিন গুণছেন, উৎকর্ণ হয়ে আছেন কবে আসবে প্রেমময় স্বামীর আহ্বান, আর দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে তাঁর সেবার স্থানটি সারদা সাগ্রহে গ্রহণ করবেন।

সে আহ্বান কিন্তু এলো না। দেখতে দেখতে প্রায় চার বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। সারদামণি প্রায় আঠারো বৎসরের যুবতী। পতির সঙ্গ কামনায় যখন তিনি সদা উন্মুখ হয়ে আছেন, সেই সময়ে তাঁর কানে আসতে লাগল মর্মভেদী সংবাদ। গ্রামে প্রচারিত হয়ে গেল, সারদার স্বামী গদাধর চাটুয্যে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধক রামকৃষ্ণ নামে খ্যাত হয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু আসলে সাধনভজন করতে গিয়ে তার মস্তিষ্ক গিয়েছে বিকৃত হয়ে। অতঃপর কত কানাঘুষা, নিন্দাবাদ শুরু হয়ে যায়, মুখরোচক কত গল্পই না রচিত হয় রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে।

পাড়া পড়শীরা বাড়িতে এসে সমবেদনা জানায়, "আহা শ্যামা-

সুন্দরীর মেয়েটাব কি পোড়াকপাল, স্বামীটা পাগল হয়ে গেল।" দুষ্ট প্রকৃতিব লোকেবা পথে ঘাটে সাবদাকে দেখতে পেলে আঙুল দেখিয়ে বলে, "ঐ যাচ্ছে পাগলেব স্ত্রী।"

মর্মবেদনায় অধীব হয়ে ওঠেন সারদামণি। ভাবেন, অমন বিবেকবান, বুদ্ধিদীপ্ত, ধর্মনিষ্ঠ স্বামী তাঁব, শেষটায় সত্যিই কি উন্মাদ হয়ে গেলেন। যদি তাই হয়ে থাকেন, তবে তো এ দুঃসময়ে সাবদাব উচিত তাঁব পাশে গিয়ে থাকা। প্রাণপণে তাঁব সেবাশুশ্রূষা করা। সবাই যখন এই দুঃসংবাদ নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনা করছে, এত কিছু বটাচ্ছে একবার চক্ষুকর্ণেব বিবাদ ভঞ্জন ক'বেই আসা যাক্ না।

গ্রামেব বহু স্ত্রীলোক সেবাব কোনো এক পর্ব উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে। সারদাব মনে ইচ্ছে জাগল, এই যাত্রিণীদেব সাথে তিনিও যাবেন, সেই সুযোগে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবেন স্বামীকে। প্রয়োজন হলে ভাব নেবেন তাঁব সেবাশুশ্রূষার।

কোনো এক সঙ্গিনীব কাছে নিজেব এই ইচ্ছা ব্যক্ত কবলেন সাবদা আব সেও অনতিবিলম্বে একথাটা রামচন্দ্রেব কানে তুলে দিল। কন্যাব বুকেব অব্যক্ত ব্যথাটি বুঝে নিতে পিতাব দেবি হয় নি। বললেন, "বেশ তো, সাবদা এ সুযোগে তাব স্বামীব কাছে যাক্, আমিও যাবো তার সঙ্গে।"

গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু হল। পদব্রজে প্রায় ষাট মাইল পথ তাঁদেব অতিক্রম কবতে হবে। দুই তিন দিন পথ চলাব পর সারদা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তাছাড়া দেহ অনভ্যস্ত পথশ্রমে ক্লান্ত। চবণযুগল ক্ষতবিক্ষত। ফলে বাধ্য হয়ে পিতা-পুত্রীকে আশ্রয় নিতে হল বাস্তাব পাশে একটি চটিতে।

জ্বরেব তীব্রতা বাড়ছে, আব সেই সঙ্গে বাড়ছে মনোবেদনা। আব বুঝি দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছানো সম্ভব হবে না, হবে না পতি-সন্দর্শনেব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ।

জ্বরে বেহুঁশ হয়ে চটির একটি কামরায় পড়ে আছেন সারদা। হঠাৎ এ সময়ে দেখতে পেলেন এক অলৌকিক দৃশ্য। কোথা থেকে মমতাময়ী এক রমণী মৃদু চরণে এসে তাঁর পাশে বসে পড়লেন। শ্যামবর্ণা এই নবাগতা। কিন্তু কি অপরূপ তার দেহকান্তি, নয়ন দুটি থেকে ঝরে পড়ছে অপার স্নেহ ভালোবাসা। সারদার কাছে ঘেঁষে বসে ঐ নারী হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তার মাথায় গায়ে। কোমল হস্ত স্পর্শে গায়ের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল, অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠল সারদার অন্তর।

ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "তুমি কেগো, কোথা থেকে আসছো।"

"আমি আসছি দক্ষিণেশ্বর থেকে," উত্তর দিলেন অপরিচিতা মমতাময়ী নারী।

বিস্ময়ে আনন্দে কিছুক্ষণ সারদার বাক্‌স্ফূর্তি হল না। তারপর বললেন, "দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছো? সেখানে যাবো বলেই তো আমি এসেছি। সেখানে যাবো, তাঁকে দেখবো, তাঁর সেবা করবো, কত আশাই না করেছিলাম। কিন্তু পথে জ্বর হল, হয়তো আর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।"

"সে কিগো। তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। কালই ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।"

"বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?"

"আমি যে তোমার বোন হই।"

"বটে? তাই তুমি আমার কাছে এসেছো?"

এইসব কথাবার্তার পরেই সারদামণি নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল তাঁর জ্বর অনেকটা কমে গিয়েছে, শরীরের গ্লানি আর তেমন নেই। রাত্রির ঐ দিব্য দর্শনের পর দেহে মনে তাঁর সঞ্চারিত হয়েছে নূতন বল, নূতন উৎসাহ।

অতঃপর পিতার হাত ধরে ধীর পদে তিনি চটি ছেড়ে যাত্রা

কবলেন। অল্প কিছুদূব যেতেই সৌভাগ্যক্রমে বাস্তায় এক পালকি পাওয়া গেল তার জন্য। পিতা এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন।

রাত্রিতে যখন দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছালেন, তখনও সারদাব শরীরে জ্বরেব উত্তাপ বয়ে গিয়েছে।

গঙ্গাব ঘাটে বামকৃষ্ণ ও তাঁব ভাগ্নে হৃদয উপস্থিত। ঠাকুব গভীব মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, "ওবে হৃদু, দেখে আয, ও প্রথম আস্ছে। বারবেলা নেই তো।"

বারবেলা আগেই উত্তীর্ণ হযে গিযেছে, সাবদাব সেকথা জানা ছিল। পতির স্নেহভবা কণ্ঠস্বব ও সানন্দ মুখভাব দেখে হৃদয় তাঁর তৃপ্তিতে ভরে উঠল। সোজা গিয়ে উঠলেন রামকৃষ্ণেব নিজের ঘবে।

সারদার জ্বরের কথা শুনে স্বামীব দুশ্চিন্তার অবধি নেই। সখেদে বার বার বলতে লাগলেন, "তুমি এতদিনে এলে! এখন কি আব আমাব সেজবাবু (ভক্ত মথুবানাথ) আছে যে তোমাব যত্ন হবে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে তার অভাবে।"

চিকিৎসাব সুবিধাব জন্য ঠাকুব সারদাকে তাঁব নিজেব ঘরে বেখে দিলেন। কয়েক দিনেব মধ্যে জ্বব ত্যাগ হলে সাবদা চলে গেলেন ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণির কাছে, নিকটস্থ নহবত ঘরে।

সারদাব অন্তব এবাব অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছে। স্বামী উন্মাদ হয়ে গিয়েছে বলে যে রটনা শুনেছিলেন তা যে একেবারেই মিথ্যে। শুধু তাই নয়, পত্নীকে ভুলে যাওয়া দূরেব কথা, তিনি যেন এবার আরো অনেক বেশী প্রেমপূর্ণ, অনেক বেশী মমতাময়। সুস্থ হযে উঠে স্বামী ও বৃদ্ধা শাশুড়ীব সেবায় সাবদা প্রাণ মন ঢেলে দিলেন।

পিতা বামচন্দ্রেব মনেব ভয কেটে গিযেছে, জামাতা উন্মাদ তো নযই, ববং অতি স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। কন্যা জামাতাকে বেখে তৃপ্ত মনে তিনি ফিরে গেলেন স্বগৃহে।

পত্নীকে স্নেহ সান্নিধ্যে বেখে বামকৃষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি বাখলেন তার মানসিক ও আত্মিক জীবন গঠনেব দিকে। গৃহকর্ম, সামাজিক রীতি-

নীতি থেকে শুরু ক'রে সাধনভজন, ধ্যানধারণা ঈশ্বরীয় কথা সব কিছুই শিক্ষা দিতেন তিনি তাঁর সহজ সরল ভাষায় ও মমত্বময় সাহচর্যে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে একদিন সারদামণিকে বললেন, "চাঁদমামা যেমন সব শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বরও সকলেরই আপনার, তাকে ডাকবার অধিকার সকলেরই আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাকো তো, তুমিও দেখা পাবে।"

শুধু উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েই রামকৃষ্ণ শান্ত হতেন না, সারদা তা ঠিক ঠিক বুঝেছেন কিনা, নিজ জীবনে ও আচার আচরণে তা প্রতিফলিত করতে পারছেন কিনা, সেদিকেও নিবদ্ধ থাকতো তাঁর সদা সজাগ দৃষ্টি।

শাশুড়ীর সেবাযত্ন ও গৃহকর্ম সব শেষ হয়ে গেলে রাত্রে সারদা স্বামীর কাছে শুতে যেতেন। আনন্দে, সহৃদয়তায়, স্বামী ভরিয়ে দিতেন তাঁর সারা অন্তর। অষ্টাদশীর দেহে মনে তখন তারুণ্যের ভরা জোয়ার, সে সময়ে যৌন-জীবনের আকাঙ্ক্ষা থাকা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সারদার শুদ্ধ সংস্কার ও সহজাত সাত্ত্বিক সংস্কার তাঁকে স্বামীর শ্রদ্ধাভক্তিময় জীবনের দিকে, তাঁর তপস্যাময় জীবনের দিকে, যেন অমোঘভাবে আকর্ষণ ক'রে নিচ্ছে। স্বামীর আত্মিক স্বরূপ আর তার দেব-ভাবটিই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। মানবীয় ভাব, যৌন আকর্ষণ, হয়ে উঠেছে গৌণ। এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

শয্যাপার্শ্বে শায়িতা পত্নীকে রামকৃষ্ণ একদিন পরীক্ষার ছলে প্রশ্ন করেন, "কি গো, সত্য ক'রে বলতো, তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসেছো?"

মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না ক'রে সারদা উত্তর দিলেন, "না, তা কেন? আমি কেন তোমায় সংসার পথে টানতে যাবো? তোমার ইষ্ট পথে সাহায্য করতেই আমি এসেছি।"

সাধনভজনহীনা, শাস্ত্রীয় শিক্ষাদীক্ষাহীনা পল্লী যুবতী সারদার

এই সহজ ও সুস্পষ্ট উত্তর থেকে বুঝা যায়, তাঁর মানস ও দেহ-গঠনে সাত্ত্বিক, পবিত্রতা এবং ত্যাগ তিতিক্ষার প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পতিকে অমন কথা বলতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ সারদামণির চরিত কথায় লিখেছেন: শ্রীমা একাদিক্রমে আট মাস ঠাকুরেব সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করিযা-ছিলেন। তখন ঠাকুরেব মন যেমন উর্ধ্বলোকে বিচরণ করিত, মাযের মনও তেমনি এই আরাধ্য দেবতাব ধ্যানেই নিমগ্ন থাকিত। সুতরাং কাহাবও মনে ভোগস্পৃহার অবকাশ ছিল না। এইভাবে দিনের পব দিন মাসেব পব মাস শ্রীমাকে অতি নিকটে থাকিতে দিযা ঠাকুব তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভোগেচ্ছা দেখিতে পান নাই।

পরবর্তীকালে ভক্তদেব কাছে সাবদামণির এই শুদ্ধম অপাপ-বিদ্ধম জীবনের মহিমা প্রকাশ কবতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হযে আমাকে আক্রমণ কবত, তাহলে আমাব সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আঁসত কিনা, কে বলতে পারে? বিয়ের পব মা জগদম্বাকে ব্যাকুল হযে আমি বলেছিলাম, 'মা আমাব পত্নীব ভেতব থেকে কামভাব একেবাবে দূর করে দে।' ওর সঙ্গে একত্রে বাস ক'রে এই কালে বুঝেছিলাম, মা সে কথা সত্যই শুনেছিলেন।"

সারদামণি এ সময়ে একদিন স্বামীর পদসম্বাহন করার সময় প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা আমায় তোমার কি বলে বোধ হয়?"

ঠাকুব বামকৃষ্ণ উত্তর দেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিযেছেন, তিনিই সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন, আব তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সত্য সত্যি আমি দেখছি।"

বামকৃষ্ণ ও সাবদার এই আত্মিক সম্পর্ক বিষযে বলতে গিযে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায লিখেছেন,

"উপনিষৎকার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন—পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান্ রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয়। স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই, পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। (বৃঃ উপনিষদ, ৫ম ব্রাঃ)

"এই সময় রামকৃষ্ণ এবং সারদামণি এক শয্যায় রাত্রি যাপন করিতেন। দেহ বোধ বিরহিত রামকৃষ্ণের প্রায় সমস্ত রাত্রি এই কালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণ যাহা বলিতেন, তাহাতে বুঝা যায় যে সারদামণি দেবীও যদি সম্পূর্ণ কামনাশূন্যা না হইতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের দেহ বুদ্ধি আসিত কি-না, কে বলিতে পারে?' পৃথিবীর নানা কার্যক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের পত্নীদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তাঁহারা উঁহাদের জীবনপথ সর্ববিধ সাংসারিক বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত না রাখিলে, উঁহারা এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন না। অনেক মহান্ লোকের পত্নী কেবল যে পতিকে সংসারের খুঁটিনাটি ও নানা ঝঞ্ঝাট্ হইতে নিষ্কৃতি দেন তা নয়, অবসাদ নৈরাশ্য ও বলহীনতার সময় তাঁহার হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকেন। আমাদের সমসাময়িক ইতিহাস রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে সারদামণির দেবীর মূর্তি এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

"বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও যখন রামকৃষ্ণের মনে একক্ষণের জন্যও দেহ-বুদ্ধি উদয় হইল না এবং যখন তিনি সারদামণি দেবীকে কখন জগন্মাতার অংশভাবে কখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোনোভাবে দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রামকৃষ্ণ আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাবিয়া ষোড়শী পূজার আয়োজন করিলেন এবং সারদামণি দেবীকে অভিষেকপূর্বক পূজা করিলেন। পূজাকালের শেষদিকে সারদামণি বাহ্যজ্ঞানরহিতা ও সমাধিস্থা হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

"ইহার পরও তিনি অহঙ্কৃতা হন নাই, তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া যায় নাই।"

সেদিন ছিল অমাবস্যা, ফলাহারিণী কালীপূজার পুণ্যময় দিন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেদিন ধুমধামের সঙ্গে পূজা হচ্ছে। এই দিনটিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর নিজ কক্ষে অনুষ্ঠান করলেন ষোড়শী পূজা বা ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা। অপাপবিদ্ধা পত্নী সারদাকে, অনাঘ্রাতা-যৌবনা পরম পবিত্রা সারদাকে ঠাকুর নির্বাচিত করলেন তাঁর ধ্যেয়া ইষ্ট-দেবীর আধাররূপে। পূজার উপচার সংগৃহীত হলে উপবিষ্ট হলেন নিজ সাধন-আসনে। স্বামী সারদানন্দ এ পূজার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র- উচ্চারণ করিলেন—'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরি, সিদ্ধি দ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।'

"অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্র সকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধি মগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত অক্ষয় সেন তাঁর রচিত পুঁথিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> পূজ্য পূজকেতে হয়ে ভাবরাজ্য তেয়াগিয়ে
> ভাবাতীতে একত্র মিলন। (পুঁ)

সারদামণির এসময়কার ভাবাবেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামী সারদানন্দ বলেছেন :

"ষোড়শীপূজার সময় মা এতই আবিষ্ট হয়েছিলেন যে কী যে হচ্ছে, তাঁর একেবারেই হুঁশ ছিল না। ঠাকুর তাঁকে কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে দিলেন, প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ে মালা রাখলেন, মা কিছুই জানতে পারেন নি। মার এত লজ্জা ছিল যে, লক্ষ্মী দিদি মাকে বলতেন, 'তোমার কাপড় খুলে ঠাকুর কাপড় পরিয়ে দিলেন এতেও তোমার হুঁশ হল না?' এইদিন তিনি প্রসাদী মাংস পর্যন্ত খেয়ে ছিলেন, অথচ কখনো তিনি মাংস খেতেন না।"

ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠান শেষ হবার পরও প্রায় ছয়মাস সারদামণি শয়ন করতেন রামকৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে। এ সময়ে স্বামীর সান্নিধ্যে তিনি আনন্দ যেমন পেতেন, তেমনি প্রতি রাতে উদ্বেগ ও আশঙ্কাও কম ভোগ করতে হতো না। স্বামীর ধ্যানাবেশ, সমাধি প্রভৃতির প্রকৃত তাৎপর্য তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয় নি। তাই এক এক সময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন সে সব দেখে।

উত্তরকালে স্ত্রী-ভক্তদের তিনি বলেছেন, "সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে তিনি থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়। কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত। সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে। ভাব সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না। একদিন তাঁর আর সমাধি ভাঙে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়। তারপর এরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন— এই রকম ভাব দেখলে এই রকম শোনাবে— এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শোনাবে। তখন আর তত ভয় হতো না, ও সব শুনাইলেই তাঁর আবার হুঁশ হতো। তারপর অনেকদিন এই রকমে গেলেও, কখন তাঁর কি ভাবসমাধি হবে বলে

সারা রাত্তির জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি না—একথা একদিন জানতে পেরে নহবতে আলাদা শুতে বললেন।”[১]

এর পর সারদামণি পিত্রালয়ে গিয়ে অবস্থান করেন। অতঃপর কয়েক বার তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, স্বামীর পাশে থেকে তাঁর সেবার বহু আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

একবার দেশ থেকে সারদা দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাত্রা করেছেন। গঙ্গাস্নানের জন্য একদল বর্ষীয়সী মহিলা ওদিকে যাচ্ছিলেন, সেই সুযোগে তাঁদেরই সঙ্গ নিলেন তিনি। আরামবাগ অবধি সারাটা পথ ভালভাবেই হেঁটে এসেছেন, কিন্তু তারপরই পদযুগল ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

সামনেই কুখ্যাত তেলোভেলের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ডাকাতদের একটি কালীস্থান ছাড়া আর কোন লোকালয় নেই। সঙ্গিনীরা স্থির করলেন সন্ধ্যার আগেই এই প্রান্তর পেরিয়ে যেতে হবে, নইলে সবাইকে পড়তে হবে ডাকাতের হাতে। টাকাকড়ি যা আছে তাতো যাবেই, প্রাণ যাবারও আশঙ্কা রয়েছে। সবাই তাই ছুটে চললেন দ্রুতপদে।

সারদামণির পক্ষে তাড়াতাড়ি পথ চলা সম্ভব হল না, কেবলি পিছিয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। সঙ্গের লোকেরা যখন প্রান্তর অতিক্রম ক'রে তারকেশ্বরের চটিতে আশ্রয় নিয়েছে তখনো একলাটি তেলোভেলের মাঠ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন শ্রান্ত দেহে, শ্লথ চরণে।

মাঠের মাঝখানে পৌঁছুতেই লক্ষ্য করলেন কৃষ্ণকায়, দীর্ঘ এক বলশালী পুরুষ হনহন ক'রে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

নিকটে এসে বাঁজখাই আওয়াজে লোকটি প্রশ্ন করে, “কে তুমি? যাচ্ছো কোথায়?”

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দুই হাতে রূপোর বালা, চোখ দুটি

১ মায়ের কথা ১ম খণ্ড

তীক্ষ্ণ, রক্তাভ। পাকানো বাঁশের লম্বা লাঠিটি নিয়ে সামনে দাঁড়াতেই সারদা কোমল কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমায় পেছনে রেখে চলে গিয়েছে, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে সারদা চট ক'রে খুলে ফেললেন তাঁর পায়ের মল দুগাছি, ঐ দুটি তুলে দিলেন ভীমকায় আগন্তুকের হাতে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সারদার বুঝতে ভুল হয় নি যে, লোকটি ডাকাতিতে অভ্যস্ত এবং এই জনশূন্য প্রান্তরে তার ওপর নির্ভর না ক'রে উপায় নেই। বাঁচতে হলে তার হৃদয় স্পর্শ করতে হবে।

লোকটি জাতিতে বাগদি, পাইকের কাজ করে, দুঃসাহসিক ডাকাতিতেও দক্ষতা আছে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে, নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে সে সারদার মুখের দিকে। মুহূর্ত মধ্যে তার মুখভাব কোমল হয়ে উঠল, বলল, "বাছা, তোমার কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে, সে পেছনে পড়ে গিয়েছে। এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হল ডাকাতের স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে সে চলেছে তারকেশ্বরে। সারদা তার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আত্মীয়তার সুরে মধুর কণ্ঠে বললেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। কি বিপদেই আজ পড়েছিলাম, মা। ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসময়ে এসে পড়েছিলে।"

আগন্তুকা নারী ও তার স্বামী উভয়েই চুপচাপ। বিস্ময়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে সারদার দিকে তারা তাকিয়ে আছে। চমক ভাঙলে স্ত্রীলোকটি স্নেহভরে সারদাকে আশ্বাস দেয়, "ভয় নেই মা সারদা, আমরা তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পৌঁছে দেবো দক্ষিণেশ্বরে।"

পথে সারদার আদরযত্নের সীমা নেই, বাগদি পাইক ও তার স্ত্রী তাকে দেখছে যেন ঠিক নিজেদেরই কন্যার মতো। প্রান্তর পেরিয়েই তেলোভেলো গ্রাম। সেখানকার এক ক্ষুদ্র দোকানে সে-রাত্রির মতো

তারা আশ্রয় নেয়, মুড়ি মুড়কি কিনে সযত্নে সাবদাকে ভোজন করায়। বাগদিনী মায়েব স্নেহ মমতা যেন উথলে পড়ছে। মেজের মাটিতে নিজের আঁচল বিছিয়ে দিয়ে বাৎসল্যভরে বলে, "মা সারদা, পথে বড কষ্ট হযেছে তোব, এবাব তুই ঘুমিয়ে পড়।"

পাশে শযন ক'রে বাগদিনী তাকে ঘুম পাড়ায়, আর বাগদি পাইক তার দীর্ঘ লাঠিটি হাতে নিযে সারারাত দুয়াব আগলে বসে থাকে, তাদের স্নেহেব কন্যা সাবদার যেন কোনো অনিষ্ট না হয, বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটে।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠেই আবাব শুরু হয় তাদের পথ চলা। সারদার জন্য খাবারেব ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যস্তসমস্ত হযে ওঠে বাগদিনী। পথেব দুধারে ক্ষেতে অজস্র কডাইশুঁটি ফলে বয়েছে, একরাশ তুলে এনে সাবদার কোঁচড়ে ফেলে দেয়। সারদাও ছোট মেযেটিব মতো পবম আনন্দে পথ চলতে থাকেন, মাঝে মাঝে মুখে কডাইশুঁটি পুবেন।

কন্যাব পথশ্রম লাঘবেব জন্য বাগদিনীব উৎসাহেব অবধি নেই। স্বামীকে বলে, "ওগো, তুমি না এতকাল কৃষ্ণযাত্রায সাজতে। গান-টান সব কি ভুলে গিয়েছো? দু চাবটে গান কবো, আমার সারদাকে শোনাও। তাহলে পথের কষ্ট ও ভুলে থাকবে।"

পত্নীর আদেশে দরাজ কণ্ঠে গান ধরতে হয বাগদিকে। মনের আনন্দে সবাই এগিযে চলেন তাবকেশ্ববেব দিকে।

তারকেশ্ববে পৌছেই, হৈচৈ শুরু ক'বে দেয বাগদিনী মাতা। স্বামীকে বলে, "ওগো, আমাব সাবদা কাল ভালো খেতে পায নি, নিশ্চয ওর খিদে পেযেছে খুব। তুমি তাড়াতাড়ি বাবা তাবকেশ্ববেব পুজো সেবে এসে, বাজার ক'রে আনো, মেযেকে যত্ন কবে আজ আমি খাওযাবো।"

কিছুক্ষণ পবেই সহযাত্রীদেব দেখা পেয়ে যান সারদা। তাদের সঙ্গে মিলে পুজো নিবেদন কবেন, তারপব ভোজনাদি শেষ ক'বে তৈবী হলেন দক্ষিণেশ্ববে যাবার জন্য।

এবার বাগদি পিতা-মাতার কাছে বিদায় নেবার পালা। দুজনেরই চোখে ঝরে আসন্ন বিচ্ছেদের অশ্রুধারা। বাগদিনী পাশের ক্ষেত থেকে প্রচুর কড়াইশুঁটি তুলে নিয়ে এল। সারদার অঞ্চলে তা বেঁধে দিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "মা, পথ চলতে চলতে খিদে পাবে, এছুটো খেয়ে নিস্।"

যাত্রিদল এবার এগিয়ে চলেছে। বাগদি পাইক ও তার স্ত্রী ধরেছে ভিন্ন চলার পথ। সারা মনপ্রাণ কিন্তু তাদের পড়ে রয়েছে পথে-পাওয়া কন্যা সারদার ওপর। যেতে যেতে বরাবরই মুখ ফিরিয়ে সারদার দিকে তারা তাকাচ্ছে, আর শোকবিহ্বল হয়ে ক্রন্দন করছে। এ এক অপূর্ব দৃশ্য।

তেলোভেলের বাগদি পাইক বা ডাকাত-বাবা সম্পর্কে উত্তরকালে সারদামণি সহাস্যে মন্তব্য করেছিলেন, "তা, আমার বাগদিবাবা যে আগে ডাকাতি করে নি, এমন কথা বলা যায় না।"

সারদামণির মধ্যে বাগদি ও তার স্ত্রী এমন কি আকর্ষণের বস্তু দর্শন করেছিল? কেনই বা উদ্‌গত হয়েছিল বাৎসল্য রসের এই প্রবাহ? উত্তরকালে ভক্ত শিষ্যরা সারদামণিকে একবার এ প্রশ্নটি করেছিলেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন:

'আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমরা আমায় এত স্নেহ কেন কর গো?'

উত্তরে তারা বলেছিল, 'মা, তুমিতো সাধারণ মানুষ নও। আমরা যে প্রথম দর্শনেই তোমায় কালীরূপে দেখেছি।'

আমি বললুম, 'সে কি গো, এ কি বলছো? এটা তোমরা কি দেখলে?'

তারা বললে, 'না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম, আর দুজনেই দেখলুম। আমরা পাপী বলে তুমি রূপ গোপন করছো।'

আমি বললাম, 'কি জানি বাপু, আমি তো কিছু জানি নি।'

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে সারদামণি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে তাঁর এই বাগদি মা বাবার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে

ঐ দম্পতি স্বাভাবিক প্রাণের টানে দক্ষিণেশ্ববে মাঝে মাঝে উপস্থিত হতো। প্রাণপুত্তলি সাবদার জন্য মিষ্টান্নাদি তাবা নিয়ে আসতো। ঠাকুব বামকৃষ্ণও তাঁদের মন ভরিয়ে দিতেন মিষ্ট ব্যবহাবে, সম্ভ্রম দেখাতেন যেন তিনি তাদেব এক জামাতা বাবাজী।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে সারদামণি প্রাযই ঘবেব বাব হতেন না, জীবন যাপন কবতেন অসূর্যম্পশ্যাব মতো। মন্দিবেব খাজাঞ্চী বলতেন, "তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনও দেখতে পাই নি।"

সাবদামণি এসময়কাব স্মৃতিচাবণ ক'বে উত্তবকালে বলতেন:

কখনো কখনো দু'মাসেও হয়তো একদিন ঠাকুবের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন তুই এমন কি ভাগ্য কবেছিস যে বোজ রোজ ওঁব দর্শন পাবি?'

দাঁড়িযে দাঁড়িযে দরমার বেড়ার ফাঁক দিযে কীর্তনেব আখব শুনতুম —পাযে বাত ধবে গেল। তিনি বলতেন, "বুনো পাখি খাঁচায় বাতদিন থাকলে বেতে যায, মাঝে মাঝে পাড়ায বেড়াতে যাবে।"

বাত চাবটায নাইতুম। দিনেব বেলায বৈকালে সিঁড়িতে একটু বোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায অনেক চুল ছিল। নহবতেব নিচের একটুখানি ঘব, তা আবাব জিনিসপত্রে ভরা। রাত্রে শুয়েচি, মাথাব উপব মাছের হাঁড়ি কলকল কবছে—ঠাকুরের জন্যে শিঙ্গি মাছেব ঝোল হত কিনা। তবু আব কোনো কষ্ট জানি নি, কেবল যা শৌচে যাবাব কষ্ট। দিনেব বেলায দবকাব হলে রাত্রে যেতে পারতুম—গঙ্গার ধাবে, অন্ধকাবে।

তখন ঠাকুব বামকৃষ্ণেব নিকট কত ভক্ত ও সাধকেরা আসতেন, নাচ, গান, কীর্তন, ভাব, সমাধি দিনরাতই কত দেখা যেতো। সাবদামণি আড়ালে থেকে দেখতেন, শুনতেন আর ভাবতেন, 'আহা আমি যদি ভক্তদেব মতো একজন হতুম তো বেশ হতো, ঠাকুবেব কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম।'

মহাসাধকরূপে স্বামীর এই রূপান্তব, আব তাঁর এই লীলা-

বিলাসের স্মৃতিতে ভরপুর হয়ে থাকতো সারদামণির দেহ মন প্রাণ। উত্তরকালে বার বার বলতেন, "কি আনন্দেই ছিলুম। কত রকমের লোকই তাঁর কাছে তখন আসত। দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাট বাজার বসে যেত।"

সারদামণি যেমন ছিলেন সেবাপরায়ণা ও পতিগতপ্রাণা, তেমনি ঠাকুর রামকৃষ্ণও স্ত্রীর আত্মিক, সাংসারিক, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জাগতিক মান সম্ভ্রম সম্বন্ধে কোনোদিনই উদাসীন ছিলেন না। মেয়েরা অলংকার পরতে ভালবাসেন। এই বিষয়েও পত্নীর মনে যাতে কোনো দুঃখ না থাকে সেজন্য ঠাকুর হৃদয়কে দিয়ে তাঁকে অলংকার গড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সারদাদেবী বলতেন, "তখন তাঁর অসুখ, তবুও আমার জন্য অত টাকা দিয়ে—তাবিজ গড়তে দেওয়ালেন। ঠাট্টা ক'রে হৃদয়কে বলতেন, 'ওরে, আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ।' এদিকে নিজে তো টাকা ছুঁতে পারতেন না। পঞ্চবটীতে সীতাকে দেখেছিলেন—হাতে ডায়মণ্ডকাটা বালা। সীতার বালা দৃষ্টে আমাকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন।"[১]

এ ছাড়া, আরও প্রচুর অলংকার সারদামণির ছিল, তার ভেতরে পড়ে ভক্ত জমিদার মথুরানাথের গড়িয়ে দেওয়া গোছা-গোছা ভারী সোনার চুড়ি।

সেবিকা যোগীন-মা বলতেন, "মা সে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে সীতে ঠাকুরণের মতো থাকতেন। পরনে কস্তাপেড়ে শাড়ী, সিঁথেয় সিঁদুর, কালো ভরাট মাথায় চুল প্রায় পা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। গলায় সোনার কণ্ঠহার, নাকে মস্ত বড় নথ, কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি—যে চুড়ি মথুরবাবু ঠাকুরকে মধুর ভাব সাধনের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে দর্শন করে, তাঁর কাছে থেকে আমাদের বড় আনন্দ হত।"[২]

---

১ মায়ের কথা, ২য় খণ্ড, উদ্বোধন

২ শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি . স্বামী নির্লেপানন্দ

বিয়ের রাতে বালিকা স্ত্রী সারদামণি ঘুমিয়ে পড়লে রামকৃষ্ণ তার অলংকার খুলে নিয়েছিলেন। যাদের কাছ থেকে ধার করে এসব এনেছিলেন তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরদিন ভোরে উঠেই সারদা কাঁদতে থাকেন, 'আমার গয়না সব কোথায় গেল' এই ব'লে।

রামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রমণি তখন বউকে আশ্বাস দেন, তাঁর পুত্র ভবিষ্যতে বধূমাতাকে আরো অনেক গহনাপত্র দেবে। রামকৃষ্ণ আক্ষরিকভাবে মায়ের প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন, সেই সঙ্গে পত্নীকে আরো উপহার দিয়েছিলেন বহুবন্দিত মহাপুরুষ, জীবনের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রমের অমূল্য অলংকার।

এইসব গহনা পরা কিন্তু বেশী দিন সম্ভব হয় নি, দৈবচক্রে প্রায় আভরণহীনা হতে হল সারদামণিকে। একদিন সেবিকা গোপাল মা সারদামণিকে বললেন, "মা, মনোমোহনের মা বলছিল—ঠাকুর অত বড় ত্যাগী আর মা এইসব মাকড়ী-টাকড়ী এত গয়না পরেন, এটা ভাল দেখায় কি ?"

পরদিন সকালেই দেখা গেল সারদামণি শুধু দু'হাতে সোনার বালা দুগাছি রেখে আর সব গহনা খুলে ফেলেছেন। কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "মা এ কি ? এমন অলংকারহীনা হতে কে বললে তোমায় ?" সারদামণি উত্তর দিলেন, "গোপাল বললে—তাই এগুলো খুলে ফেলেছি।"

অনেক বুঝানোর পর মাকড়ী আর সামান্য দুই-একটি গহনা পরতে তিনি রাজী হলেন। সেদিন সেই যে গহনা খোলা হল, এর পর ঘটনাচক্রে আর তা পরা হল না। কারণ তার পরই ঠাকুরের সংকটাপন্ন অসুখের ফলে সব হয়ে গেল ওলোটপালোট।

জীবন্মুক্ত মহাসাধিকা ছিলেন, সারদামণি, ছিলেন ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত প্রতিমা। যৌবনে ও উত্তর জীবনে কোনোদিন ভোগবিলাসের বিন্দুমাত্র কামনা তাঁর মনে স্থান পায় নি, জাগতিক সর্ব লোভ মোহের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি চিরদিন। পত্নীর শুভ বুদ্ধির ও নির্লোভতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে স্বয়ং রামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন :

মাড়োয়াবী ভক্ত, লছমীনারাষণ যখন দশ হাজাব টাকা দিতে চাইলে তখন আমার মাথায যেন কবাত বসিযে দিল। মা ভবতারিণীকে বললাম, 'মা, এতদিন পরে আবার আমায প্রলোভন দেখাতে এলি ?' সেই সময় ওব মন বুঝবার জন্য ডাকিযে বললাম,— 'ওগো, ওতো এই টাকা দিতে চাচ্ছে, আমি নিতে পারবো না ব'লে তোমার নামে দিতে চাচ্ছে। তুমি এটা নিযে নাওনা কেন ? কি বল ?'

শুনেই ও বললো, 'তা কি ক'বে হবে ? এ টাকা নেওযা হবে না। আমি নিলে ঐ টাকা তোমারই নেওয়া হবে। কাবণ, আমি তা ঘরে বাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য দবকাবী কাজে ব্যয় না ক'বে থাকতে পারবো না। ফলে এটাকা তোমাবই গ্রহণ কবা হবে। তোমায় লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা কবে তোমাব ত্যাগেব জন্য। কাজেই ঐ টাকা কোনো মতেই নেওযা যাবে না।' ওর এই কথা শুনে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

জীবনেব প্রথম পাদ থেকে দারিদ্র্যেব কশাঘাতে যিনি জর্জরিত, অর্থাভাবে দুই-তিন দিনের পথ পাযে হেঁটে যাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে হত, অর্থ সম্পর্কে সেই দবিদ্র গ্রাম্য তরুণী সারদামণিব এই নিস্পৃহতা সত্যই বড বিস্ময়কব।

সাবদামণিব অন্যতমা ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ও সেবিকা ছিলেন যোগেন-মা। মাযেব দিনচর্যা, ভাবাবেশ ও আত্মিক অনুভূতি সম্পর্কে অনেক কিছু তিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন। তিনি বলেছেন [১] :

আমাব সহিত মাযেব পবিচয হইবার কিছুদিন পবে একদিন মা আমাকে বলিলেন, 'ওকে বোলো যাতে আমাব একটু ভাবটাব হয, লোকজনেব জন্য ওকে একথা বলবাব আমাব সুযোগ হয়ে উঠছে না।'

আমি ভাবিলাম হবেওবা, মা যখন অনুরোধ কবিতেছেন তখন ঠাকুবকে ঐ কথা বলব। পবদিন সকালে ঠাকুব একা তক্তপোশে

১ মাযেব কথা, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন

বসিয়া আছেন দেখিয়া আমি প্রণাম করিয়া তাঁহাকে মায়ের কথা বলিলাম। তিনি ঐ কথা শুনিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তিনি যখন ঐরূপ গম্ভীর হইয়া থাকিতেন তখন কথা বলিবার কাহারও সাহস হইত না। তাই আমি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

নহবতে আসিয়া দেখিলাম, মা পূজা করিতেছেন। দরজা একটু খুলিয়া দেখি মা হাসিতেছেন। এই হাসিতেছেন আবার একটু পরেই কাঁদিতেছেন। দুই চক্ষু দিয়া ধারার বিরাম নাই। কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া স্থির হইয়া গেলেন—একেবারে সমাধিস্থা।

আমি উহা দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম, অনেকক্ষণ পর পুনরায় যাইতে মা বলিলেন, '(ঠাকুরের কাছ থেকে) এই এলে ?'

তখন আমি বলিলাম, 'তবে, মা, তোমার না কি ভাব হয় না ?' মা তখন লজ্জা পাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

ঐ ঘটনার পর আমি দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও রাত্রিতে মায়ের কাছে থাকিতাম। আমি আলাদা শুইতে চাইলে মা কিন্তু কিছুতেই শুনিতেন না, আমায় কাছে টানিয়া লইয়া শুইতেন। একদিন রাত্রিতে কে বাঁশী বাজাইতেছিল, বাঁশির স্বরে মায়ের ভাব হইল, থাকিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি সঙ্কোচে বিছানার এক কোণে বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম—আমি সংসারী মানুষ, ওকে এই সময় ছোঁবো না। অনেকক্ষণ পরে মায়ের ভাব উপশম হইল।

মা বলরামবাবুর বাড়িতে ছাতে বসিয়া একদিন ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থা হইয়াছিলেন।

হুঁশ আসিতে বলিয়াছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমায় কত আদরযত্ন করছে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে! ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে। সে যে কি আনন্দ বলতে পারিনে। একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি—কি

ক'রে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতর ঢুকবো। ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম এবং দেহে হুঁশ এল।"[১]

ধ্যানাবেশ ধ্যান ও সমাধির নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা এসময়ে সারদামণির জীবনে বার বার এসে উপস্থিত হচ্ছে। আর পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় একের পর এক উন্মোচিত হচ্ছে ভাবলোক এবং সূক্ষ্ম চৈতন্যময় রাজ্যে এক একটি আবরণ। সঙ্গিনী যোগেন-মার বিবরণ থেকে আরও তথ্য আমরা পাই:

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে একদিন সন্ধ্যার পর মা, আমি ও গোলাপ দিদি ছাতে পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। আমার ধ্যান শেষ হইলে দেখি, মা তখনও একভাবে বসিয়া আছেন—স্পন্দনহীন, সমাধিস্থা। অনেকক্ষণ পরে হুঁশ আসিলে মা বলিতে লাগিলেন, "ও যোগেন, আমার হাত কই—পা কই?" আমরা মায়ের হাত ও পা টিপিয়া দেখাইতে লাগিলাম এই যে পা—এই যে হাত, তবুও দেহটা যে রহিয়াছে মা অনেকক্ষণ পর্যন্ত উহা বুঝিতে পারেন নাই।

বৃন্দাবনে কালীবাবুর কুঞ্জেও একদিন সকালে ধ্যান করিতে করিতে মায়ের সমাধি হইল। সমাধি কিছুতেই আর ভাঙে না। আমি অনেকক্ষণ নাম শুনাইলাম, তাহাতেও সমাধি ভাঙিল না। শেষে যোগেন স্বামী আসিয়া নাম শুনাইবার পর সমাধির একটু উপশম হইলে ঠাকুর সমাধি ভঙ্গের সময় যেরূপ বলিতেন, মা সেই রূপেই বলিলেন, "খাবো।"

কিন্তু খাবার জল ও পান তাঁহার সম্মুখে দেওয়া হইলে ঠাকুর ভাবাবেশে যেরূপে খাইতেন, মা সেইরূপে ঐ সকল একটু একটু খাইলেন। পানটি পর্যন্ত ঠাকুর যেভাবে সরু দিকটা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া খাইতেন, মাও ঠিক সেই ভাবে খাইলেন। তখন তাঁহার ভাবভঙ্গি খাওয়া-দাওয়া সবই হুবহু ঠাকুরের মতো হইয়াছিল।

১ মায়ের কথা, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন

আমবা দেখিয়া অবাক হইযা গেলাম। ভাব সম্পূর্ণ উপশম হইবাব পর মা বলিযাছিলেন যে, তাঁহাব উপব ঐ সময ঠাকুবের আবেশ হইযাছিল। যোগেন স্বামী মাযেব ঐরূপ ভাবাবস্থাব সময় কযেকটি প্রশ্ন কবিযা ঠাকুব যেরূপ উত্তব দিতেন ঠিক সেইরূপ উত্তব পাইয়াছিলেন।[১]

সাবদামণিব সাধনজীবন সম্পর্কে ঠাকুব বামকৃষ্ণেব দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। পত্নীব আত্মিক উন্নতিব প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিব ওপব নিবদ্ধ থাকতো তাঁব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অপাব আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিযে সতত কবতেন তাঁব পবিচালনা।

ব্রহ্মচাবী অক্ষযচৈতন্য তাঁব চবিতকথায় সাবদামণিব লৌকিক গুরু ও সাধনমন্ত্র সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ কবেছেন। তিনি লিখেছেন

শ্রীশ্রীমা পূর্ণানন্দ নামে কোনো সন্ন্যাসীব কাছে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ কবেন। পবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবও তাঁহাব জিহ্বায একটি মন্ত্র লিখিযা দেন। শুনিযাছি, ঠাকুবেব যেমন ইষ্টদেবী ছিলেন কালী, তেমনি মাব ইষ্টদেবী ছিলেন জগদ্ধাত্রী। ঠাকুব যে সকল দেবদেবীব আবাধনা কবিযাছিলেন সেই সকল দেবদেবীব মন্ত্রও মাকে শিখাইয়া দেন এবং মা ঐ সকল মন্ত্রেও সাধনা কবেন। আধ্যাত্মিক বাজ্যেব খুঁটিনাটি ব্যাপাব ঠাকুব নানাভাবে হৃদযঙ্গম কবাইয়া দিতেন; মাকে তিনি কুল-কুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র ইত্যাদিও কাগজে আঁকিযা দিয়াছিলেন।

মন্ত্রেব জপ পুরশ্চবণ শ্রীশ্রীমা যতদূব কবিযাছিলেন সেই সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দক্ষিণেশ্বরে এক সমযে লক্ষজপ সম্পূর্ণ না কবিযা তিনি জলগ্রহণ কবিতেন না। শেষ বযসেও জপ ধ্যানে তাঁহাব অদ্ভুত নিযমনিষ্ঠা দেখা গিযেছে।

সেবক হৃদয মন্দিব থেকে চলে যাবাব পব থেকে সাবদামণিই

১ মাযেব কথা, ১ম খণ্ড উদ্বোধন

গ্রহণ করেন ঠাকুরের সেবায় অধিকাংশ দায়িত্ব। তাঁর প্রাণঢালা সেবায় ঠাকুরের শরীরের উন্নতি হওয়ায় ঠাকুর এখন থেকে প্রধানত তাঁর ওপরই নির্ভর করতেন।

গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, "কোন কারণে শ্রীমা অন্যত্র গেলে বালকস্বভাব ঠাকুর আপনাকে বিপন্ন মনে করিতেন এবং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনাইতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। দেহবুদ্ধিহীন যুগাবতারের এই প্রকার লীলার তাৎপর্য মানব-বুদ্ধির অগম্য হইলেও শ্রীমায়ের চরিত্রানুধ্যানে অগ্রসর হইয়া আমাদের সহজেই মনে হয় যে, তাঁহার পতিসেবা সফল হইয়াছিল—সদা সমাধিমগ্ন মহামানবও সে অনুপম সেবার মর্যাদা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীমা নারায়ণের পদপ্রান্তে উপবিষ্টা লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদসংবাহন করিতেন। স্নানের পূর্বে তাঁহার অঙ্গে তৈল মর্দন করিতেন এবং দেহের অবস্থা বুঝিয়া রুচিকর ও পুষ্টিকর আহার্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন। ফলত আপনার সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া তিনি সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিলেন। এই নিতান্ত তদেক-শরণ্য দেবীকে ভুলিয়া থাকা সংসার সম্পর্কশূন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষেও বোধহয় সম্ভব ছিল না।"

ভক্তপ্রবর ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য সারদাদেবীর সাধনার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :

ঠাকুরের সাধনা উদ্দামস্রোতা জাহ্নবীর মতো দুই কূল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছিল, তাহার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ সমীপবর্তী লোকেরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু মার সাধনা অন্তঃস্রোতা ফল্গুর মতো নিঃশব্দে প্রবহমানা—লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিতা। ঠাকুরের মতো মাকে প্রত্যেক ধর্মের সততা সাধনা দ্বারা প্রমাণিত করিতে হয় নাই, পূর্ব হইতে প্রমাণিত বস্তুকে সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া তিনি সেই সেই ভাবকে সমধিক মহিমান্বিত করিয়াছেন মাত্র। ঠাকুরের সাধনা সমস্ত জগৎ ভুলিয়া এক ভগবান্‌কে বিষয়ীভূত করিয়াছিল, কিন্তু মার সাধনা অন্য সমস্ত ভুলিলেও ঠাকুরের সেবা ভুলিতে পারে নাই, বরং উহাকে

প্রাথমিক অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার সাধনা দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ ঠাকুরই ছিলেন তাঁহার সর্বসাধনার ফলরূপী। তিনি যেন ফলকে পুরোবর্তী রাখিয়াই সমুদয় সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। পরবর্তীকালে কত ভক্তকে মা বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরই সব—তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি'। ঠাকুরের পূজাবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু শিষ্যকে বলিয়াছেন, 'তিনি সর্বদেবময়, তিনি সর্ববীজময়, ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই তাঁর পূজা হয়ে যাবে।'

সারদামণি ছিলেন প্রায়-নিরক্ষরা এক গ্রাম্য মেয়ে। দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে বাস করার আগে উচ্চতর সাধনা এবং সাধনজাত দিব্য অনুভূতি ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁহার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু এখানে আসার পর রামকৃষ্ণের পরিমণ্ডলে বাস ক'রে সাধকদের উচ্চ ভাবাবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা তাঁর এসে গিয়েছিল। তাছাড়া, এই সঙ্গে তাঁর সহজাত সাত্ত্বিক সংস্কার ও প্রজ্ঞা তাঁর মানস-গঠন ও ধৃতিকে সাহায্য করেছিল।

সেদিন ভবতারিণীর মন্দির থেকে নিজ কক্ষে ফিরে আসছেন রামকৃষ্ণ। এতক্ষণ গর্ভমন্দিরে বসে জগজ্জননীর ধ্যানে আবিষ্ট হয়েছেন, ইষ্টমূর্তির দর্শনে হয়েছেন আত্মহারা। দিব্য আনন্দে আর মহাভাবের জোয়ারে চৈতন্যের গভীরে ভেসে চলেছেন। এমনি অর্ধবাহ্য অবস্থায়, মাতালের মতো টলতে টলতে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ, পা দুটি ঘন ঘন টলছে, শ্লথ গতিতে এগিয়ে সারদামণির দেহে ঠেলা দিয়ে বলেন, "ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি? এমন হচ্ছে কেন বলতো?"

"না, না, মদ খাবে কেন তুমি, সে কি কথা?" দৃঢ় কণ্ঠে বলেন সারদামণি।

"তবে কেন টলছি? কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক মতো সব কইতে পাচ্ছিনে। আমি তবে মাতাল?"

"না, না, তুমি কেন মাতাল হবে? তুমি মা-কালীব ভাবামৃত খেয়েছো।"

একথায় আশ্বস্ত হলেন বামকৃষ্ণ। "ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো তুমি," বলে বার বাব আনন্দ প্রকাশ কবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিবে এলেন স্বাভাবিক অবস্থায়। ঠাকুবেব ভাবাবেশের গতি প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেকটা পবিচিত হয়ে উঠেছেন সারদামণি।

ভবিষ্যতের মহাসাধিকা, রামকৃষ্ণমণ্ডলীব মাতৃরূপিণী কেন্দ্রশক্তি, সারদামণিব প্রস্তুতি ও অভ্যুদযের জন্য বামকৃষ্ণ এখন থেকেই সক্রিয হয়েছেন। সারদামণির ভাবমূর্তিটি ধীবে ধীরে তিনি স্থাপন ক'রে দিচ্ছেন কযেকটি অন্তবঙ্গ ভক্ত ও আর্তভক্তের হৃদয়ে।

কালীপদ ঘোষ লোকটি ছিলেন অত্যন্ত মদ্যপ এবং দুশ্চরিত্র, তাঁব স্ত্রী একদিন বিপন্ন হযে শ্রীবামকৃষ্ণের চরণতলে এসে ধরনা দিলেন। বললেন, "ঠাকুব, আমার স্বামীব উচ্ছৃঙ্খলতায় সংসাব বিষময় হযে উঠেছে, আপনাকে এর বিহিত কবতে হবে, কৃপা ক'বে ওষুধ অথবা জড়ি-বুটি একটা কিছু দিন।"

ঠাকুবেব সাত্ত্বিকী, ত্যাগপূত, ভাবের পবিচয় মহিলাটিব জানা নেই। ভেবেছেন, সিদ্ধাই এবং তাবিজ কবজ একটা কিছু পেলে স্বামীকে বিপদ থেকে ফেরানো যাবে। ঠাকুব এক বিচিত্র অভিনয় কবলেন সেদিন। বললেন, "ওগো, আমি তো এসব কিছু কবিনে। যদি তোমার স্বামীকে সুপথে আনতে চাও, তবে শবণ নাও ঐ নহবতে যিনি আছেন তাঁর কাছে। তাঁর এ সব মন্ত্র-ঔষধি অনেক জানা আছে, আমার চাইতে ওঁর শক্তি বেশী।"

অন্তবালচারিণী সারদামণিকে দেখিয়ে দিযে ঠাকুর মজা দেখতে লাগলেন।

নারী ভক্তটি তখনি সাবদামণির কাছে গিয়ে উপস্থিত। সজল-নযনে নিবেদন কবলেন তাঁব সংকটের কথা। পবে বললেন, "মা, তুমি ছাড়া আব গতি নেই। ঠাকুর বললেন, তোমাব কাছেই বযেছে আমাব স্বামীকে ভালো করার মন্ত্র ও ওষুধ।"

সারদামণি বুঝলেন, এ ঠাকুবের বঙ্গ-বহস্য। বললেন, "সেকিগো আমি যে ওঁব মুখের দিকে চেযে বেঁচে আছি। আমার কি কৃপা কবাব শক্তি আছে? অতি সাধাবণ মানুষ আমি। তোমায় উনি খেলাব ছলে একথা বলেছেন, মজা দেখছেন।"

মহিলাটি গিযে আবাব উপস্থিত হয ঠাকুবেব সকাশে। ঠাকুবও তাঁব খুঁটি ছাড়বেন না। বললেন, "বাছা, ওঁব কাছে গিযেই কেঁদে অমোঘ ওষুধ পাবে, স্বামী তোমাব শুধ্‌বে যাবে।"

অনন্যোপায মহিলাটি আবাব যান নহবত ঘবে, কান্নায ফেটে পড়েন। এবাব সাবদামণিব হৃদয় বিগলিত হয, ওষুধও ঠিক মিলে যায। মা ভবতাবিণীর প্রসাদী বেলপাতা হাতে নিযে, আশ্বাসভবা কণ্ঠে তিনি বলেন, "বাছা এই নিয়ে যাও। এতেই মাযের কৃপায তোমাব কাজ হবে।"

পূর্ণ বিশ্বাসেব সঙ্গে এই বিল্বপত্র তিনি ঘরে নিযে যান এবং যথা সমযে সুফলও ফলে যায। পাষণ্ড কালী ঘোষ বা দানাকালীব জীবনে আসে বিবাট পবিবর্তন। উত্তবকালে গণ্য হন তিনি শ্রীবামকৃষ্ণেব এক ভক্তরূপে।

সাবদামণিব ভবিষ্যৎ জীবনেব ছবিটি বামকৃষ্ণেব মানসমুকুরে পবিস্ফুট হযে উঠেছে। সঙ্ঘজননী রূপে, বহু ভক্তেব আশ্রযদাত্রীরূপে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি গ্রহণ কববেন, তাও পবিজ্ঞাত হয়েছেন রামকৃষ্ণ। তাই বুঝি মাঝে মাঝে নানা প্রসঙ্গক্রমে সাবদামণিকে এ সম্পর্কে সচেতন ক'বে তোলেন।

ঠাকুব তখন কাশীপুবে। মাবাত্মক ক্যান্সাব বোগে তিনি শয্যাশায়ী। ভক্ত শিষ্যেবা সবাই মিলে তাঁব চিকিৎসাব ব্যবস্থা করছেন। ত্যাগী ভক্তেবা আপ্রাণ চেষ্টা কবছেন তাঁব সেবা পরিচর্যা

আর এই সেবাকর্মের মধ্যমণি হয়ে রয়েছেন অন্তরালচারিণী সারদামণি।

একদিন রোগশয্যায় শুয়ে ঠাকুর একদৃষ্টে সারদামণির দিকে তাকিয়ে আছেন। সারদা বললেন, "কি বলবে, বলই না।"

ঠাকুরের ক্ষীণ কণ্ঠে বেজে উঠল অনুযোগের সুর, "হাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না?" নিজের দেহটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন, "এই সব করবে?"

সারদা ভাবলেন, তিনি অসহায়া নারী—মানুষকে উদ্ধার করার মতো, বিরাট ঐশ্বরীয় কর্ম উদ্‌যাপনের মতো, সামর্থ্য তাঁর কই? উত্তর দিলেন, "আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?"

"না, না, তোমায় অনেক কিছু করতে হবে।" দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন রামকৃষ্ণ।

আর একদিনের কথা। ঠাকুরের জন্য রোগ-পথ্য প্রস্তুত ক'রে খাবারের বাটিটি হাতে নিয়ে সারদামণি এসেছেন তাঁর শয্যার পাশে। ঠাকুর তখন ভাবের ঘোরে রয়েছেন, কোন্ সুদূর ভাবলোকের মহাকাশে মন তাঁর উধাও হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ সে ভাবাবস্থা টুটে গেল, সারদামণির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, বেদনার্ত হৃদয়ে বললেন, "ত্থাখো, কলকাতায় লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল্‌বিল্ করছে। তুমি কিন্তু তাদের একটু দেখো।"

বিস্ময় ও অনুযোগ ভরা স্বরে সারদা উত্তর দিলেন, "আমি মেয়েমানুষ। আমার পক্ষে তা কি ক'রে সম্ভব? এ তুমি কি বলছো?"

নিজের দেহটি দেখিয়ে রামকৃষ্ণ সংক্ষেপে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন, "এ আর কি করেছে? তোমায় এর চাইতে অনেক বেশী করতে হবে।"

রোগক্লিষ্ট শরীরে এসব আলোচনা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠা রামকৃষ্ণের পক্ষে বিপজ্জনক। সারদামণি তাই তাড়াতাড়ি এ প্রসঙ্গ

চাপা দিলেন। জোবের সঙ্গে বললেন, "সে যখন হবে তখন হবে। তুমি এখন পথ্যিটা খেযে নাও তো।"

ঠাকুর বামকৃষ্ণের এই মনোভাব এবং সারদামণির উপব ঐশ্বরীয় কর্মেব এই দাযিত্ব অর্পণ নূতন নয। ইতিপূর্বে কয়েকবাব একথাটি পত্নীব অন্তবে গেঁথে দেবার চেষ্টা তিনি কবেছেন। এই কথাবার্তাব সমযে রামকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে সুব ক'বে গাইতেন ঃ

এসে পড়েছি যে দায, সে দায বলবো কায়,
যাঁব দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরেব দায ?

গানেব কলি কযটি শেষ হতে না হ'তেই জোব দিযে ঠাকুর বলতেন, "ওগো, শুধু কি আমারই দায় ? তোমাবও যে দায।"

মাতৃরূপিণী এবং বহুজনের আশ্রযস্বরূপিণী ঐশীসত্তাব উদ্বোধন ঘটানোর জন্যই রোগশয্যায শাযিত ঠাকুবেব বাব বাব এই প্রযাস।

দক্ষিণেশ্ববের শেষ পর্যায়ে এবং কাশীপুবে অন্তিম শয্যায শাযিত থাকাব কালে ঠাকুব বাব বাব অন্তরঙ্গ ভক্তদেব দৃষ্টি এই মাতৃরূপিণী, জ্ঞানদাযিনী, মূর্তিব দিকে নিবদ্ধ করাতে চেষ্টিত হতেন। বলতেন, "ও হচ্ছে সারদা, জ্ঞানদাযিনী। মানুষকে জ্ঞান দিতে এসেছে। ও আমাব শক্তি।" ফলে ঘনিষ্ঠ সেবক ও ভক্তদেব মানসপটে দেবী সাবদামণির স্বরূপটি পরিস্ফুট হযে উঠেছিল।

সাবদামণিকে দেবী ষোড়শীরূপে পূজা করে, নানাভাবে তাঁর দেবীত্বের উল্লেখ করে, ভক্তদেব বাব বার তাঁব কাছে পাঠিযে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে প্রোজ্জ্বল ও মর্যাদাপূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন রামকৃষ্ণ। সেই সঙ্গে নানা মন্ত্র-তন্ত্র এবং তাব প্রয়োগবিধি শিখিয়ে তাঁকে ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম ভূমিকার জন্য প্রস্তুত ও সজাগ ক'রে রেখেছিলেন তিনি।

পত্নীর প্রতি আত্মিক ও জাগতিক কোনো স্তবেব কর্তব্যকেই উপেক্ষা করেন নি বামকৃষ্ণ। তাঁর তিরোধানের পর সাবদামণিব আর্থিক নিরাপত্তা যাতে বজায় থাকে, আগে থেকেই সেকথা ভেবে ছিলেন। নিজে ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন রামকৃষ্ণ।

টাকাকড়ি হাত দিয়ে ছুঁতে পারতেন না, কিন্তু পতি হিসাবে পত্নীর ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, এ দায়িত্ব তিনি এড়ান নি।

সারদামণিকে একদিন হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, ঠাকুর, "আচ্ছা বলতো, তোমার ক টাকা হলে হাত-খরচ চলে ?"

উত্তর হল, "এই পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।"

আবার প্রশ্ন, "বিকেলে কখানা রুটি খাও ?"

লজ্জায় মাটিতে মিশে যায় সারদামণি। নিজের আহারের পরিমাণ কি ক'রে বলেন ? এদিকে ঠাকুরও তাঁকে ছাড়বেন না সহজে। তখন তিনি উত্তর দিলেন, "এই পাঁচ-ছ-খানা খাই।"

রামকৃষ্ণ মোটামুটিভাবে খরচের পরিমাণ হিসাব ক'রে বললেন,- "তাহলে পাঁচ-ছয়-শ টাকায় তোমার খুব চলে যাবে, কি বল ?"

ঐ পরিমাণ অর্থ পরবর্তীকালে ঠাকুর তাঁহার ভক্ত বলরাম বসুর কাছে গচ্ছিত রাখেন। বলরামবাবু তা তাঁর জমিদারিতে খাটিয়ে ছয় মাস অন্তর ত্রিশ টাকা সুদ সারদামণির কাছে প্রেরণ করতেন।

লীলাসংবরণের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণ পত্নীকে বলেছিলেন, "ছাখো, তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, আর হরিনাম করবে। বরং পরভাতী ভাল, পরঘরী ভাল নয়। কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনো নষ্ট ক'রো না।"

আবার কখনো বলতেন বিচক্ষণ বিষয়ীর ঢং-এ, "কারো কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎহাত ক'রো না, তোমার মোটা ভাত কাপড়ের কখনো অভাব হবে না। কৃপণ হওয়া ভাল তো লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভাল নয়। তোমার কত নাতিপুতি, কিসের ভাবনা।"

অপরিমেয় অধ্যাত্মশক্তি ও বিভূতি শ্রীরামকৃষ্ণ সদাই গোপন ক'রে চলতেন, কিন্তু ক্বচিৎ কখনো এই শক্তির প্রকাশ ধরা দিত কারো কারো নয়নসমক্ষে। সারদামণির সে-বার সুযোগ ঘটেছিল একটি অত্যাশ্চর্য অলৌকিক দৃশ্য দর্শনের।

কাশীপুরে শ্রীঠাকুর তখন অন্তিম শয্যায শায়িত। অন্তরঙ্গ ত্যাগী ভক্তেবা প্রাণপণে সবাই মিলে তাঁব সেবা পরিচর্যা ক'বে চলেছেন।

সকলেই অল্প-বযস্ক, প্রাণচঞ্চল। একদিন তাঁবা স্থিব করলেন, বাগানেব দক্ষিণ কোণে যে খেজুর গাছ বযেছে, তা থেকে সন্ধ্যাব পর জিবনেব বস খাবেন, এ নিয়ে একটু হৈচৈ করা যাবে, মনও কিছুটা চাঙ্গা হবে।

শ্রীঠাকুব এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না। নিবঞ্জন প্রভৃতি সকলে দল বেঁধে চলে গেলেন ঐ দিকে।

এমন সময়ে সাবদামণি হতবাক্ হযে গেলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। ঠাকুব বামকৃষ্ণ যেন শয্যা ছেড়ে তীববেগে ছুটে চলে গেলেন নিচেব বাগানে। সবিস্মযে সাবদামণি ভাবছেন, 'এটা কি সম্ভব? মুমূর্ষু রোগীকে পাশ ফিরিযে দিতে হয়, তিনি কিভাবে সিঁড়ি বেযে শক্ত সমর্থ মানুষেব মতো ছুটে চলতে পাবেন?'

তাড়াতাড়ি উপস্থিত হলেন ঠাকুবেব কক্ষে, দেখলেন শয্যাটি শূন্য পড়ে আছে। ঘবে বাবান্দায খুঁজে দেখলেন, বোগীব সন্ধান নেই। দুশ্চিন্তাব অবধি বইল না।

একটু পবেই দেখতে পেলেন, ঠাকুব পূর্ববৎ তীববেগে স্বদেহে ফিবছেন। ঔৎসুক্যনিবৃত্তিব জন্য পবে শ্রীবামকৃষ্ণকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা কবলে তিনি বললেন, "তুমি দেখেছ নাকি?" তাব পরে বললেন, "ছেলেবা সব এখানে এসেছে, সকলেই ছেলেমানুব। তারা আনন্দ ক'বে এই বাগানেব একপাশে যে খেজুরগাছ আছে, তারই বস খেতে যাচ্ছিল। আমি দেখলুম, ঐ গাছতলায একটা কালসাপ বযেছে। সে এত রাগী যে সকলকেই কামড়াতো। ছেলেরা তা জানতো না। তাই আমি অন্য পথে সেখানে গিযে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িযে দিযে এলুম। ব'লে এলুম, 'আব কখনো এখানে ঢুকিসনে।'

এবপব সাবদামণির দিকে স্নিগ্ধ নযনে তাকিযে ঠাকুব তাঁকে

সতর্ক ক'রে দিলেন, "একথা যেন আর কাউকে বলো না।" ঘটনাটি প্রত্যক্ষ ক'রে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলো শুনে সারদামণি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।[১]

ঠাকুরের মারাত্মক ক্যান্সার ব্যাধি ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে সারদামণি উত্তরকালে ভক্তদের কাছে বলেছেন, "পাপগ্রহণ ক'রে তাঁর শরীরের ব্যাধি। বলতেন, 'গিরিশের পাপ। ও কষ্ট ভোগ করতে পারবে না।' ঠাকুরের ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সমাধিতে অনায়াসে দেহ ছাড়তে পারতেন। বলতেন, 'আহা, এই ছেলেদের একটা ঐক্য ক'রে বেঁধে দিতে পারতুম।' এতদিন তো এ বলছে, 'নরেনবাবু কেমন আছেন?' ও বলছে, 'রাখালবাবু কেমন আছেন?'—এই রকম ছিল। তাই অতি কষ্টেও দেহ ছাড়েন নি।" অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের প্রেম ঠাকুরকে কেন্দ্র ক'রে দানা বেঁধে উঠুক এবং সারদামণির মাতৃত্বশক্তিও বিস্তারিত করুক তাঁর পক্ষপুট এই অধ্যাত্ম তনয়দের ঘিরে—ঠাকুর মনেপ্রাণে তা চেয়েছিলেন। তাঁর এ ইচ্ছা যে রূপায়িত হয়েছিল, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আমরা পাই।

মহাসাধক রামকৃষ্ণ স্বল্পায়ু ছিলেন, কিন্তু এই স্বল্পপরিসর জীবনের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এক বিরাট অধ্যাত্ম আন্দোলন। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি কৃতী শিষ্যের কর্ম ও তপস্যার মাধ্যমে তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বের শিক্ষিত-সমাজে। নিজ জীবনের এই সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও ঈশ্বরীয় কর্মের ভূমিকা ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্পষ্টরূপেই জানা ছিল। সারদামণির স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আমরা এই নিগূঢ় কথাটি জানতে পারি।

"ঠাকুরের তখন অসুখ, কে সব ভক্তেরা (দক্ষিণেশ্বরে) মায়ের (কালীর) ওখানে পুজো দেবে বলে জিনিসপত্র এনেছিল, তা ঠাকুর কাশীপুরে রয়েছেন জেনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই ভোগ লাগিয়ে

১ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্বামী গম্ভীরানন্দ

প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'দেখেছ, কি অন্যায় করলে। জগদম্বার জন্যে এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে।'

আমি তো ভয়ে মরি, ভাবি—এই তো অসুখ, কি জানি কি হবে। এ কি বাপু, কেন ওরা এমন করলে। ঠাকুর তখন বার বার তাই বলতে লাগলেন। কিন্তু পরে যখন রাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে বললেন, 'দেখ, এর পর ঘর ঘর আমার পুজো হবে। পরে দেখবে—একেই সবাই মানবে, তুমি কোনো চিন্তা ক'রো না।' সেই দিনই আমার বলতে শুনলুম। কখনও 'আমার' বলতেন না। বলতেন, 'এই খোলটার' বা আপনার শরীর দেখিয়ে 'এই এর।'[১]

কালব্যাধি নিজ দেহে নিয়ে রামকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণের উদ্যোগ করছেন, ভক্তেরা প্রায়ই চেপে ধরেন, "আপনি নিজে একটু ইচ্ছে করুন, ভাল হয়ে উঠুন।"

সহাস্যে উত্তর দেন ঠাকুর, "সে কিগো, যে মন ঈশ্বরকে দিয়েছি তা আর কি ক'রে ফিরিয়ে আনি? নিজের ইচ্ছেই বা আর রেখেছি কই যে, মাকে বলবো—সারিয়ে দাও।"

সারদামণি সেদিন শেষ চেষ্টা হিসেবে তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গেলেন। এ সম্পর্কে নিজে বলেছেন:

একদিন যায়, দুদিন যায়, পড়েই আছি। রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম—যেমন অনেকগুলো হাঁড়ি সাজানো থাকলে তার উপর ঘা মেরে যদি কেউ একটা হাঁড়ি ভেঙে দেয়, সেই রকম শব্দ। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল, 'এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে-কার? কার জন্য আমি এখানে প্রাণ হত্যা করতে বসেছি?'—একবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে। আমি উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মন্দিরের পেছনের কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে চোখে মুখে দিলুম, খানিকটা খেলুম—পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, না

১ মায়ের কথা, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন

খেয়ে পড়েছিলুম কিনা। তবে প্রাণ একটু সুস্থ হল। তার পরদিনই চলে আসি।

আসতেই ঠাকুর বললেন, 'কিগো, কিছু হল?—কিছুই না।' ঠাকুরও স্বপ্ন দেখেছিলেন, ওষুধ আনতে হাতী গেল। হাতী মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্য। এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙে দিলে। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি স্বপ্ন-টপ্ন দেখ?'

"দেখলুম, মা কালী ঘাড় কাত ক'রে রয়েছেন। বললুম, 'মা, তুমি কেন এমন ক'রে আছ?' মা কালী বললেন, ওর ঐটের জন্য (ঠাকুরের গলায় ঘা দেখিয়ে), আমারও হয়েছে।' ঠাকুর বললেন, যা কিছু ভোগ সব আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল। তোমাদের আর কাউকে কষ্ট করতে হবে না। জগতের সকলের জন্য আমি ভোগ ক'রে গেলুম।"

মহাপ্রয়াণ এবার আসন্ন। সজল চক্ষে সারদামণি ও রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ ভক্তশিষ্যেরা শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সারদাকে উদ্দেশ ক'রে ঠাকুর এসময়ে বললেন, "দেখগো, কেন জানি না আমার মনে সর্বদাই ব্রহ্মভাবের উদ্দীপনা হচ্ছে।"

ঐ কথায় আর কি উত্তর দেবেন সারদামণি? এ যে মহাসমাধি ও চিরবিদায়ের ইঙ্গিত। কঙ্কালসার রোগজীর্ণ দেহটির দিকে তাকিয়ে নীরবে তিনি তখন অশ্রু বিসর্জন করছেন। ব্রহ্মে লীয়মান, আপ্তকাম ব্রহ্মবিদ্ সাধককে কে আর টেনে রাখতে পারে?

দেহ ত্যাগের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি বিছানার বালিশে কোনোমতে দেহভারটি ন্যস্ত ক'রে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নীরবে উপবিষ্ট রয়েছেন। ভক্ত সেবকদের মুখে হতাশার ম্লান ছায়া।

ঠাকুরকে নীরব দেখে সবাই ভেবে নিয়েছিলেন, বোধহয় তাঁর বাক্‌শক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সারদামণি ও লক্ষ্মীদেবী ঘরে ঢুকতেই তিনি মুখ খুললেন। মৃদুস্বরে বললেন, "এসেছ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি—জলের ভেতর দিয়ে অনেক দূর।"

সারদামণি ক্রন্দন করতে লাগলেন, ঠাকুর বললেন, "তোমাদের ভাবনা কি? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। আর এরা (নরেন্দ্র প্রমুখ) আমার যেমন করেছে, তোমায়ও তেমনি করবে।"[১]

সারদামণির সাধন প্রস্তুতি, দিব্য রূপায়ণ ও গুরুরূপিণী মাতৃশক্তির উজ্জীবন, এই তিনটি লক্ষ্যের প্রতিই ঠাকুর রামকৃষ্ণের দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। বিশেষ ক'রে দক্ষিণেশ্বরে থাকার কালেই, কখনো প্রকাশ্যে কখনো বা প্রচ্ছন্নভাবে এ প্রস্তুতিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলতে যত্নবান থাকতেন। গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন:

মাতাঠাকুরাণীকে তিনি পূজা করিয়া, অন্যভাবে সম্মান দিয়া এবং নানা সময়ে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার দেবীত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহার অবচেতনাকে ঐ বিষয়ে জাগরূক রাখিতেছেন। স্বীয় সাধনার দ্বারা উজ্জীবিত ও অনন্তশক্তিপূর্ণ বহু মন্ত্র শ্রীমাকে শিখাইয়া এবং কিরূপ অধিকারীকে কীদৃশ মন্ত্র দিতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া দিয়া তাঁহার গুরুশক্তিকে কার্যোন্মুখী করিতেছিলেন। অধিকন্তু বালক ও মহিলা ভক্তদিগকে শ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়া এবং ঐ সঙ্গে নানা উপদেশ দিয়া তাঁহার মাতৃভাব প্রসারের ক্ষেত্র রচনা করিতেছিলেন। ইহারই সঙ্গে তিনি আবার তাঁহাকে স্পষ্টই ভার গ্রহণে আহ্বান করিতেন এবং ভক্তগণকে ঐ ভাবী পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতে থাকিতেন।

মহাসাধক রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে বহুতর বিস্ময়কর কাণ্ডই তখন দক্ষিণেশ্বরে সংঘটিত হচ্ছিল। ভাবাবেশ, ধ্যান ও সমাধির নূতন নূতন দৃশ্যপটের ঘটছিল পরিবর্তন। এ সময়ে দেবপ্রতিম পতির মধ্যে তাঁর লোকোত্তর রূপটি বার বার প্রত্যক্ষ করেছিলেন সারদামণি, উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভোজনে বসেছেন, আর সারদামণি পাশে বসে একটি হাতপাখা নিয়ে তাঁকে হাওয়া করছেন।

---

১ শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী স্বামী গম্ভীরানন্দ

হঠাৎ পাখাটি হাত থেকে পড়ে গেল, স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর গলায় আঁচল টেনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন।

সবিস্ময়ে মুখ তুলে চাইলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, "কিগো, এমন অসময়ে প্রণাম?"

পত্নী এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না, হাত দুটি তখনো তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ। আবার প্রশ্ন, "কি হয়েছে বলো না গো।"

তবুও সারদামণি নীরব নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছেন। বালকস্বভাব, কৌতূহলী ঠাকুর কিছুতেই ছাড়বেন না। বললেন, "কি হয়েছে, খুলে বলতেই হবে। নইলে আমি আর খাবো না।"

এবার মুখ খুলতেই হল সারদামণিকে। বললেন, "আমি দেখলাম এক আশ্চর্য দৃশ্য। তুমি সামনে বসে খাচ্ছো, তোমার কাঁধ অবধি দেহটি ঠিকই রয়েছে, কিন্তু তার ওপরে রয়েছে মা-কালীর মাথাটি, সোনার মুকুট তাতে ঝলমল করছে। স্পষ্ট দেখলুম, তোমার হাত দিয়ে মা-ই খাচ্ছেন। এটা কি দেখলাম গো?"

"ঠিক দেখেছো তুমি।" মুচকি হেসে ঠাকুর উত্তর দিলেন।

রামকৃষ্ণের তপস্যাসিদ্ধ মহাজীবনে সাধ্য আর সাধক, ইষ্ট আর ভক্ত তখন একীভূত হতে চলেছে।

সারদার জননী শ্যামাসুন্দরীর ক্ষোভ ছিল, কন্যার ভাগ্যে এ জীবনে আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব হল না। একদিন দুঃখ ক'রে বললেন, "এমন পাগল জামায়ের সাথে আমার সারদার বে দিলুম, আহা। ঘর-সংসার করলে না, ছেলে-পিলেও হল না, মা বলাও শুনলে না।"

রামকৃষ্ণ শুনতে পেলেন এ কথা। মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে শেষে দেখবেন—মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।"

একদিন পত্নীকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন ক'রে বসেন,- "তোমার কি ছেলে-পিলের ইচ্ছে আছে নাকি মনেতে?"

উত্তর পেলেন, "না—আমি কিছুই চাইনে, চাই কেবল তোমার আনন্দ। তোমার তুষ্টি। তুমি যা কিছু নিয়ে সুখী থাকো, তা-ই আমি চাই।"

"বেশ, বেশ। পরে দেখবে, তোমার কত সন্তান আসবে, দেশ-বিদেশের কত ভক্ত আসবে। তোমায় সবাই মা বলে ডাকবে। তুমিও তাদের দেখবে।"

এভাবে মাঝে মাঝে, সারদামণির ভবিষ্যৎ-জীবনের ঈশ্বর নির্দিষ্ট ভূমিকাটির আভাস দেন রামকৃষ্ণ।

দক্ষিণেশ্বরে থাকবার সময় থেকেই রামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত সন্তানদের সঙ্গে সারদামণির ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন ক'রে দিয়েছিলেন।

ভক্ত লাটু একদিন নিভৃতে বসে ধ্যান করছেন। ঠাকুর তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "ওরে, তুই যার ধ্যান করছিস্, তিনি যে নহবতে বসে ময়দা ঠেস্‌ছেন।"

তারপর নিজেই লাটুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সারদামণির রুটি তৈরির কাজে লাগিয়ে দিলেন।

পিতার চাপে পড়ে ভক্ত রাখাল বিয়ে করেছেন, কিন্তু সারা দেহ মনপ্রাণ তাঁর পড়ে আছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। সেদিন তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন। ঠাকুর তাড়াতাড়ি সারদামণিকে বলে পাঠালেন, "আমার রাখালের বউ এসেছে। ছেলের বউ, খালি হাতে দেখতে নেই, টাকা দিয়ে যেন মুখ ছাখে।"

রাখালের স্ত্রীকে সারদামণি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন, পুত্রবধূ রূপেই গ্রহণ করলেন তাকে।

নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের বিবেকানন্দ, তখন সবে দক্ষিণেশ্বরে আসা যাওয়া শুরু করেছেন। রামকৃষ্ণ একদিন সারদামণির কাছে তাঁর প্রসঙ্গ তুললেন। সোৎসাহে বললেন, "এমন চোখ তোমার

দেখাবো যেমনটি আর ছাখো নি। আমি নরেনের কথা বলছি। মূর্তিমন্ত জ্ঞান, সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছে। কী তার চোখ দুটো, তুমি দেখো।"

উত্তরে সারদামণি বলেন, "কি ক'রে দেখবো? আমি তো ছেলেদের সামনে বেরুইনে।"

"আচ্ছা সে হবে'খন।" বলে ঠাকুর হনহন্ ক'রে চলে গেলেন। আর একদিন নরেনকে পাঠালেন নহবতে কি একটা দরকারি জিনিস আনবার জন্য। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নরেনকে দেখলেন সারদামণি। আয়ত উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখে খুশী হলেন। মনে মনে বললেন, "এমন স্বচ্ছ চোখ কি মানুষের হয়? - এ যেন আরশি।"

নরেন রাখাল এসব ত্যাগী ছেলেদের নিয়ে ঠাকুরের কি আনন্দ। এই আনন্দ দেখে সারদামণিরও হৃদয় জুড়িয়ে যায়। ঠাকুরের নবীন ত্যাগী ভক্তদের মনেপ্রাণে তিনি গ্রহণ করেন নিজের সন্তানরূপে।

ভক্ত যোগেনকে নিয়ে রামকৃষ্ণ একদিন সারদামণির কাছে এসে উপস্থিত হন। পরিষ্কার ভাষায় বলেন, "এঁর চরণ ধরে তুই পড়ে থাক্, এখানেই তোর সব হবে।"

যুবক ভক্ত সারদা দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই এসে উপস্থিত হন ভগবৎ-প্রসঙ্গ-শোনার জন্য। ঠাকুর একদিন সারদামণির আবাস নহবত ঘরের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত ক'রে বলে ওঠেন, "তোর দীক্ষা হবে ওখান থেকে।"

রামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে যোগেন মহারাজ ও সারদা মহারাজ এই দুজনকেই দীক্ষা গ্রহণ করতে হয় সারদামণির কাছ থেকে।

কাশীপুরে রামকৃষ্ণের রোগশয্যার পাশে অন্তরঙ্গ সেবকরূপে এসে উপস্থিত হন আরও ত্যাগী ভক্তেরা। এই ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে স্থাপিত হয়েছিল সারদামণির অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। এই সূত্রের মাধ্যমেই রামকৃষ্ণমণ্ডলীর জননী-রূপে, ধারয়িত্রীরূপে উত্তরকালে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন।

দক্ষিণেশ্বরে যে সব নাবী ভক্ত রামকৃষ্ণেব চবণতলে এসে উপবেশন কবতেন, তাদেব মধ্যে অনেকেই সাবদামণিব পূত সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হযেছেন, তাঁব আশীর্বাদে এগিযে গিযেছেন আধ্যাত্মিক সাধনাব পথে।

গোপালেব মা, যোগেন-মা গোলাপ-মা প্রভৃতি ঠাকুর রামকৃষ্ণেবই ইচ্ছায় ও নির্দেশে সাবদামণিব দিব্য জীবনের সঙ্গে যুক্ত হযেছিলেন, তাঁর ভক্ত, সখী, সেবিকারূপে হয়েছিলেন কৃতার্থ।

সারদামণি এ সময়কাব কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "কোনোদিন ঠাকুবেব ঘব একটু ফাঁকা দেখলেই গোপালেব মা ছুটে এসে বলতেন ও বৌমা, শিগগীব চলো, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো। তোমাদেব একত্তব না দেখতে পেলে মনে আমাব তৃপ্তি হয না। ওঠো, শিগ্‌গীব চলো কে কখন এসে পডবে।"

নিভৃতচাবিণী, পতিগতপ্রাণা তপস্বিনী সাবদামণিব আনন্দেব জন্যে ঠাকুবেব এই নাবীভক্তেবা যেন সদা উন্মুখ হযে থাকতেন।

গৌবীমাব ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল আবো উচ্ছল, আবো জীবন্ত। বামকৃষ্ণ সহধর্মিণীকে একান্তভাবে গ্রহণ কবেছিলেন তিনি বামকৃষ্ণ শক্তিরূপে, মহিমময়ী দেবীরূপে।

ঠাকুবেব কোনো কোনো নাবী ভক্ত বলতেন, "ঠাকুব এমন ত্যাগী পুরুষ, হাত দিযে পয়সাটি অবধি ছুঁতে পাবেন না। তাব স্ত্রী হযে মা এত অলংকাব পরে থাকেন, এটা যেন দৃষ্টিকটু লাগে।" এই ধবনেব মন্তব্য শুনে সাবদামণি একদিন দেহেব সব গহনা খুলে ফেললেন।

গৌরীমা সেদিন দক্ষিণেশ্ববে ছিলেন, ফিবে এসে দেখলেন, মা সাবদামণি নিবাভবণা হযে বসে আছেন। সব বৃত্তান্ত জানবাব পব তিনি তো মহা উত্তেজিত। মাকে যাবা অলংকাব বর্জনেব উপদেশ দিযেছিলেন তীব্র কণ্ঠে কবলেন তাঁদেব ভর্ৎসনা। তাবপব মা সাবদামণিকে বললেন, "তুমি বৈকুণ্ঠেব লক্ষ্মী। তোমায কি এমন বেশ ধবতে আছে। তোমাব গাযে সোনা থাকলে তবেই তো হবে জগতেব কল্যাণ আব বাডবাডন্ত।"

এবাব গৌবী-মা ও যোগেন-মা প্রভৃতি ভক্ত সহচবীরা সারদা-মণিকে যত্ন ক'বে ভালো শাড়ী গহনা দিয়ে সাজালেন। বললেন, "ছাখো তো কেমন সুন্দব তোমায মানিয়েছে। এবাব চলো, কত্তাকে এই সাজে দর্শন দেবে।"

স্বভাব-লাজুক সাবদামণি এ বেশে ঠাকুবের কাছে যেতে রাজী নন, ভক্ত সেবিকাবাও কোনোমতেই তাঁকে ছাড়বেন না। অবশেষে গৌবীমাব জোব ও আবদাবেব কাছে সাবদামণিকে হাব মানতেই হল, ঠাকুবেব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ভক্ত সঙ্গিনীদেব মধ্যে আনন্দেব বান ডেকে উঠল।

একদিন সাবদামণিকে দেখিয়ে বহস্যভবে বামকৃষ্ণ বললেন, "আচ্ছা গৌবীদাসী, তুই ওকে বেশী ভালবাসিস না আমাকে? ঠিক ক'বে বলত?"

একথাব উত্তব দিলেন গৌবীমা একটি চমৎকাব গানেব মধ্য দিয়ে :

বায হ'তে তুমি
বড নও হে বংশীধারী,
লোকেব বিপদ হ'লে
ডাকে মধুসূদন ব'লে,
তোমার বিপদ হলে পবে
বাঁশীতে বলো বাইকিশোবী।

গানেব পদ শুনে লজ্জায সংকোচে সাবদামণি গৌবীমাব মুখ চেপে ধবতে চাইছেন, আব ঠাকুব বামকৃষ্ণ মিটিমিটি হাসছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

গৌবীমাব জননী গিরিবালা দেবী ছিলেন এক বিশিষ্টা কালী-সাধিকা। কবিত্বশক্তিও তাঁব বেশ ছিল। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্ববে এসে স্ববচিত শ্যামা-সংগীত গেয়ে বামকৃষ্ণকে তিনি আনন্দ দেন। বামকৃষ্ণকে তিনি খুবই শ্রদ্ধাভক্তি কবতেন, মা-কালীব ববপুত্ররূপে।

কিন্তু সারদামণির অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে তাঁর খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না। সারদামণি সিদ্ধপুরুষ রামকৃষ্ণের স্ত্রী-এবং একজন সাধারণ ধর্মপ্রাণা নারী মাত্র, এর বেশী তাঁকে আর কিছু ভাবতে গিরিবালার মন সায় দিত না।

সারদামণির মূল্যায়ন সম্পর্কে কন্যা গৌরীর সঙ্গে প্রায়ই তাঁর বিতর্ক হতো, মতান্তর হতো।

সেদিন গৌরীমা বলেন, "সারা জীবন তুমি এত সাধনভজন করলে, তবুও আমাদের মা'কে, ব্রহ্মময়ীকে চিনতে পারলে না? এতে তোমার গুরুতর অপরাধ হচ্ছে, জেনে রেখো।"

"তোদের তপস্যার জীবনে এখনো অভাব রয়েছে, তাই এসব বলিস্। আমার অন্তরে সদা বিরাজ করছেন আমার ইষ্টদেবী, স্বয়ং ত্রিভুবেশ্বরী। আর কাউকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই।" দৃঢ়স্বরে জবাব দেন গিরিবালা।

গৌরীমা দুঃখিতা হলেন মায়ের এই মনোভাবে। শ্লেষের সুরে বললেন, "তা বাপু, তোমার ভাগ্যে থাকলে তো হবে।"

সেদিন মন্দিরে ও রামকৃষ্ণের কক্ষে প্রণাম সেরে গিরিবালা বাড়িতে ফেরবার উদ্যোগ করছেন, কন্যা তাকে ধরে নিয়ে গেলেন নহবতে সারদামণির আবাসে।

বৃদ্ধাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন সারদামণি। কক্ষে প্রবেশ ক'রে সারদামণির দিকে দৃষ্টিপাত করবার সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলেন গিরিবালা দেবী। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, অ্যাঁ, মা তুমি! এ যে আমারই সেই—"

কথাটি তাঁর অসমাপ্ত রয়ে গেল। ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন সারদামণির চরণতলে, বার বার তাঁর চরণধূলি তুলে নিলেন নিজের মস্তকে।

সারদামণির চোখে মুখে স্মিতহাসির আভা। প্রশ্ন করেন, "কি মা, কি হয়েছে তোমার? অমন করছো কেন?"

গৌরীমার অন্তর তখন বিজয়গর্বে ভরপুর। বললেন, "কী আবার

হবে? যা হবার তাই হয়েছে।" – বৃদ্ধা কালীসাধিকা মাতার দিকে তাকিয়ে তখন তিনি কৌতুকোজ্জ্বল হাসি হাসছেন।

সাধারণ মানবী বলে যাকে মনে করতেন, সেই সারদামণির ভেতর সাধিকা গিরিবালা দেখলেন তাঁর ইষ্টদেবীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি, তাই ভাবের আবেগে হয়েছিল তাঁর কণ্ঠরোধ।

অসীমের মা নামে পরিচিতা এক ধার্মিকা মহিলা প্রায়ই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন। অবসর পেলে নহবতে সারদামণির কাছেও এসে তিনি বসতেন। এই মহিলার বিশ্বাস ছিল, ঠাকুরই স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ। কিন্তু মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন তাঁর মনে উঁকি দিত। ভাবতেন, 'উনি যদি সত্যই বিশ্বনাথ, তবে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায়? গলায় বিষধর সর্প থাকবে আভরণ রূপে, পাশে অধিষ্ঠিতা থাকবেন স্বয়ং পার্বতী। কই, সে সব তো কিছুই দেখছিনে। তবে কি ইনি শিব নন, শুধু নিজের ভাবাবেশে আমি একটা কাল্পনিক দেবমূর্তি খাড়া করতে চাচ্ছি?'

একদিন নহবতে বসে ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বসে তিনি কথাবার্তা বলছেন। ঠাকুর তখন ধ্যানে বসবার জন্য বেলতলার পঞ্চমুণ্ডী আসনের দিকে যাচ্ছেন। এদের ডেকে বললেন, তোমরা এত কি সব বলছো গো। এসো আমরা বেলতলায় গিয়ে বসি, সেখানে ধর্মকথা হবে।

লক্ষ্মীদেবীর হাতের কাজকর্ম সেরে নিতে কিছুটা দেরি হল। ইতিমধ্যে ঠাকুর বেলতলায় গিয়ে বসেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গিয়েছেন ধ্যানের গভীরে। লক্ষ্মীদেবী ও অসীমের মা কিছুক্ষণ পরে বেলতলায় গিয়ে উপস্থিত হন এবং ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে উভয়ে হতবাক্ হয়ে যান।

অসীমের মা দেখেন, ঠাকুর নয়নদ্বয় নিমীলন ক'রে সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন, আর একটি বৃহদাকার নাগরাজ ফণা বিস্তার ক'রে নিশ্চল হয়ে বিরাজ করছে তাঁর পশ্চাৎ দিকে। আশেপাশে ফণা

নাচিয়ে খেলা করছে আরো কয়েকটি বিষধর সর্প। অসীমের মা তো ভয়ে আড়ষ্ট। অনুতপ্ত হয়ে ভাবছেন। 'কি ছেলেমানুষী বুদ্ধি আমার হয়েছিল, কেন সাধ জেগেছিল ঠাকুরকে বিশ্বনাথরূপে দর্শন করার জন্য? এবার এই হিংস্র সাপগুলো কি ক'রে বসে কে জানে?

এদিকে লক্ষ্মীদেবীও চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন ঠাকুরের লোকোত্তর দিব্যরূপ। শিবরূপে যোগাসনে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন আর তাঁর বাম উরুতে বসে আছেন পত্নী সারদামণি।

ধাঁধায় পড়ে গেলেন তিনি। ভাবলেন, এই তো খুড়িমাকে দেখে এলুম নহবতে গৃহস্থালির কাজ করছেন। তিনি কি ক'রে এসে গিয়েছেন এখানে? কেনই বা বিরাজ করছেন এই ভঙ্গীতে? দিনের স্পষ্ট আলোয় কি ক'রে ঘটছে এ সব?'

তখনি ছুটে গেলেন নহবতে। আশ্চর্য হলেন দেখে, সারদামণি সেইখানেই উপবিষ্ট রয়েছেন রান্নাবান্নার কাজে।

আবার ছুটে এলেন লক্ষ্মীদেবী বেলতলায় ঠাকুরের কাছে। এবারও দেখা গেল সেই বিস্ময়কর দিব্য দৃশ্য।

অতঃপর সর্পকুল সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখনো স্থাণুবৎ বসে রইলেন ধ্যানস্থ হয়ে। দূর থেকে ভক্তি-ভরে তাঁকে প্রণাম নিবেদন ক'রে লক্ষ্মীদেবী ও অসীমের মা ইষ্টনাম জপে নিবিষ্ট হলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হল, ভক্ত নারীদের সাথে দু-চারটি কথা বলে, ফিরে গেলেন তিনি মন্দির চত্বরে, তাঁর আপন কক্ষে।

নহবতে গিয়ে ভক্তিভরে সারদামণিকে প্রণাম ক'রে লক্ষ্মীদেবী সোৎসাহে, সবিস্তারে, বর্ণনা করলেন তাঁর দিব্যদর্শনের কথা। সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন, "খুড়িমা, তুমি তো সামান্য মেয়ে নও! এ জন্যই তো খুড়োমশাই বলেন,—আমি কি আর লাউশাক-খাকী-পুঁইশাক-খাকীকে বে করেছি।"

রসিক দক্ষিণেশ্বরের একজন মেথব ও ঝাড়ুদাব। জন্মগত শুভ সংস্কাব নিযে সে জন্মেছে। তাই সাবাদিনেব কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রীবামকৃষ্ণেব আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ভক্তসঙ্গে ঠাকুব কত নর্তন-কীর্তন, আনন্দলীলা করেন, বসিক মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিযে থাকে, মন তাঁব খুশীতে ভবে ওঠে। প্রায়ই বসে বসে ভাবে, 'কি দুবদৃষ্ট আমার। নীচ অস্পৃশ্য মেথবকুলে জন্মেছি, ঠাকুবেব ভক্ত-সমাজে আমাব প্রবেশেব অধিকার নেই। নইলে আব দশজনেব মতো তাঁর কাছে গিযে আমিও তো বসতে পাবতুম, প্রাণভবে তাঁব কথা শুনতুম, হরি-কীর্তনে যোগ দিতুম।'

এই মর্মবেদনার কথা রসিক ঠাকুরকে কি ক'বে জানাবে? সংকোচে ও ভযে নিজেকে সে দূবে সরিযে বাখে।

সেদিন মাথায এক বুদ্ধি খেলে গেল। নহবতে তো মা বাস করছেন, সবাইব যেমন মা তিনি, তেমনি বসিকেরও মা। তাঁব দযা হলে বাবাব দযা হতে কতক্ষণ? এই সাব কথাটি বুঝে নিযে রসিক নহবতেব আশেপাশে ঘুরতে লাগল, কখন সুযোগমতো মাকে তাঁব প্রাণেব আকাঙ্ক্ষাটি নিবেদন কবা যায।

সাবদামণি লক্ষ্য কবলেন, মন্দিবেব পুবনো ঝাড়ুদাব বসিক প্রাযই নহবতেব চাবপাশে ঘোরাঘুবি কবছে। কি চায় সে? কেনই বা বার বাব এত আসা-যাওয়া। একদিন হঠাৎ বসিকেব সামনে গিযে দাঁড়ালেন সাবদামণি, বসিকও সুযোগ পেযে লুটিযে পড়ল তাঁব চবণতলে। কেঁদে বলল, "মাগো, বাবাব কাছে তামাম মুলুকেব কত লোক আসে। শুনেছি তাঁব দয়া হলে নাকি ঈশ্ববেব দর্শন পাওযা যায। এত লোককেই তো বাবা দয়া কবছেন, আমাব মতো দীন হীনকে কি কববেন না? আপনি আমাব হয়ে তাঁকে একটু বলুন। আমি তো আপনাদেব চবণতলেই পড়ে আছি, মা।"

সারদামণিব অন্তর বিগলিত হল, স্নেহভবে আশ্বাস দিলেন, "আচ্ছা বাবা, তুমি ভেবো না, আমি তাঁকে বলবো।"

একদিন অবসবমতো ঠাকুবকে বসিকেব আবেদনের কথা তিনি

নিবেদন কবলেন। অর্ধনিমীলিত নেত্রে ঠাকুব সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

কযেকদিন পবেব কথা। পঞ্চবটীব ভেতব ঠাকুব ধ্যানাসনে বসতে চলেছেন, পথে বসিকেব সঙ্গে দেখা। ঠাকুবকে দেখেই সসম্ভ্রমে পথ ছেডে দাঁডায। হাতেব ঝাড়ু মাটিতে ফেলে দিয়ে জোড হাতে নিবেদন কবে তার প্রণাম।

তাব দিকে দৃষ্টি পডামাত্র ঠাকুব ভাবে গদ্‌গদ হযে উঠেছেন, "ওবে আয আয," বলে এগিযে গিযে প্রেমভবে কবেন তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেযে যায তাঁব বাহ্যজ্ঞান, ডুবে যান সমাধির গভীবে।

দেবমানবের এই দিব্য স্পর্শে বসিক আত্মহাবা হযে যায। দেহটি থবথব ক'রে কাঁপতে থাকে, দুই চোখে ঝবে প্রেমাশ্রুব ধাবা, তাবপর সংবিৎহীন দেহটি লুটিযে পডে ভূমিতলে।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেযেই আনন্দ-আবেশে অধীব বসিক ছুটে যায নহবতে মা-সাবদামণিব আবাস দ্বাবে। কৃপাময়ীব কৃপায় হযেছে সে বাবাব কৃপাধন্য, কৃতজ্ঞতাভবে বাব বাব এ কথাটি সে জ্ঞাপন কবতে থাকে।

তাবকেশ্ববে সংকল্প ব্যর্থ হবাব পবই সাবদামণি বুঝেছিলেন, ঠাকুবেব তিবোধানেব আর বেশী দেবি নেই।

দক্ষিণেশ্বরে থাকতে ঠাকুব একদিন নিজেব সম্পর্কে তাঁকে বলেছিলেন, "যখন দেখবে, বহু লোকে একে মানবে, শ্রদ্ধাভক্তি কববে, তখন জানবে, এব অন্তর্ধানেব সময হযে এসেছে।"

সাবদামণি সভযে দেখলেন, ঠাকুবেব কথিত এ লক্ষণটি কাশীপুরে থাকতে একদিন মিলে গেল। কযেকজন ভক্ত মিষ্ট দ্রব্যাদি ভেট নিযে দক্ষিণেশ্ববে গিযেছিলেন, ঠাকুব তখন সেখানে নেই, বযেছেন কাশীপুবে বোগশয্যায় শাযিত। ঐ ভক্তেব দল অগত্যা ঠাকুরেব ছবিব সামনে ভোগ নিবেদন কবেন এবং নিজেদের মধ্যে বিতবণ করেন সেই প্রসাদ।

এ সংবাদ শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, "ওরা এটা কি করল, বলতো? মা-কালীকে ভোগ না দিয়ে এরা ছবির সামনে দিয়ে দিলে?"

সারদামণি ও ভক্তেরা বড় ভীত হয়ে পড়েন, পাছে এতে কোনো অকল্যাণ ঘটে। ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে বলেন, "ওগো, তোমরা কিছু ভেবো না—এর পর ঘরে ঘরে আমার পুজো হবে।" একটু থেমে, শিশুর মতো জোর দিয়ে আবার বললেন, "মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি।"

একদিন ঠাকুর প্রশ্ন করলেন সারদামণিকে, "কি গো, তুমি স্বপ্নটপ্ন ছাখো?"

উত্তরে তিনি জানান, "হ্যাঁ, সেদিন দেখলুম, মা-কালী ঘাড় কাৎ ক'রে রয়েছেন। বললুম, 'মা, তুমি এমন ক'রে আছো কেন?' মা বললেন, "ওর ঐটের (ঠাকুরের গলক্ষতের) জন্য আমারও হয়েছে।"

ঠাকুর চুপ ক'রে যান। সারদামণির মনে ঘনায় নৈরাশ্যের কালো মেঘ। ঠাকুরের রোগ নিজে গ্রহণ ক'রে বেদনার্ত ও বিকৃতাঙ্গ হয়েছেন জগজ্জননী, তবুও তাঁকে নিরাময় করলেন না। তবে আর কে সারাবে এই প্রাণঘাতী ব্যাধি?

আর একদিন সারদামণিকে বলেন ঠাকুর, "ছাখো যত কিছু ভোগ আমার উপর দিয়ে হয়ে গেল। তোমাদের আর কাউকে কষ্টভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্য আমি এই ভোগ ক'রে গেলুম।"

এ কথার তাৎপর্য বুঝতে সারদামণির দেরি হয়নি? মনেপ্রাণে উপলব্ধি করলেন, তাঁর পতি শুধু তাঁরই পরমাশ্রয় নন, সারা বিশ্ব-জগতের পরমাশ্রয় তিনি। ঠাকুরের কথা কয়টি এক মুহূর্তে সারদামণির ব্যক্তিসত্তাকে ঊর্ধ্বায়িত ক'রে দিল, ঠেলে দিল তাঁকে ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের অতীত এক চৈতন্যময় লোকে।

মন্ত্রপূত সোনার ইষ্টকবচটি রামকৃষ্ণ ধারণ করতেন তাঁর বাহুতে।

সারদামণিকে সেদিন ডেকে, তাঁকে দিয়ে উন্মোচন করালেন এই কবচ, রেখে দিলেন তাঁরই কাছে। সারদার বুক কেঁপে উঠল। বুঝলেন মহাপ্রস্থানের সময় নিকটবর্তী, এসময়ে ঠাকুর নিজ অঙ্গে কোনো ভূষণের সন্ধান রাখবেন না।

শিষ্যপ্রধান নরেন্দ্রকে বার বার সংগোপনে ডেকে ঠাকুর তাঁর মনকে প্রস্তুত করছেন আসন্ন বিচ্ছেদের জন্য, তাঁর ভেতরে শক্তিপাত ক'রে অর্পণ করছেন অধ্যাত্মজীবনের পরম ঐশ্বর্য। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর প্রস্তুতিপর্ব ক'রে ফেলেছেন সমাপ্ত।

ইতিমধ্যে একদিন সারদামণিকে নিকটে ডাকিয়ে এনে বললেন, "ছাখো গো, কেন জানিনে, আমার মনে সর্বদাই ব্রহ্মভাবের উদ্দীপন হচ্ছে।"

পতিগতপ্রাণা সারদার বুঝতে বাকী রইল না, আত্মা এবার তার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করতে কৃতসংকল্প।

১৫ই আগস্টের (১৮৮৬ খ্রীঃ) সেই মহাদুর্দৈবের দিনটি সমাগত হল। ভক্ত-শিষ্যেরা ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে ঘিরে রয়েছেন, দীপ নির্বাপিত হতে চলেছে ধীরে ধীরে। সারদামণি ও লক্ষ্মীদেবী কাছে এসে দাঁড়াতেই ঠাকুর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "এসেছো ? ছাখো, আমি যেন কোথায় চলে যাচ্ছি—জলের ভেতর ভেতর দিয়ে অনেক দূরে।

সারদামণির কপোল বেয়ে ঝরছে তখন অশ্রুধারা। আশ্বাস দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন, "তোমাদের ভাবনা কি ? যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে। আর, এরা নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা আমার যেমন করেছে তোমায়ও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখো, কাছে রেখো।"

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন, সে সমাধি থেকে আর তিনি ব্যুত্থিত হলেন না। ডাক্তারেরা ঘোষণা করলেন তাঁর তিরোধানের কথা। মর্মভেদী আর্তি শোনা গেল সারদামণির কণ্ঠে, "মা-কালী গো আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে !"

গুরু, ইষ্ট ও আরাধ্য পরম বস্তুরূপে যে পতিকে তিনি উপলব্ধি ক'রে আসছিলেন এতদিন, সেই পরম বোধের কথাটিই সেদিন উচ্চারিত হল তাঁর আকুতিতে।

সন্ধ্যাকালে একে একে দেহ থেকে অলংকার উন্মোচন করছেন সারদামণি। সর্বশেষে সোনার বালাটিতে যেই হাত দিয়েছেন, দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ঠাকুর রামকৃষ্ণের অলৌকিক মূর্তির দিকে। গলক্ষতের আগেকার সুস্থ দেহটি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন ঠাকুর। সারদামণির হাতটি চেপে ধরে বললেন, "আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছো?"

হাতের বালাটি তেমনি রয়ে গেল, সারদামণি আর তা খুলতে পারলেন না। তারপর আপন হাতে নিজের শাড়ীর পাড়গুলো সরু ক'রে কেটে নিলেন। স্বামী যে তাঁর চিন্ময়, চিরঞ্জীব, তাই এয়োস্ত্রীর সাজই তিনি গ্রহণ করলেন। এই দিন থেকে স্বামী, নাথ, পরমপ্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ চির বিরাজিত, চির দীপ্যমান রয়ে গেলেন পতিপ্রাণা সারদার মনোমন্দিরে।

দুঃসহ শোকের দহন কিছুটা প্রশমিত হবার পর নরেন, রাখাল ও অন্যান্য ভক্ত পার্ষদেরা ভাবলেন, মা-সারদামণিকে কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে তীর্থ ও দেবস্থান দর্শনের জন্য পাঠানো প্রয়োজন। এতে তাঁর হৃদয়-জ্বালা কিছুটা নিবারিত হতে পারবে।

কয়েকজন পুরুষ ও নারীভক্ত এবং সেবিকাসহ সারদামণি রওনা হন এবং কাশী ও অযোধ্যায় স্নান তর্পণ দর্শনাদি সেরে উপনীত হন বৃন্দাবনধামে। এখানেও ভক্ত বলরাম বসুদের স্থাপিত কালাবাবুর কুঞ্জে সদলে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। কুঞ্জে কুঞ্জে মন্দিরে মন্দিরে সারদামণি ঘুরে বেড়ান, বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয় কিছুটা শান্ত হয় বটে, কিন্তু এখানকার জীবন্ত বিগ্রহ রামকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো দর্শন ক'রে ঘন ঘন দিব্য ভাবাবেশে তিনি আবিষ্ট হতে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শনের ফলেও মাঝে মাঝে

হয়ে পড়েন সংবিৎহাবা। ভক্ত ও সেবিকাদেব এজন্য প্রায়ই থাকতে হতো সন্ত্রস্ত হযে।

একদিন সবাই মিলে যমুনায় নৌকাযোগে ভ্রমণ কবছেন, জলেব দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ কবাব পব মহাভাবেব উদ্দীপনা হল। বাহ্যচৈতন্য হাবিযে সাবদামণি ঝাঁপ দিতে অগ্রসব হলেন যমুনাব গর্ভে। সঙ্গিনীবা সবাই তাঁকে ধবে ফেললেন, বহু চেষ্টায তাঁব বাহ্যজ্ঞান ফিবিযে আনা গেল।

ভক্ত সেবিকা গোলাপ-মা সেদিন অনুযোগেব সুবে বলেন, "মা-ঠাকরুন, তোমাব যদি বোজ বোজ এমন ভাবসমাধি হয তাহলে তোমাব দেহ থাকবে কি ক'বে? ঠাকুব বলতেন,—ঘন ঘন ভাবসমাধি হলে নবদেহ প্রায়ই তা সইতে পাবে না, ভেঙে যায়। ভয হচ্ছে, তুমি শান্ত না হলে, তোমায আমবা দেশে ফিবিযে নিতে পারবো না। ভক্তদেব কাছে মুখ দেখাবো কি ক'বে?

এক বৃদ্ধ সাধু প্রাযই কালাবাবুব কুঞ্জে মাধুকবী কবতে আসতেন। চোখে মুখে দিব্যলোকেব জ্যোতি ছডানো, সদা আনন্দময এক মহাপুরুষ তিনি। সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা কবতেন। একদিন সাবদামণিব এক সঙ্গিনী সাধুটিকে নিভৃতে ডেকে নিযে বলেন, "বাবা, তুমি এমন একটা মন্ত্র জপ কবো, যাতে আমাদেব মাযেব শোক নিবাবণ হয। আমবা তাঁকে নিযে বড বিপদে পডেছি।"

সাধুজী হেসে উত্তব দেন, "এই মাঈব আবাব শোক কি? ওকে স্পর্শ কবলে সব কিছু শোক জ্বালাব বিনাশ হয। না,—না, মাঈব কোনো শোক নেই।"

গোলাপ-মা এ মন্তব্যে সন্তুষ্ট নন। প্রশ্ন কবেন, "বাবাজী, তবে আমাদেব মা এমনতব হযে থাকেন কেন?"

"মাঈ যে হববখত তাঁব পিয়াকে দেখতে পান, তাই তো এমন উন্মনা ও বিবাগী হযে থাকেন। আবো কিছুকাল এমনিভাবে কাটবে। তাবপব ইনি ভাণ্ডাব উজাড ক'বে দেবেন সব্বাইকে।"

এবাব সাবদামণিব জীবনে উন্মোচিত হয এক নূতনতব অধ্যায।

নিজের উত্তর-সাধিকা ও সঙ্ঘমাতা রূপে যে অধ্যাত্মজীবনকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রস্তুত ক'রে গিয়েছেন, অদৃশ্য সূক্ষ্মলোক থেকে আসতে থাকে তারই ইঙ্গিত ও নির্দেশ। যোগেন-মা সারদামণির ভক্তদের কাছে এর মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন[১] :

বৃন্দাবনে ঠাকুর একদিন মাকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যোগেনকে (স্বামী যোগানন্দকে) এই মন্ত্র দাও।"

প্রথম দিন মা তাঁর ঐ দর্শন মাথার গোলমালে হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ দেখিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। তৃতীয় দিন ঐ দর্শন আবার উপস্থিত হইলে মা ঠাকুরকে বলেন, "আমি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না, কি ক'রে মন্ত্র দিই।"

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি মেয়ে যোগেনকে (আমাকে) বলো, সে থাকবে।"

মা আমার দ্বারা যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার মন্ত্র হইয়াছে কিনা।

যোগানন্দ স্বামী বলিলেন, "না মা, বিশেষ কোনো ইষ্টমন্ত্র ঠাকুর আমায় দেন নাই। আমি নিজের রুচিমত একটি নামজপ করি।"

ঐ কথা জানিয়া মা তাঁহাকে একদিন মন্ত্র দিলেন। ঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষ রক্ষিত কৌটা সম্মুখে রাখিয়া মা পূজা করিতেছিলেন। তিনি যোগানন্দ স্বামীকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন। পূজা করিতে করিতে মায়ের ভাবাবেশ হইল, সেই ভাবাবেশেই মা মন্ত্র দিলেন।

বৃন্দাবন, মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের তীর্থগুলি দর্শনের পর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে সারদামণি হরিদ্বার, জয়পুর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে উপনীত হন।

মনে গোপন ইচ্ছে ছিল তীর্থরাজ প্রয়াগে গিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান তর্পণ ক'রে সেখানকার পবিত্র নীরে বিসর্জন করবেন নিজের

১ মায়ের কথা, ১ম খণ্ড (উদ্বোধন)

কেশদাম। এটা তাঁব মনে এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিল, কাউকে প্রকাশ ক'বে বলেন নি।

স্নানেব পূর্ববাত্রে শয্যায শুযে আছেন। সহসা শুনতে পেলেন ঠাকুব বামকৃষ্ণেব কণ্ঠস্বব—লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।

ঠাকুরেব ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী সাবদামণিব সঙ্গিনী ও সেবিকা হযে তীর্থে এসেছে, তাঁকে ডাকছেন ঠাকুব গম্ভীব বেদনাহত কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে সাবদামণি প্রত্যক্ষ কবলেন ঠাকুবেব অলৌকিক মূর্তি। দুই বাহু বিস্তাব ক'বে দবজাটি ধবে তিনি দাঁড়িযে আছেন, তাবপবেই চকিতে কোথায় মিলিযে গেলেন।

কেন ঠাকুবেব এই আকস্মিক আবির্ভাব। কেনই বা তাঁব কণ্ঠস্বরে এই বিষাদেব সুর? সাবদামণি উপলব্ধি কবলেন, কেশদাম কর্তন করা ও সঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া ঠাকুবেব মত নয়। তিরোধানের পব সোনাব বালা উন্মোচন কবাব সময যে মনোভাব নিযে তিনি বাধা দিযেছিলেন, সেই মনোভাবেবই ইঙ্গিত নিহিত বযেছে তাঁব এই অলৌকিক আবির্ভাব ও বিষণ্ণ কণ্ঠস্ববে। তাই কেশদাম বিসর্জন দেওযা আব হযে উঠল না।

তীর্থ দর্শনেব পব সাবদামণি কলকাতায প্রত্যাবর্তন কবলেন, তাবপব চলে এলেন কামাবপুকুব। কামাবপুকুবের এই দিনগুলি ছিল নানা সমস্যায কণ্টকিত। বিশেষ ক'রে এ সময চবম আর্থিক দুর্গতিব মধ্যে তাঁকে দিন যাপন কবতে হয়েছে, অথচ কলকাতাব ভক্তদেব এ বিষযে ঘুণাক্ষবেও এ সম্পর্কে একটি কথা তিনি জানতে দেন নি। নীববে অবলীলায এই দুঃখকে বরণ ক'বে নিযেছেন ভবিতব্যেব বিধানরূপে।

সাবদামণি সাধাবণ বিধবাব বেশ ধাবণ কবেন নি, মাথায কেশদাম বযেছে, হাতে বযেছে সোনাব বালা, পবনে সরুপাড শাড়ী। তাই গ্রাম্য সমাজে এ নিযে নানা কথাব বটনা হযেছে, গঞ্জনাও কিছুটা তাঁকে সহ্য কবতে হযেছে।

শ্বশুরের ভিটেয় বাস করতে এসে সাবদামণিকে কম পরীক্ষাব সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু এ সময়ে ঠাকুব বামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শন ও নির্দেশ বার বাব তাঁকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেছেন ঃ

কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসবাব পব, তখন সব লোকেব ভয়ে—'এ ও বলছে, ও তা বলছে'—হাতেব বালা খুলে ফেললুম। আব ভাবতুম গঙ্গাহীন স্থানে কি ক'বে থাকব। গঙ্গা-স্নানে যাব মনে কবলুম। তাছাড়া, আমাব ববাববই একটা গঙ্গাবাই ছিল। একদিন দেখি কি, সামনেব বাস্তা দিযে ঠাকুব আসছেন আগে আগে (ভুতিব খালেব দিক থেকে), পিছনে নবেন, বাবুবাম, বাখাল, সব যত ভক্তেরা, কত লোক। দেখি কি ঠাকুরেব পা থেকে জলেব ফোয়াবা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে—এই জলেব স্রোত। আমি ভাবলুম, দেখছি ইনিই তো সব, এঁব পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা। আমি তাড়াতাড়ি বঘুবীবেব ঘবেব পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুটো মুটো ফুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায দিতে লাগলুম। তাবপব ঠাকুব আমায় বললেন, তুমি হাতের বালা ফেলো না। বৈষ্ণব-তন্ত্র জানো তো? আমি বললুম, 'বৈষ্ণব তন্ত্র কি? আমি তো কিছু জানি নে।' তিনি বললেন, 'আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তাব কাছে শুনবে।' সেই দিনই বৈকালে গৌবদাসী এল। তাব কাছে শুনলুম, 'চিন্ময স্বামী।'

এই সময়ে সাবদামণিব অর্থকষ্ট সম্পর্কে ব্রহ্মচারী অক্ষযচৈতন্য লিখেছেন, "দক্ষিণেশ্বব কালীবাড়িতে ঠাকুবেব সেবাব জন্য যে টাকা ববাদ্দ ছিল, সেই টাকা সম্বন্ধে খাজাঞ্চীকে তিনি একসমযে বলিয়াছিলেন, 'যদি ওকে দাও তো দাও, তা না হলে গঙ্গার জলে ফেল, কি অতিথিসেবায দাও—যা তোমাদেব ইচ্ছে কব।' তখন হইতে মাকে প্রতিমাসে সাতটাকা কবিয়া দেওযা হইত। ঠাকুবেব তিবোভাবেব পব কালীবাড়িব দীনু খাজাঞ্চী ও অন্যান্য সকলে

বিরুদ্ধাচরণ করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দেয়। নরেন্দ্রনাথ ঐরূপ না করিবার জন্য তাহাদিগকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে পত্রে সে কথা অবগত হইয়া মা বলিয়াছিলেন, 'বন্ধ করেছে 'করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আমি কী করব।'

"লক্ষ্মীদেবীর উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীশ্রীমার ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য ঠাকুর বলরাম বসুর কাছে কয়েকশত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। বলরাম উহা নিজেদের জমিদারিতে খাটাইয়া ছয়মাস অন্তর মাকে ত্রিশ টাকা করিয়া সুদ দিতেন। পরে মা সেই মূল টাকা দিয়া ৺জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য জমি কেনার ব্যবস্থা করেন।"

দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এসময়কার দুঃখ দৈন্যের ক্লেশ সারদামণিকে যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করতে হয় এবং তিনি তা সহ্য ক'রে যান অকুতোভয়ে অম্লান বদনে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকা কালেই পত্নীকে বলে রেখেছিলেন, "তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে, শাক ভাত খাবে, আর হরিনাম করবে।"

একথাটি সারদামণি বিস্মৃত হন নি, তাই দারুণ অর্থাভাবের দিনেও তাঁকে কখনো বিচলিত হতে দেখা যায় নি।

অনেক সময়ে বাড়িতে অপর কোনো লোক থাক্‌তো না, একলাটি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন নির্বান্ধব অসহায়ের মতো। এমন দিনও গিয়েছে যে, শুধু ছুটি ভাত সেদ্ধ ক'রে খেতেন, নুন কেনারও পয়সা জোটে নি।

যোগীন মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি যাঁরা উত্তরকালে তাঁর সেবা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা যখন ঠাকুরের অদর্শনে ধরেছেন তীব্র বৈরাগ্যের পথ, প্রাণের বেদনায় ছটফট করছেন আর তীর্থ দর্শন ক'রে বেড়াচ্ছেন। স্বামী সারদানন্দ কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, "আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মার নুনটুকুও জোটে নি।"

কামারপুকুরে প্রায় এক বৎসর এভাবে সাবদামণি অবস্থান করেন, তারপব ভক্তেরা বেলুড়ে নীলাম্বববাবুব ভাড়াটে বাড়িতে তাঁকে প্রায় ছয় মাস কাল এনে বাখেন, তাঁব সান্নিধ্য পেয়ে নিজেবাও কিছুটা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। এই মাতৃমূর্তিকে কেন্দ্র ক'বে দেখা দেয সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকবাব নূতন প্রেবণা।

গ্রাম-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হযে এসে কলকাতায থাকতে হবে, একদল তরুণ ভক্তেব মধ্যে বসবাস কবতে হবে সাবদামণিকে। এ নিযে কামারপুকুবে বাদবিতর্ক কম হয নি।

সারদামণিব মুখ থেকে আমরা জানতে পাবি, "ঠাকুব চলে যাবাব পব আমাব যখন এখানে (কলিকাতায) আসবাব কথা হল, তখন আমি বযেছি কামাবপুকুবে। ওখানকাব অনেকেই বলতে লাগল, 'ওমা, সে কিগো, সেই সব অল্প বয়সেব ছেলে, তাদেব মধ্যে কি থাকবে।' আমি তো মনে জানি, এখানেই থাকব। তবু সমাজ কি বলে একবার শুনতে হয বলে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কেউ কেউ আবাব বলতে লাগল, 'তা যাবে বই কি ; তাবা সব শিষ্য।' আমি শুধু শুনি। পবে আমাদেব গাঁয়ে একটি বৃদ্ধা বিধবা আছেন, তিনি (লাহাদেব প্রসন্নময়ী) ভাবি ধার্মিকা ও বুদ্ধিমতী বলে সকলে তাঁব কথা মানে, আমি তাঁকে গিযে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি কি বল?' তিনি বললেন, 'সে কি গো? তুমি অবিশ্যি যাবে। তাবা শিষ্য, তোমাব ছেলেব মতো। একি একটা কথা। যাবে বই কি।' তাই শুনে তখন অনেকে যাবাব মত দিলে। তখন এলুম।"

বেলুড়ে ভাড়াটে বাড়িতে বাস করাব সময় সাবদামণির মনে ইচ্ছে জাগ্রত হয—পঞ্চতপা অনুষ্ঠান করবেন। এসময়কার স্মৃতিচাবণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

"ঠাকুর চলে যাবাব কিছুকাল পর থেকে প্রায়ই দেখতুম দাড়িটাড়িওয়ালা এক সন্ন্যাসী আমায় পঞ্চতপা করবার কথা বলতেন। প্রথম প্রথম তেমন একটা খেয়াল করি নি, পঞ্চতপা কি তাও তত

জানতুম না। তিনি ক্রমেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তারপর যোগেনকে (যোগেন মা) পঞ্চতপার কথা জিজ্ঞাসা করায় যোগেন বললে, 'বেশ তো, মা, আমিও করব।' পরে পঞ্চতপার যোগাড় করা হল। তখন বেলুড়ে ছিলুম নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। চারিদিকে ঘুঁটের আগুন, উপরে সূর্যের প্রখর তেজ। প্রাতে স্নান ক'রে কাছে গিয়ে দেখি—আগুন গমগম ক'রে জ্বলছে। প্রাণে বড়ই ভয় হল, কি ক'রে ওর ভেতর যাব, আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে বসে থাকব। পরে ঠাকুরের নাম ক'রে ঢুকে দেখি আগুনের কোনো তেজ নেই। এইভাবে সাতদিন কাজ করি। কিন্তু বাবা শরীরের বর্ণ যেন কাল ছাই হয়ে গিয়েছিল। এরপর আর সে সন্ন্যাসীকে দেখি নি।"

এসময়ে সারদামণির আত্মিক জীবনে একটা সংঘটিত হচ্ছে বিরাট রূপান্তর। নানা দিব্যদর্শন এবং দিব্য ভাবাবেশও ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে।

ভক্তদের স্মৃতিচারণে এ সম্বন্ধে তথ্য সংকলিত হয়েছে[১]

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে শ্রীশ্রীমার গভীর নির্বিকল্প সমাধি হয়। বহুক্ষণ পরে একটু হুঁশ হইলেও হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান অতি কষ্টে আসিয়াছিল। মা কপিল মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "এই সময় লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি, এই সব জ্যোতিতে মন লীন হত। আর দু-চারদিন এভাব থাকলে দেহ থাকত না।"

এই বাড়িতেই মা একদিন দেখেন যে, ঠাকুর গঙ্গায় গিয়া নামিলেন। তখনি গঙ্গাজলে তাহার দেহ গলিয়া গেল। স্বামীজী "জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া সেই জল দুই হাতে চারিদিকে অসংখ্য লোকের মাথায় ছিটাইয়া দিতেছেন, আর তাহারা ঐ জলস্পর্শে সদ্য মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। এত লোক যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। এই দৃশ্য মায়ের মনে এতই গাঁথিয়া গিয়াছিল

১ মায়ের কথা, ২য় খণ্ড (উদ্বোধন)

যে কয়েকদিন কিছুতেই গঙ্গায় নামিতে পারে না। বলিতেন, "এযে ঠাকুরের দেহ, কি ক'রে আমি এতে পা দিই?"

তপস্যার অসামান্য সিদ্ধি ও আত্মিক জীবনের অনিবার্য প্রকাশ যেমন সারদামণির জীবনে এসময়ে ঘটতে থাকে, তেমনি দেখা দেয় তাঁকে ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্মের জন্য সংসারের দিকে টেনে রাখার প্রয়োজনীয়তা। ঈশ্বরীয় বিধানে অচিরে এ প্রয়োজন মিটতে দেখা যায়, নূতন এক মায়িক সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে। সারদামণির নিজের কথায় পাই :

"ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারে আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন হুহু করছে, আর প্রার্থনা করছি, 'আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে। সেই সময় হঠাৎ দেখলাম, লালকাপড়-পরা দশ-বার বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, 'একে আশ্রয় ক'রে থাকো। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে। পরক্ষণেই তিনি অন্তর্ধান হলেন, মেয়েটিকেও আর দেখতে পাই নি।"

অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে যে মেয়েটিকে সারদামণি দেখছিলেন, সেটি তাঁর ভ্রাতার কন্যা রাধু। সে তখন শিশু, পিতা ইহলোক ত্যাগ করেছেন, মাতা উন্মাদ। একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ অলৌকিকভাবে দর্শন দিলেন সারদামণিকে, ঐ শিশুটির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত ক'রে বললেন, "ঐ সেই মেয়েটি, যার কথা আগে তোমায় বলেছিলাম। একে অশ্রয় ক'রে থাকো, এটি যোগমায়া।"

এই পালিত কন্যা রাধুর পাগলামি ও দৌরাত্ম্য সারদামণি সহ্য করতেন অসীম ধৈর্য নিয়ে। এটিকে কেন্দ্র ক'রেই মন তাঁর নীচুতে নামতো, মানুষের সুখদুঃখময় সংসারে জীবনের সঙ্গে তাঁর দিব্য-সত্তার কিছুটা যোগাযোগ রক্ষিত হতো, সেই সুযোগে সহস্র সহস্র ভক্ত লাভ করতেন সারদামণিকে তাঁদের নিজ নিজ জীবনের কেন্দ্রবিন্দুরূপে।

সেবিকা যোগেন-মার মনে একবার সারদামণি সম্পর্কে সংশয় আসে। ভাবেন 'ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন, আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারীর মতন—ভাই, ভাই-পো, ভাই-ঝিদের জন্য অস্থির। কিছুই বুঝতে পারিনে।'

একদিন গঙ্গার ঘাটে নিবিষ্ট হয়ে তিনি ধ্যান করছেন, হঠাৎ পেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শন। দেখলেন, তিনি সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, "ছাখো, গঙ্গায় ওটা কি ভাসছে।"

যোগেন-মা তাকিয়ে দেখেন, একটি সদ্যোজাত শিশু নাড়িভুঁড়ি জড়ানো অবস্থায় স্রোতে ভেসে চলেছে।

ঠাকুর পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "গঙ্গা কি কখনো অপবিত্র হয়, না তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকে তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না, ওকে আর একে (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে) অভেদ বলে জানবে।"

গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে এসেই যোগেন-মা ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন সারদামণির চরণে। অনুতাপের সুরে বললেন, "মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সারদামণি বললেন, "কেন যোগেন, কি হয়েছে বলো তো?"

যোগেন-মা আনুপূর্বিক সব কিছু বর্ণনা ক'রে বললেন, "মা, তোমার ওপর অবিশ্বাস এসেছিল। তাই আজ ঠাকুর আমায় তোমার স্বরূপে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।"

স্মিত হাস্যে সারদামণি বললেন, "তার আর কি হয়েছে? অবিশ্বাস তো আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম ক'রেই তো বিশ্বাস হয়। এই রকম হতে হতে শেষটায় পাকা বিশ্বাস আসে।"

বেলুড়স্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান উদ্যোক্তা ও স্থাপয়িতা—স্বামী বিবেকানন্দ। একথাটি ইতিহাসসম্মত। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে, আছে অন্তরালচারী ভাবনা ও শক্তির ক্রিয়া।

স্বামীজীর বিরাট কর্মোদ্যোগের পেছনে সঙ্ঘমাতা সারদামণির প্রেরণা এবং আশীর্বাদ ছিল অতিমাত্রায় কার্যকরী। সারদামণির বাৎসল্য-রসের প্রচ্ছন্ন ধারায় পুষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল মণ্ডলী, মঠ ও মিশন। এ সম্পর্কে উত্তরকালে তিনি বলতেন।

"আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ ক'রে কয়েকদিন একটা আশ্রয় ক'রে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, ঠাকুর তুমি এলে, এই ক'জনকে নিয়ে লীলা ক'রে, আনন্দ ক'রে, চলে গলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট ক'রে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনক সাধু ভিক্ষা ক'রে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম ক'রে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি কখনো দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাতকাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসার তাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে।"

পুরাতন স্মৃতি মন্থন ক'রে সারদামণি একদিন বলেছিলেন:

আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপরে ঐ জায়গাটিতে—সেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন। (তখন মঠ হয় নাই)। মঠের নূতন জমি কেনা হলে পর নরেন একদিন আমায় নিয়ে জমির চতুঃসীমা

ঘুরে ঘুরে দেখালে, বললে, 'মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

"বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র,- কোনো অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত।' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল।

"একদিন নরেন এসে বললে, 'মা, এই—১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনও বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন।"

ভক্ত অরূপানন্দের সঙ্গে সারদামণির সংলাপ কথোপকথন চলছিল মঠ ও মিশনের কর্মময় ভূমিকা সম্পর্কে। তিনি প্রশ্ন করলেন, কেউ কেউ বলেন, মঠের সেবাশ্রম, হাসপাতাল, বইবেচা, হিসাব-নিকাশ, প্রভৃতি সাধুরা যে করছে, এ ভাল নয়। ঠাকুর কি এসব কিছু করেছিলেন? নূতন নূতন যারা ব্যাকুলতা নিয়ে মঠে ঢুকছে, তাদের ঘাড়ে এই সব কর্ম চাপিয়ে দিচ্ছে। কর্ম করতে হয়তো পূজা জপ, ধ্যান, কীর্তন—এই সব করবে। অন্য সব কর্ম বাসনায় জড়িয়ে ঈশ্বর থেকে বিমুখ করে।"

উত্তরে মা বললেন, "তোমরা ওদের কথা শুনো না। কাজ না করলে দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যান জপ করা যায়? ঠাকুরের কথা বলছে—তাঁর সব আলাদা। আর তাঁর মাছের ঝোল, ঘিয়ের বাটি, মথুর যোগাত। এখানে একটি কাজ নিয়ে আছে বলে খাওয়াটি জুটছে। নইলে দুয়ারে দুয়ারে কোথায় একমুঠোর জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? শরীরে অসুখ হয়ে পড়বে। আর কেই বা এখন সাধুদের এত ভিক্ষা দিচ্ছে? তোমরা ওসব কথা কিছু শুনো না। ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।"

শান্ত, নির্বিরোধী মমতাময়ী সারদামণির চরিত্রের আর একটি

দিক ছিল বজ্রকঠোর। তাঁর জীবনে এর প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছে। কামারপুকুরে থাকতে একবার উন্মাদ রোগগ্রস্ত ভক্ত হরিশকে নিয়ে তিনি মহাসংকটে পতিত হন। সে সময়ে যে পাষণ্ড-দলনী উগ্র-মূর্তি নিয়ে তিনি রুখে দাঁড়ান, তা নিজমুখেই তিনি বিবৃত করেছেন ঃ

"হরিশ এইসময় কামারপুকুর এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি। এসে বাড়ির ভিতর যেই ঢুকছি অমনি হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটছে। হরিশ তখন ক্ষেপা—পরিবার পাগল ক'রে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই—আমি কোথায় যাই? তাড়াতাড়ি ধানের হামারের (তখন ঠাকুরের জন্মস্থানের পাশে ধানের গোলা ছিল) চারিদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আর আমি পারলুম না। তখন আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ ক'রে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিয়েছিল।"

সেদিনকার এই শাসনের ফলে হরিশ শান্ত হয়ে যান। তারপর সারদামণির শিষ্য সেবকদের ভয়ে বৃন্দাবনে চলে যান। কিছুদিন পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সমর্থ হন।

কামারপুকুরে জয়রামবাটীতে যে ভক্ত শিষ্যেরা মায়ের চরণ দর্শন করতে যেতেন, মায়ের আশীর্বাদের সঙ্গে তাঁর স্নেহ ও সেবা পরিচর্যাও লাভ করতেন তাঁরা।

সারদামণি সেদিন স্বহস্তে রান্নাবান্না ক'রে ভক্তদের পরিতোষ সহকারে খাইয়েছেন, তারপর তাঁদের এঁটো বাসন নিয়ে চলেছেন পুকুরে ধোবার জন্য। এক ভক্ত এগিয়ে এসে বাধা দিলেন, বললেন,

"একি করছেন মা, আপনি আমাদের এঁটো পরিষ্কার করছেন, এতে যে আমাদের পাপ হবে।"

সহজ কণ্ঠে, স্নেহভরে তিনি উত্তর দেন, "বাবা, আমি যে মা।

আমি এ সব করবো না তো কে করবে? "শিশু মায়ের কোলে বসে কত কিছু ময়লা ফেলে, মাকেই তো তা নিকোতে হয়।"

সকল মানুষ নারায়ণের অংশ, আর মানবীয় দিক থেকে দেখলে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই সারদামণির সন্তান, জীবনভর এই পরম বোধটি জাগ্রত ছিল তাঁর ভেতরে সহজাত।

আমজাদ নামে এক মুসলমান বাস করতো জয়রামবাটীর পাশের গাঁয়ে। কৃষাণ খেটে তার দিন চলতো এবং সুযোগ মতো দুই একটি চুরি ডাকাতি ক'রে আয় বাড়িয়ে নিতেও তার আপত্তি ছিল না। গাঁয়ের লোকে স্বভাবতই তাকে ভয় করতো, এবং এড়িয়ে চলতো।

আমজাদের সঙ্গে সারদামণির পরিচয় ঘটে যখন সে তাঁর বাড়ির দেয়াল তৈরি করার কাজে মজুর খেটেছিল। তারপর থেকেই এই দুর্ভাগা মানুষটির ওপর তাঁর স্নেহধারা নিপতিত হয়। যে কোনো অভাব অনটনে বা পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আমজাদ তাঁর স্নেহময়ী মায়ের শরণ নিত। এবং তিনিও তাকে সাহায্য করতেন অকুণ্ঠচিত্তে।

আমজাদ একদিন বারান্দায় খেতে বসেছে। আর বাড়ির মেয়েরা তাকে পরিবেশন করছে উঠোনে দাঁড়িয়ে, দূর থেকে। সারদামণি ব্যথিতা হয়ে বললেন, অমন ক'রে দিলে কি মানুষের পেট ভরে, না সুখ হয়? তোরা না পারিস, আমি দিচ্ছি।"

আমজাদকে শুধু পরিতোষ ক'রে খাওয়ানোই হল না, নিজ হাতে তার এঁটোপাতা তুলে ফেলে, জল দিয়ে সারদামণি তা ধুয়ে পরিষ্কার করলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রী মন্তব্য ক'রে বসল, "পিসিমা, এ তুমি কি করছো? তোমার যে জাত গেল।"

তিরস্কার ক'রে সারদামণি বললেন, "ছ্যাখ, আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমনি ছেলে।"

সারদানন্দ অনন্য নিষ্ঠায় সারদামণির সেবা পরিচার্যা ক'রে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আখ্যাত হয়েছিলেন মায়ের 'ভারী'রা ভার-বাহীরূপে, সারদামণি নিজেও বলতেন 'শরৎ আমার মাথার মণি।' অখণ্ড মাতৃত্বের পরম বোধে যিনি উদ্বোধিত তাঁর দৃষ্টিতে ত্যাগী সাধক ভক্ত সারদানন্দ ও দাগী আসামী আমজাদের ভেদরেখা যে সত্যিই নেই।

ঘরে খাবার না থাকলেই আমজাদ বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে মায়ের সামনে উপস্থিত হয়, চব্যচোষ্য খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে প্রস্থান করে। মাথার রোগে প্রায়ই সে ভোগে, তাই নিজের মাথার ঔষধি-তেলের শিশিটিই অন্যের অলক্ষ্যে মা তাকে পাচার ক'রে দেন। জয়রামবাটীর সবাই আমজাদকে ভয় করতো, এড়িয়ে চলতো, কিন্তু সারদামণির দৃষ্টিতে সে ছিল যেন একটি দুর্ভাগা শিশু।

বেশ কিছুদিন আমজাদ আসেনি। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, মায়ের জন্য এক ঝুড়ি ফল নিয়ে সে উপস্থিত।

"কি ব্যাপার? আমজাদ এতদিন তোমার দেখা পাই নি কেন?" কোথায় ছিলে বলতো!" মা সস্নেহে প্রশ্ন করেন।

মায়ের কাছে আমজাদ অকপট। মৃদুস্বরে জানায়, সম্প্রতি একটা গরুচুরির দায়ে তাকে হাজতে থাকতে হয়েছিল, তাই দেখা সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নি।

"তাইতো ভাবছিলুম। আমাদের আমজাদের দেখা নেই কেন?" স্নেহ ও সহানুভূতি ঝরে পড়ে সারদামণির কথায়।

একবার আমজাদ ডাকাতির অভিযোগে ধরা পড়লে সারদামণি বলেছিলেন, "আমি বরাবরই জানতুম, ডাকাতিটা আমজাদের বেশ জানা আছে।

পাপকে ঘৃণা করলেও পাপীর জন্য বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণা বা রোষ তাঁর অন্তরে কোনোদিন স্থান পায় নি।

বিনোদ সোম নামে মহেন্দ্র গুপ্তের (শ্রীম) এক ছাত্র ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি থিয়েটারে যোগ দেন

এবং কুসংসর্গে পড়ে মদ্যপান শুরু করেন। সারদানন্দজীর সঙ্গে এক সময়ে এর হৃদ্যতা ছিল এবং ইনি তাকে 'দোস্ত' বলে ডাকতেন।

গভীর রাত্রে বিনোদ প্রায়ই সারদামণির বাগবাজারস্থিত আশ্রমের পাশ দিয়ে বাড়িতে ফিরতেন, আর 'দোস্ত, দোস্ত' বলে চেঁচামেচি শুরু করতেন। এতরাত্রে সারদামণির ঘুম ভাঙবে ভয়ে সারদানন্দ বা আর কেউ তাঁর ডাকে কখনো সাড়া দিতেন না।

সেদিন তারস্বরে অনেক ডাকাডাকিতেও যখন কেউ দরজা জানালা খুলল না, নেশাগ্রস্ত বিনোদ ভাবল, সাধু শালাদের আর তোয়াক্কা রাখবো না, যাঁকে আশ্রয় ক'রে ওরা পড়ে আছে, সেই মা-সারদামণিকেই বরং আজ থেকে ডাকবো।' সঙ্গে সঙ্গে সে শুরু করে দিল সুউচ্চ কণ্ঠের সংগীত—

> উঠগো করুণাময়ী, খোল গো কুটির দ্বার।
> আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার॥
> তারস্বরে ডাকিতেছি—তারা তোমায় কতবার।
> দয়াময়ী হয়ে আজ একি কর ব্যবহার॥
> সন্তানে রেখে বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে।
> মা-মা বলে ডেকে মোর হলো অস্থিচর্মসার॥

হঠাৎ দেখা গেল সারদামণির ঘরের বাতায়নটি খুলে গেল। দুই হাত উঁচু ক'রে বিনোদ বললে, উঠেছো মা, ছেলের ডাক শুনেছো? পেন্নাম নাও, মা পেন্নাম নাও।" সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল রাস্তার ধুলোয় তাঁর গড়াগড়ি।

তারপর আবার শুরু হল বাজখাঁই আওয়াজে উল্লাসজ্ঞাপক অধ্যাত্ম-সংগীত—

> যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
> (মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি,
> আর যেন কেউ না দেখে॥

এই সঙ্গে আশ্রমের সাবধানী পরিচালক এবং বিনোদের পুরাতন

বন্ধু স্বামী সারদানন্দের উদ্দেশ ক'রে আখর দেওয়াও বাদ গেল না—
"আমি দেখি, দোস্ত না দেখে।"

পরের দিন ভোরে উঠেই সারদামণি প্রশ্ন করলেন, 'ছেলেটি কে গা ?"

সাধুরা তাঁর খ্যাতি অখ্যাতি দুয়েরই পরিচয় দিলেন। সারদামণি সহাস্যে বললেন, "দেখেছো, আসল জ্ঞানটুকু কিন্তু টনটনে।"

বিনোদ আরো দু-একদিন গভীর রাতে সারদামণিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল, তাঁর দর্শনও পেয়েছিল। অতঃপর ভক্তেরা বললেন, "মা, তুমি আর কখনো ঐ মাতালটার ডাকে ঘুম ভেঙে শয্যা ছেড়ে উঠে এসো না।"

কৃপাময়ী অসহায়ার মতো উত্তর দিলেন, "ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে।"

কিছুদিন পরেই বিনোদ মারাত্মক উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যান। রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতে করতে দেহান্ত হয়।

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ, সেদিন সারদামণির ভবনে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে। এর আগে প্রণাম করেছেন বহুবার, কিন্তু গুণ্ঠনাবৃতা মায়ের শ্রীমুখ দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি।

গিরিশ দিব্যভাবে বিভোর, সমস্ত অঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছে। মায়ের চরণ মস্তক স্পর্শ করিয়ে যেই উপরের দিকে তাকিয়েছেন, অমনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, "এ্যাঁ, মা তুমি !"

গিরিশের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিজড়িত ছিল সেদিনকার এই বিস্ময়ের সঙ্গে। বহু পূর্বের কথা। যুবক গিরিশ একবার মারাত্মক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকেরা তাঁর প্রাণ রক্ষার বিষয়ে তখন প্রায় হতাশ। এ সময়ে হঠাৎ তিনি স্বপ্ন দেখলেন, এক দিব্য মমতাময়ী মাতৃমূর্তি মহাপ্রসাদ এনেছেন তাঁর

মুখের কাছে, স্নেহভরে বলছেন, 'বাবা, এটা খেয়ে ফেল। কোনো ভয় নেই তোমার।'

দেবীর পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, সারা অঙ্গ এক অপার্থিব জ্যোতিতে ঝলমল করছে, আননে অপার করুণা ও স্নেহ। তাঁর প্রদত্ত সে প্রসাদের মধুময় আস্বাদ আজো গিরিশ ভুলতে পারেন নি।

দৈবী স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু তখনও মানসপটে সেই দেবীমূর্তি রয়েছেন দীপ্যমান। তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর ও করুণার স্মৃতিতে সারা মনপ্রাণ ভরে উঠল। সংকট সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল, তিনি আরোগ্য-লাভ করলেন।

গিরিশ দেখলেন, স্বপ্নেদৃষ্ট সেদিনকার সেই দেবী আজ তাঁর সম্মুখে। এর আগে বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকা মায়ের মুখ তিনি দর্শন করতে সমর্থ হন নি। আজ উপলব্ধি করলেন, এই দেবী মানবীই সতত তাঁকে রক্ষা ক'রে আসছেন। তবু মায়ের নিজের মুখে সত্য কথাটি জেনে নিতে তিনি উৎসুক হলেন। বাইরে এসে অপরের দ্বারা প্রশ্ন ক'রে পাঠালেন, গিরিশকে পূর্বে ঐ ভাবে মা কখনো দর্শন দিয়েছেন কিনা।

মা তা স্বীকার করলেন সংক্ষিপ্ত এক উত্তরের মাধ্যমে।

অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি হয় নি গিরিশের। তাই আর একদিন প্রশ্ন করে বসেছিলেন সারদামণিকে, "আচ্ছা সত্যি বলতো, তুমি আমার কি রকমের মা ?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর এল, "আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার মা নয়—সত্য জননী।"

গ্রাম্য জীবনে চির অভ্যস্তা, সরলা, শিক্ষাবিহীনা সারদামণির ব্যক্তিসত্তা ও অধ্যাত্মশক্তিকে উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে সহজ ছিল না। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তাঁর তত্ত্ব জানাতে এবং এই তত্ত্বটিকে শেষের কয়েকটি বৎসরে ঘনিষ্ঠ পার্ষদদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ক'রে দিতে ভুল করেন নি।

'ও সাবদা জ্ঞান দিতে এসেছে। ও আমাব শক্তি' ইত্যাদি মন্তব্যেব মধ্যে ঠাকুবেব ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। এ ইঙ্গিত ঘনিষ্ঠ ভক্ত পার্ষদ সবাই অনুধাবন কবেছিলেন, নিজেদেব ধ্যানধাবণা ও প্রত্যক্ষ দর্শনেব মধ্যে দিযে তাঁদেব মনোমুকুবে ধবা পড়েছিল মা সাবদামণির ভাবমূর্তি ও দিব্যচৈতন্যময সত্তা।

শিষ্যপ্রধান স্বামী বিবেকানন্দেব কথাই প্রথমে ধরা যাক। তাঁব তখন আমেবিকায় যাবাব সংকল্প প্রায় দানা বেঁধে উঠেছে। ভেবেছেন বিশ্বধর্মসভা উপলক্ষে চিকাগোতে যাবেন, সাবা আমেবিকায় প্রচাব কববেন ভাবতেব শাশ্বত বাণী, আব সে দেশ থেকে নিয়ে আসবেন দুঃখ দাবিদ্র্যক্লিষ্ট মাতৃভূমিব জন্য কল্যাণময় ঐহিক সাহায্য।

সংকল্প প্রায স্থিব কিন্তু এ বিষয়ে একেবাবে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হতে পাবেন নি স্বামীজী। ভাবলেন, 'আচ্ছা শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই শক্তি, তাঁব অংশস্ববূপিণী, তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয না? তিনি যেরূপ বলবেন, সেরূপই কববো।'

সাবদামণিব আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'বে এক পত্র প্রেরণ করলেন তিনি। দীর্ঘকাল পবে পবম স্নেহাস্পদ তনয়েব সংবাদ পেয়ে সারদামণি মহা আনন্দিত। কিন্তু এই সঙ্গে ভাবনায়ও পড়লেন, তার বিদেশ যাত্রা অনুমোদন কবা ঠিক হবে কিনা।

ঠাকুর বামকৃষ্ণেব তিবোধানেব পব বাব বাব সাবদামণি তাঁব দিব্যমূর্তিব দর্শন পেযেছেন, একাধিকবার তাঁব প্রিযতম শিষ্য নবেনেব স্বরূপ সম্বন্ধে সাবদামণিকে তিনি অবহিতও কবিয়েছেন। নবেনেব ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, ঈশ্বরীয কর্মেব বিবাট দায়িত্ব তার বযেছে, কিন্তু মা হযে পুত্রকে সুদূব সাগবপাবে যেতে কোন প্রাণে তিনি নির্দেশ দেবেন? মনে তাঁর নানা চিন্তা ও সংশয। এমন সময়ে এক বাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, ঠাকুব যেন সাগব তবঙ্গেব ওপব দিযে হেঁটে এগিযে চলেছেন আব নবেন কবছেন তাঁব অনুসরণ। অতঃপব সাবদামণিব মনে আব ভয় ভাবনা বইল না। সর্বান্তঃকবণে আশীর্বাদ জানিযে স্বামীজীকে পত্র দিলেন। স্বামীজীও মাযেব লিপি শিবোধার্য

ক'রে সোল্লাসে বলে উঠলেন, "আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল, মা'রও ইচ্ছা আমি যাই।"

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে বিবেকানন্দ সেদিন জননী সারদামণিকে দর্শন করতে গিয়েছেন। স্বামীজীর গুণকীর্তন ক'রে তিনি বললেন, 'বাবা, তুমি যা করেছ এমনটি কেউ করে নি।'

স্বামীজী বললেন, "এসব কী ছাইপাস বলচো মা ? এ সব আমি করিচি না তুমি করেচ ? তুমি ইচ্ছামাত্র আমার মতো লাখো বিবেকানন্দ করতে পার, তা কি আমি জানিনে ?" প্রিয় পুত্রের এ কথা শুনে সারদামণি হাসতে লাগলেন।[১]

স্বামীজীর কথাপ্রসঙ্গে সারদামণি একদিন বলেছিলেন, "বোসপাড়ার বাড়িতে আমরা আছি। শুনতে পাচ্ছি নিচের তলায় নরেন এসে গোলাপকে বলচে, গোলাপমা, আমার বড় খিদে পেয়েচে।' গোলাপ গোটাকতক মিছরির টুকরো নিয়ে নরেনের হাতে দিয়েচে। নরেন তো রেগেই খুন। আমি একটা থালায় ক'রে খাবার পাঠিয়ে দিলুম। নরেন খায় আর বলে, 'একেই বলি মা। ঠাকুর আঙুলে দেখিয়ে এইটি আমার বাবুরাম খাবে, এইটি আমার ও খাবে', বলতেন। পূজক বামুনের মেয়ে মা কেমন ক'রে এমন হল আমি বুঝতে পাচ্ছি না।[২]

কাশ্মীরে তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সেবার অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করলেন, তারপর ফিরে এলেন বেলুড়মঠে। শরীর তাঁর তখন মোটেই ভালো যাচ্ছে না। মহাষ্টমী পূজার দিনে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আর দুইজন ভক্ত সাধুসহ বাগবাজারে মা-সারদামণিকে দর্শন করতে গেলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে জোড় হস্তে উঠে দাঁড়ালেন। সন্তানদের সম্মুখে সারদামণি তখনো অবগুণ্ঠনবতী হয়েই প্রায় সময়ে কথাবার্তা বলেন। এক কোণে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর মৃদু ভাষণ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেন।

---

১ শ্রীশ্রীসারদাদেবী : ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

২ ঐ

মায়েব আশীর্বাদ লাভেব পর আদরেব কৃতী সন্তান ক্ষুব্ধস্বরে অভিযোগ জানালেন। "মা এই তো তোমাব ঠাকুব। কাশ্মীবে এক ফকিবের চেলা আমাব কাছে আসত যেত বলে ফকিব শাপ দিলে, 'তিনদিনেব ভেতব ওকে উদবাময়ে এখান ছেড়ে যেতে হবে।' আব কিনা তাই হল—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না। তোমাব ঠাকুব কিছুই করতে পাবলেন না।"

সাবদামণি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "বিছা। বিছা মানতে হয় বই কি বাবা। তাঁবা তো আব ভাঙতে আসেন না। জানতো আমাদেব ঠাকুব হাঁচি টিকটিকি পর্যন্ত মেনেছেন। শঙ্কবাচার্যও তো শুনতে পাই নিজেব শবীবে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জান খুড়তুত দাদার (হলধাবীব) অভিসম্পাতে ঠাকুবেব মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তোমার শবীবে অসুখ আসা আব ঠাকুরেব শরীবে অসুখ আসা একই কথা।"

স্বামীজী তখনও অভিমান ভবে বলছেন, "তা মা, তুমি যাই বলো না কেন, আমি মানতে রাজী নই। আসলে তোমাব ঠাকুর তেমন কিছুই নন।"

গুরুগত প্রাণ, প্রিয়তম অধ্যাত্মতনয় বিবেকানন্দেব প্রকৃত স্বরূপ সাবদামণিব অজানা নয়। কৌতুকভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, "না মেনে থাকবাব যো আছে কি, বাবা? তোমাব টিকি যে তাঁব কাছে বাঁধা!"

স্মিত হাসিব আভায় ঝলমল ক'বে উঠল স্বামীজীব আনন। ভক্তিভরে সজল চক্ষে আবাব সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন মায়েব চবণে, বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন বেলুড় আশ্রমে।

আব একদিনেব কথা। স্বামীজী নৌকায় ক'রে হবি মহারাজেব সঙ্গে মা-সাবদামণিকে দর্শন কবতে যাচ্ছেন। স্বামীজী বাব বাব গঙ্গাজল পান করছেন দেখে হরি মহারাজ মন্তব্য করলেন, "এতো ঘোলাজল বাব বাব খাচ্ছ, শেবকালে কি সর্দি ক'বে বসবে?"

স্বামীজী উত্তবে বললেন, "না ভাই, ভয় কবে; আমাদেব তো মন—মাব কাছে যাচ্ছি, ভয় করে!"

স্বামী প্রেমানন্দ একবার নীলকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ ভক্তগণকে বলেছিলেন, স্বামীজী যেদিন মায়ের বাড়িতে যেতেন, আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিতেন। একদিন ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন, বার বার ডুব দিতে লাগলেন, যেন কিছুতেই দেহের পবিত্রতা আনতে পারছেন না। শেষটায় যদিও বা উঠলেন সেবককে বললেন,—ওরে, আমার গায়ে গঙ্গাজলের ছিটে দে। কোনও রকমে মায়ের ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন, আর চলতে পারলেন না, ভাবে বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, মা তাড়াতাড়ি এসে নরেনকে তুলে ধরলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।[১]

মাতৃ প্রশস্তিতে সদা পূর্ণ ছিল বীরভক্ত বিবেকানন্দের জীবন। একবার জননী সারদামণি সম্পর্কে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন :

"মায়ের কৃপা আমার উপর লক্ষগুণ বড়—মায়ের দয়া, মায়ের আশীর্বাদ···তারক ভায়া! আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে বলেছিলাম. তিনি যেমনি আশীর্বাদ দিলেন অমনি হুপ ক'রে সাগর পার। এই বুঝ দাদা। এই শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার দিয়ে, লড়াই ক'রে, টাকার যোগাড় করছি, মায়ের মঠ হবে বলে।··· মায়ের কথা সময় সময় মনে করলে বলি, 'কো রামঃ'—ঐ যে বলছি ঐখানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বল, কিন্তু দাদা, যার মায়ের উপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও।"

সারা বিশ্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্মোদ্যোগেরও পত্তন করেছেন। আদর্শ ও প্রেরণা দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন একদল ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীকে। কিন্তু এবার মহাচরণ, যোদ্ধাসন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দের জীবনে এসেছে বিরতির পালা, ঈশ্বর-রতির তরঙ্গ এবার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাঁর সর্বসত্তাকে। ভাবাবেশ আর

১ শ্রীশ্রীসারদাদেবী : ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

সমাধিব গভীরে হৃদয়মন নিমজ্জিত হয় বার বাব। এই অন্তর্মুখীন অবস্থায় একদিন মা সাবদামণিব চবণ দর্শন কবতে গিয়েছেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন ক বে বিবেকানন্দ জোড হস্তে উঠে দাঁড়ান। স্নেহভবে প্রশ্ন কবেন সাবদামণি, "বাবা, তুমি কেমন আছো?"

"মা, আমার আজকাল কী যে হয়েছে, সব দেখছি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। কোথায যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে।"

স্মিতহাস্যে সাবদামণি বললেন, "দেখো বাবা, শেবটায় আমাকে কিন্তু উড়িযে দিও না।"

"মা, তোমায উড়িযে দিলে থাকি কোথায? যে জ্ঞানে গুরুপাদ-পদ্ম উড়িযে দেয সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায?" উত্তব দেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের তৎকালীন অবস্থাটি বিশ্লেষণ ক'বে সারদামণি বলেছিলেন, "আসল কথাটা কি জানো? জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টিশ্বব উড়ে যায। মা-মা। শেষে দেখো, মা আমাব জগৎ জুড়ে। সব এক হযে দাঁড়ায। এই তো সোজা কথাটা।"

এমনিভাবে জটিল পরম তত্ত্বজিজ্ঞাসাব সহজ সবল মীমাংসা ক রে দিতেন সাবদামণি তাঁব সহজাত প্রজ্ঞাব বলে। দিক্‌পাল সুপণ্ডিত ভক্ত শিষ্যেবা অবাক্ বিস্ময়ে তাঁব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

ব্রহ্মানন্দ মহাবাজ জননী সাবদামণিকে যে দৃষ্টিতে দর্শন কবতেন তার এক মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন স্বামী অমৃতানন্দ:

এক বৎসব ঠাকুবের সাধাবণ উৎসবের দিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা স্ত্রী-ভক্তদের লইযা মঠে আসিয়াছেন। মহাবাজ তখন গেটে দাঁড়াইযা 'মহামাযী কী জয' ববে অভ্যর্থনা কবিযা তাঁহাকে মঠের ভিতব লইযা গেলেন। স্বেচ্ছাসেবকবা শ্রেণীবদ্ধ হইযা শঙ্খাদি বাজাইযা অনুগমন কবিল। মা উপরে গিয়া ঠাকুবকে প্রণাম করিলেন এবং নামিযা আসিয়া, মহাবাজের প্রার্থনায ঠাকুবঘবেব সিঁড়িব প্রায় আট হাত দক্ষিণে আসনেব উপব দক্ষিণ-মুখী হইযা

দাঁড়াইলেন। মহারাজ মা'র পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কম্পিত হস্তে রোমাঞ্চিত কলেবর ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করিলেন। মহারাজের আদেশে সাধুভক্তগণ দুই সারি হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং করজোড়ে 'সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে' ইত্যাদি স্তব পাঠ করিয়া মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। মা তখন চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া—মুখের ঘোমটা খানিকটা উপরে উঠিয়াছে, মহারাজ তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে পূর্বাস্য হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—চক্ষে ধারা। সেই দিন মহারাজ একেবারে বালকের মত হইয়া গিয়াছিলেন।

জননী সারদামণি সম্পর্কে স্বামী প্রেমানন্দ, বাবুরাম মহারাজ একবার একপত্রে লিখে ছিলেন, "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু মা'র—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। একি মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা। জয় শক্তিময়ী মা। যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে, সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি, অপার করুণা। জয় মা। আমাদের কথা কি বলছিস, স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখি নি। তিনিও কত বাজিয়ে, বাছাই করে, লোক নিতেন। আর এখানে—মা'র এখানে কি কি দেখছিস? অদ্ভুত অদ্ভুত। সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে। মা। মা। জয় মা।"

গিরিশ ঘোষ ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার ও নটসূর্য, তাই সমকালীন বাংলার শিক্ষিতসমাজে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। পরমভক্ত গিরিশের দৃষ্টিতে সারদামণি ছিলেন দেবী মানবী—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী জগন্মাতা।

সেদিন কলকাতা থেকে সারদামণি কিছুদিনের জন্য দেশে যাচ্ছেন। তাঁকে বিদায় দেবার জন্য অপর ভক্তদের সঙ্গে গিরিশও উপস্থিত। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন ক'রে তিনি বলতে লাগলেন, "মা,

তোমার কাছে যখন আসি, তখন আমার মনে হয়, আমি যেন ছোট্ট শিশু, নিজ মায়ের কাছে যাচ্ছি। আমি বয়স্ক ছেলে হলেও মায়ের সেবা করতে পারতুম। কিন্তু সবই উল্টা ব্যাপার, তুমিই আমাদের সেবা করো, আমরা তোমার করি না। এই তো জয়রামবাটী যাচ্ছ। সেখানে পাড়াগাঁয়ের উনুনের পাশে বসে দেশের লোকের জন্য রাঁধবে আর তাদের সেবা করবে। আমি কেমন ক'রে তোমার সেবা করব। আর মহামায়ীর সেবার কীই বা জানি?"

ভাবের আবেগে নয়ন দুটি বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে গিরিশের। একটু থেমে ভক্তদের লক্ষ্য ক'রে বলতে থাকেন: "ভগবান্ ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না আর সব রকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।"

ভক্তি ও শরণাগতির মূর্ত বিগ্রহ অদ্ভুতানন্দের (লাটু মহারাজের) দৃষ্টিতে সারদামণি শুধু গুরুপত্নীই ছিলেন না, ছিলেন জগন্মাতা ব্রহ্মময়ীরই প্রতীক।

সেবার সারদামণিকে বলরাম ভবনে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছে। লাটু তখন সেখানে বাস করছেন। সারদামণিকে গেটের ভেতর ঢুকতে দেখেই নিজের কক্ষ থেকে তিনি ছুটে বেরিয়ে আসেন। জোড় হস্তে ভাব-গদ্‌গদ স্বরে বলতে থাকেন, 'মা ঠাকুরুণ, ব্রহ্মময়ী এথিকে, এথিকে, এথিকে।"

অবগুণ্ঠনের আড়ালে সারদামণি ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছেন। সেবিকা গোলাপ মাকে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন, "গোলাপ, লাটু কি বলছে, বলতো?"

কথা কয়টি শেষ হতে না হতেই লাটু লুটিয়ে পড়লেন তাঁর

চরণতলে, অশ্রুজল ঝবতে থাকে গণ্ড বেযে। ভক্তিবসে উন্মত্ত লাটু গ্রাম্যভাষায় শুরু কবেন মায়েব স্তবস্তুতি, তাবপব গাঢ ধ্যানে নিবিষ্ট হযে হাবিযে ফেলেন বাহ্যজ্ঞান।

দেবী সারদামণিও ততক্ষণে দিব্যভাবে আবিষ্ট হযে পড়েছেন, নিশ্চল দেহে দণ্ডাযমান রযেছেন গৃহেব প্রবেশদ্বাবে। চাবিদিকেব ভক্তদেব হৃদযে জেগেছে অপূর্ব ঐশ্ববীয উদ্দীপনা। সবাই মিলে ঠাকুবেব নামগানে মুখব ক'বে তুললেন, সে অঞ্চল।

সঙ্গিনীবা সারদামণিকে ধরাধবি ক'বে দ্বিতলে নিযে ওঠালেন। লাটু দীর্ঘ সময পবে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন, তখনও তাঁর মুখে 'বরম্ময়ী, নাম উচ্চারিত হচ্ছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক হযে উঠে বললেন, "ববম্ময়ী, মাথাটা গবম ক'বে দিলে।"

শ্রীবামকৃষ্ণেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত নাগমশাইব মাতৃদর্শন ছিল ভক্তগোষ্ঠীব এক দর্শনীয বস্তু। মা সাবদামণিও স্নেহে করুণায বিগলিত হযে যেতেন এই মহাভক্তেব ভাববিহ্বলতা ও আর্তি দর্শনে। নাগমশাই সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

আহা, তাব কথা আব কি বলবো? আমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী ভাবে দেখত। প্রথম যেদিন আমাকে দর্শন কবতে এল আমার ছিল একাদশী। তখন কোনো পুরুষ-ভক্ত আমায় সাক্ষাৎ দর্শন কবতে পেত না, সিঁড়িতে মাথা ঠুকে প্রণাম করত। একজন এসে নাম বলে আমাকে বলত, 'মা, তোমাকে অমুকবাবু প্রণাম কচ্ছেন।' আমিও আশীর্বাদ জানাতুম।

সেদিন ঝি বললে, 'মা নাগমহাশয কে? তিনি প্রণাম কচ্ছেন, কিন্তু মাথা এত জোবে ঠুকছেন, মনে হয বক্ত বেরুবে? মহারাজ পেছন থেকে কত বকছেন থামাব জন্যে, কিন্তু কোনো বাক্যই নেই— যেন কোনো হুঁশ নেই। পাগল নাকি মা? আমি বললুম, 'ওগো, যোগেনকে বল এখানে পাঠিযে দিতে। যোগেন নিজেই ধবে নিযে এল। দেখি কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িযে পড়ছে,

হেথায় পা ফেলতে হোথায় পড়ে, চোখের জলে আমায় দেখতে পাচ্ছে না। আমি ধরে বসালুম। কেবল 'মা' 'মা' শব্দ—যেন পাগল, অথচ শান্ত ধীর স্থির। চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। আমার খাবার ছিল, লুচি মিষ্টি, ফল। আমি খেতে বসেছিলুম, এমন সময়ে এই ঘটনা। আমি কিছু খেয়ে তাকে খাইয়ে দিতে লাগলুম। খেতে পারে না গো, খাবার জিনিস গিলতে পারলে না। বাইরের দিকে মন নেই, কেবল 'মা' রব, আর আমার পায়ে হাত দিয়ে বসে রইল। আমাকে মেয়েরা বলতে লাগল, 'মা, তোমার তো খাওয়া হল না। মহারাজকে বলি একে সরিয়ে নিতে।'

আমি বললুম, 'থাম একটু স্থির হয়ে নিক।' খানিক বাদে গায়ে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে ও ঠাকুরের নাম করতে করতে তার হুঁশ এল। আমিও খেতে লাগলুম, ওকেও খাইয়ে দিতে লাগলুম। খাওয়া হলে তাকে নিচে নিয়ে গেল। আমাকে কেবল যাবার সময় বলে গেল, 'নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ।' যারা কাছে ছিল তাদের আমি বললুম, 'দেখ কি বুদ্ধি।' আমার জন্য সব করতে পারতো গো।

সারদামণি যে ঘরে ঠাকুরের পট পূজা করতেন, সে ঘরে ঠাকুরের প্রবীণ অন্তরঙ্গ ভক্তদের বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির, ফটোও থাকতো। মাঝে মাঝে এগুলো তিনি পরিষ্কার করতেন। নাগ-মহাশয়ের ফটোটি হাতে নিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে বলতেন, "কত লোক এল, কিন্তু এমনটি আর দেখলাম না।"

আর একবারের কথা। সেদিন মায়ের জন্য নাগমশাই কিছু ভেট নিয়ে এসেছেন। ভাবাবেগে টলমল, একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা। সারদামণির কথায় এদিনকার চিত্রটি পাই ঃ

"একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে, মাথায় ক'রে বাড়ির গাছের ভাল ভাল আম এক টুকরি নিয়ে এল। মনের ভাব, বসে আমাকে খাওয়াবে। কিন্তু মুখে কিছুই বলা নেই। টুকরি মাথায় নিয়ে এখানে ওখানে কাঙালের মতো ঘুরছে।

'যোগেন বলে পাঠালে, 'মাকে বল—নাগ মহাশয় আম নিয়ে এসেছেন। কিছু বলেনও না, কারও কাছে দেনও না।'

'আমি বললুম, 'এখানে পাঠিয়ে দাও।' পাঠিয়ে দিলে, টুকরি মাথায় ক'রেই এল। একজন ব্রহ্মচারী মাথা থেকে টুকরি নামিয়ে নিলে। তখনও ঠাকুরপূজা হয় নি। আমায় দেখে পূর্ববারের মতো বেহুঁশ। মুখে ঠাকুরের নাম ও 'মা' 'মা' রব। দুচোখ বয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

খুব ভাল আম—কতকগুলিতে চুনের ফোঁটা দেওয়া, কেটে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হল। মেয়ে যোগেন এসে আমায় একখানা শালপাতায় ক'রে প্রসাদ দিলে। আমি কিছু খেলুম, তারপর গোলাপকে বললুম, 'আর একখানা শালপাতা দাও।' পাতা দেওয়া হলে পাত থেকে প্রসাদ উঠিয়ে দিয়ে তাকে বললুম, খাও। কে খাবে? তার শরীরে কোনো হুঁশ নেই, হাত দুটো যেন অবশ। আমি ধরে অনেক বলতে বলতে খেলে তো না-ই, একখানা আম নিয়ে মাথায় ঘষতে লাগল। আমি নিচে বলে পাঠাতেই তারা লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেল। প্রণাম করতে করতে কপাল ফুলিয়ে দিলে, অন্নপ্রসাদ আর নিলে না। কিছু বাদে হুঁশ হতেই নাকি চলে গেছে, খবর পেলাম।

সারদামণির দিনচর্যা ছিল জপধ্যান ও পুজোয় ঠাসা। স্বামী অরূপানন্দ এর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, মায়ের দৈনন্দিন জীবন বড় অদ্ভুত ছিল। তিনি রাত্রি প্রায় তিনটার সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন এবং সর্বপ্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখিতেন, উঠিবার সময় ঠাকুরদের নাম করিতেন। তারপর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুর তুলিতেন এবং পরে জপে বসিতেন। সেই যে দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার সময় শেষরাত্রে উঠিয়া শৌচস্নানাদি শেষ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে ঘরে ঢুকিতেন, সেই অভ্যাস তাঁহার আজীবন ছিল। শরীর খুব খারাপ থাকিলেও যথাসময়ে মুখ-হাত

ধুইয়া বরং পবে আবাব একটু শুইতেন। তথাপি ঠিক সময়ে উঠা চাই। মা বলিতেন, 'রাত তিনটি বাজলেই যেখানেই থাকি, কানেব কাছে যেন বাঁশিব ফুঁ শুনতে পেতুম।' যখন যেটি কববাব সে বিষযে তাঁহার আদৌ আলস্য ছিল না।

"সকালে পূজাব জন্য ফুল, বেলপাতা প্রভৃতি গুছানো, কল ছাড়ানো ইত্যাদি সব কাজ মা নিজেই কবিযা আটটাব সময আন্দাজ পূজায বসিতেন। ইদানীং স্ত্রী-ভক্তেবা সেই সকল কাজে তাঁহাকে সাহায্য কবিলেও মা যথাসাধ্য প্রায বোজই সব কবিতেন। তবে শেষ কযেকবার উদ্বোধনে যখন ছিলেন, সাধুদেব কেহ কেহ পূজা করিতেন। মা নিজে যখন পূজা কবিতেন, এক ঘণ্টাব মধ্যে পূজা শেষ করিযা প্রসাদ বিতবণের জন্য শালপাতা সাজাইতেন এবং সকলকে প্রসাদ দিতেন।"

পবম ভক্ত শশী মহারাজেব আহ্বানে সেবাব জননী সাবদামণি দক্ষিণদেশে গিযেছিলেন। বহু ভক্ত নবনাবী সে সমযে কৃতার্থ হয়েছিলেন তাঁব কাছে দীক্ষা লাভ ক'বে।

বামেশ্বব দর্শন কবাব পব সাবদামণি দিব্য আনন্দে বিহ্বল হযে পড়েন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভক্তদের বলেছেন, "বামেশ্ববে গেছি, শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) সব পুজোব ব্যবস্থা কবেছে।—১০৮ সোনাব বেলপাতা আমার জন্য করিযে বেখেছে। আমি সেই বেলপাতা দিযে পুজো কবলুম। বামনাদেব বাজা আগে থেকেই তাব কবেছিলেন 'আমাব গুরুর গুরু পবমগুরু যাচ্ছেন, সব ব্যবস্থা ক'রে দিযো।' মণিকোটা খুলে দেখালে—সে কী দেখলুম। সামান্য আলো জ্বলছে, গোটা ঘবটা ঝক্‌ঝক্ করছে। বাজকীয নির্দেশ ছিল মণিকোটাব যে কোনো বত্ন মা সাবদামণি পছন্দ করবেন তা তৎক্ষণাৎ যেন তাঁকে ভক্তিভবে উপহাব দেওযা হয। একথা শুনে, মা মহা বিব্রত হযে উঠলেন, আবার ভাবলেন, বাজা বা তাঁব লোকজন যদি ক্ষুণ্ণ হন? তাই বললেন, 'আমাব আব কী প্রযোজন, আচ্ছা বাধু যদি কিছু নিতে

চায় তো নেবে।' কোষাগার উন্মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অজস্র চুনী পান্না, হীরা, মুক্তো সেখানে ঝক্‌ঝক্ করছে, চুচোখ ঝলসে যায়।

ঠাকুরকে বার বার স্মরণ করেন সারদামণি, প্রার্থনা তাঁর কাছে জানান সকাতরে, 'ঠাকুর এ বিপদে রক্ষা কর, রাখুর মনে যেন এসব রত্নের জন্য কামনা না জাগে।'

সমস্ত কিছু দেখার পর রাখু কিন্তু উদাস স্বরে বললে, "এ আবার কী নেব, আমার পেন্সিলটা হারিয়ে গেছে একটা পেন্সিল তোমরা আমায় কিনে দিয়ো।"

সাধু সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান্ লাভ করা, এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে নিরলস সাধনভজন ক'রে। এই সাধনার পথে নিজেকে সদাই বাঁচাতে হবে অতন্দ্র পাহারা দিয়ে। স্নেহভাজন এক সাধু ভক্তকে উদ্দেশ ক'রে সারদামণি সেদিন বলতে থাকেন, "ছাখো, ঠাকুর বলতেন—'সাধু সাবধান।' সাধুর সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়। সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চলতে হলে সর্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? সাধু কোনো মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময় পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। সাধুর কাপড় কুকুরের বগলসের মতো তাকে রক্ষা করবে। কেউ তাকে মারতে পারে না। সাধুর সদর রাস্তা। সকলেই তার পথ ছেড়ে দেয়।

"বাবা, মন্দ কাজে লোকের মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। আমি আগে রাত তিনটার সময় উঠে প্রত্যহ ধ্যান করতুম। একদিন শরীর ভাল না থাকায় আলস্যবশতঃ করলুম না, তা কদিন বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য কোনো ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক রোখ চাই। যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠতো গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে কত প্রার্থনা করতুম—

'চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোনো দাগ না থাকে।"
নবতে থাকাব সময ঠাকুব এমন কি বামলালকেও আমার কাছে আসতে বাবণ কবতেন, বামলাল তো ভাশুবপো হয। এখন তো সকলেব সঙ্গে কথা কই, সকলেব সামনে বেবোই।"

কর্মদোষে কোনো এক সম্ভ্রান্ত ঘবেব মহিলাব পদস্খলন ঘটে। তবে পূর্বজন্মের সুকৃতিও তাঁব কিছু ছিল, তাই একটি ভক্তিমান্ সাধুব আশ্রযে আসেন এবং তাঁর কাছে সদুপদেশ পেযে নিজেব দুষ্কৃতি ও ভ্রম বুঝতে পাবেন, অনুতাপেব অনলে হন জর্জবিত। সেই সাধুটিব নির্দেশ পেযে একদিন বাগবাজাবে এসে উপস্থিত হন, লুটিযে পড়েন সাবদামণিব চবণতলে।

ঠাকুবঘবে প্রবেশ কবাব সাহস তাঁব নেই, দোবগোড়ায দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি নিজেব সমস্ত পাপেব কথা বিবৃত কবলেন। বললেন, "মা, আমাব উপায কি হবে? আমি আপনাব কাছে কি ক'রে আসবো? এ পবিত্র মন্দিবে প্রবেশ কববাব যোগ্য আমি নই।"

সস্নেহে মহিলাটিব গলা জড়িযে ধবে সাবদামণি করুণাভবা কণ্ঠে বললেন, "এস, মা, ঘবে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেবেছ, অনুতপ্ত হযেছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো। ঠাকুরেব পাযে সব অর্পণ ক'বে দাও, ভয় কি?"

অবলীলায এবং নির্বিচাবে সব মানুষেব পাপ-তাপ, বোগ-শোকের ভাব নিজেব স্কন্ধে গ্রহণ কবতেন কৃপাময়ী সাবদামণি। তিনি ছিলেন সত্যিকার পতিতোদ্ধাবিণী। হাসিমুখে তাই তো তিনি বলতেন, "কেন গো, আমাদেব ঠাকুব কি খালি বসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন?"

সৎ অসৎ, পুণ্যবান্ পাপী, কত বকমেব ভক্ত নবনাবীই আশ্রয নিত তাঁব কাছে। আব সবাবই দাযিত্ব গ্রহণ কবতেন তিনি অসীম কৃপাভবে। একদিন এক ঘনিষ্ঠ ভক্তকে বললেন, "বাবা, এক একজন প্রণাম কবলে যেন বোলতায হুল ফুটিয়ে দেয। কাউকে কিছু

বলি নে।" এই কথা বলেই আবার সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকে বললেন, "তা বাবা, তোমাদের কিছু বলছি না।"

সাধননিষ্ঠ এক ভক্তের হৃদয় নৈরাশ্যে জর্জরিত হয়ে উঠেছে। সখেদে সারদামণিকে নিবেদন করলেন, "মা, মনে ভয় হয় তোমার মতো মা পেয়েও কিছু যেন হল না।"[১]

সাহস দিয়ে তাঁকে বললেন, "ভয় কি বাবা, সর্বদা জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাব।' যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন তারা তো ছুঁড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।"

এই ভক্তটি একদিন ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে দেখেন এক অলৌকিক দৃশ্য। ঠাকুরের ছবি থেকে একটা আলোর স্রোত নৈবেদ্যের ওপর এসে পড়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। সারদামণিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, "মা, যা দেখছি সে কি মাথার ভুল, না সত্যি? যদি ভুল হয় তবে যাতে মাথা ঠাণ্ডা হয় তাই ক'রে দাও।"

মা একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "না বাবা, ওসব ঠিক।"

"তুমি কি জানো আমি কি দেখি?"

"হ্যাঁ, বাবা, দেখি।"

"ঠাকুরকে ও তোমাকে যে ভোগ দিই, তা কি ঠাকুর পান? তুমি কি তা পাও?"

"হ্যাঁ, পাই।"

"বুঝবো কি ক'রে?"

---

১ মায়ের কথা (১) উদ্বোধন

"কেন, গীতায় পড়ো নি? ফল, পুষ্প, জল ভগবান্‌কে ভক্তি ক'রে যা দেওয়া যায়, তা তিনি পান।"

শুনে ভক্তটি বিস্মিত ও উল্লসিত। সরাসরি প্রশ্ন ক'রে বসলেন, "তবে কি তুমি ভগবান্‌।"

এই সরল প্রশ্ন শুনে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলেন সারদামণি, সমবেত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

সিস্টার নিবেদিতা, ক্রিস্টিনা, মিস ম্যাক্‌লাউড প্রভৃতি বিদেশিনী ভক্তেরা সারদামণিকে প্রায়ই দর্শন করতে যেতেন, সহজ সরল ব্যবহারে ও পবিত্র সঙ্গ দিয়ে তিনিও এদের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলেন চিরন্তন যোগসূত্র।

নিবেদিতা লিখেছেন, "মাতা-ঠাকুরাণী ও তাঁহার সঙ্গিনীরা ঠাকুর-ঘরে বসে সেদিন খ্রীষ্টীয় পর্বের তাৎপর্য কিছু শুনতে চাইলেন। তারপরে আমাদের ছোট ফ্রেঞ্চ অর্গান নিয়ে ইস্টারের গান ও গৎ বাজানো হল। পুনরুত্থান স্তোত্রগুলির বিদেশী ভাব বা এগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব কোনোটায় বাধা জন্মালো না! তৎক্ষণাৎ ওগুলোর মর্ম অনুধাবন ক'রে মা ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। মা সারদাদেবীর উদার ধর্ম সংস্কৃতির একটি অতি হৃদয়গ্রাহী দিক্‌ এই প্রথম আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল। তাঁর যেসব পার্শ্বচারিণী শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পেয়েছেন তাঁদের সকলের মধ্যেই এই ক্ষমতা কিছুটা দেখা যায়, কিন্তু মায়ের এই শক্তিটি যে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ও কঠোর সাধনা থেকে লব্ধ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

ভক্ত সুরেন্দ্র সেনের অভিলাষ ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবেন, জীবন তাঁর ধন্য হবে। আমেরিকা থেকে স্বামীজী তখন দেশে ফিরে এসেছেন, সুরেন সেন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে তিন বৎসর তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ালেন, জেদ করতে

লাগলেন দীক্ষা, সন্ন্যাস ইত্যাদি যা কিছু ধর্ম-জীবনের পক্ষে প্রয়োজন তাঁকে অবশ্য দিতে হবে।

অবশেষে স্বামীজীকে সম্মত করানো গেল। দীক্ষার দিনও স্থির হয়ে গেল। আরও কয়েকটি যুবকেরও দীক্ষা হবে সেদিন। মঠের ঠাকুরঘরে গিয়ে স্বামীজী ধ্যানস্থ হলেন। একে একে কয়েকজনের দীক্ষা হয়ে গেল, তারপর সুরেন্দ্র সেনকে ডেকে স্বামীজী বললেন, "ছাখ্, ঠাকুর জানিয়ে দিলেন আমি তোর গুরু নই। দেখিয়ে দিলেন, যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও বড়। তোর হতাশ হবার কারণ নেই, সময়ে সব হবে।"

শুনে সুরেন্দ্র তো মর্মাহত। ভাবলেন, 'স্বামীজীর চাইতে আবার বড় কে? সম্ভবত, আমি দীক্ষার অনুপযুক্ত, তাই আমার প্রতি কৃপা হল না। ফাঁকি দিয়ে বিদায় করলেন।'

কিছুকাল পরে একদিন রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন সুরেন্দ্র। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

আমি ঠাকুরের কোলে বসিয়া আছি; এক উজ্জ্বল দেবীমূর্তি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'একটি মন্ত্র নাও।' আমি বলিলাম, 'এখন ঠাকুরের কোলে বসে আছি, মন্ত্রতন্ত্রের কোনোদিনই ধার ধারি না।' তথাপি তিনি মন্ত্র নিতে জেদ করায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কে?' 'আমি সরস্বতী'—বলিয়াই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এতে কী হবে?' উত্তর দিলেন, 'কবি হতে পারবি।' কবির দলের উপর আমার কোনোদিনই' ভাল ধারণা ছিল না। সেই কবির দলের সর্দার হইতে হইবে মনে করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলাম, 'আমি কবি হতে চাই না।' দেবীমূর্তি তখন কহিলেন, 'কবি মানে জানিস? কবি মানে—জ্ঞানী।' এই কথা বলিয়া জপ করিবার প্রণালী পর্যন্ত দেখাইয়া দিয়া, অন্ততঃ ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ করিলেন।

অল্প কয়েকদিন পরে মঠে স্বামীজীকে দর্শন করিতে যাই। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, ঠাকুর বলতেন, দেবস্বপ্ন সত্য। একে

স্বপ্ন সিদ্ধি বলে। এইটি জপ করলেই তোর সব হয়ে যাবে, আর কিছু করতে হবে না।' সেই সময়ে ব্রজেন্দ্র নন্দী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি স্বপ্ন কোনোদিনই বিশ্বাস করি না, সে অমূলক চিন্তা মাত্র। যদি কোনো মন্ত্রের প্রয়োজন হয়, আপনি দিন।' স্বামীজী কহিলেন, 'এসব বুঝি 'বোধোদয়' বইয়ে—ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ' পড়ে তোর ধারণা হয়েছে? তা নয়। ধারণা ক'রে রাখ্, বাস্তবিক এটি সত্য। ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক্। পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।' আমি বলিলাম, 'আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' স্বামীজী বললেন, 'সময়ে বুঝতে পারবি। যখন দেখতে পাবি, দেখবি উপরে মহা শান্তভাব কিন্তু ভিতরে সংহার মূর্তি। সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।' আমি বলিলাম, 'আমার এ সকল বিশ্বাস হয় না।' স্বামীজী বলিলেন, 'বিশ্বাস করিস বা না করিস, জপ ক'রে যা—কল্যাণ হবে।' আমি একদিনও জপ করি নাই।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী পাঠ ও তাঁহাকে চিন্তা করিতাম। মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে ঠাকুর ও স্বামীজীর দেখাও পাইতাম। এইরূপে প্রায় সাত বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩১৩ সালে আমি ও ডাক্তার লালবিহারী সেন পূজার সময়ে মঠে যাই। মঠে হইতে রওনা হইয়া, পথে কামারপুকুরে একদিন থাকিয়া শিবুদাদার সঙ্গে জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যার পরে মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বাবা, কী নেবে?' আমি বলিলাম, 'তা তো বুঝতে পারি না।' মা বলিলেন, 'যা চাবে তাই পাবে; শক্তি নেবে?' আমি বলিলাম, 'শক্তিটক্তি তো কিছু বুঝি না। আমার কী আবশ্যক তাও জানি না। যদি কিছু দেওয়ার ইচ্ছা হয় তোমার, তাহলে যাতে আমার ভাল হয় তাই দাও।' মা বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল সকালে হবে, কিছু ফুল যোগাড় ক'রে রাখবে।' মার অনুমতি নিয়া আমি ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম। তিনি মন্ত্রপ্রার্থী হইলে মা

বলিলেন, 'কাল ভাল দিন—লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, কাল হবে।' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ দিনে দীক্ষা হলে কী হয় ?' মা বলিলেন, 'শীঘ্রি সিদ্ধি হয়।'

দীক্ষার সময় মা তাঁহার ডান হাত আমার মস্তকে এবং বাঁ হাত চিবুকে রাখিয়া মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র শ্রবণ করিবামাত্র স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত ঘটনা যুগপৎ মনে হইল ও মাথা ঘুরিতে লাগিল, ক্ষণেকের জন্য যেন বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলাম কিন্তু আনন্দানুভূতি লুপ্ত হইল না। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্তি ও মায়ের মূর্তি এক। 'মা, আমি অনেকদিন আগে স্বপ্নে একটি মন্ত্র পাই—' এইমাত্র বলিতেই মা উত্তর দিলেন, 'কেন, মিলছে না ? ঠিক মিলছে তো ? মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে পাও না ?'

সেবার সারদামণি দেশে থেকে ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগছিলেন। ভক্তেরা তাঁকে কলকাতায় এনে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন। চিকিৎসায় জ্বর ত্যাগ হল কিন্তু শরীর তখনো খুব দুর্বল। ভক্ত শিষ্যদের তাঁর কাছে যাওয়া বারণ।

এই সময়ে বোম্বাই থেকে একটি ধর্মপ্রাণ-পার্শী যুবক তাঁকে দর্শন করতে এল।

এতদূর থেকে ছেলেটি এসেছে, তদুপরি ভিন্নধর্মাবলম্বী। তাই শরৎ মহারাজ তাঁকে দর্শনের অনুমতি দিলেন। যুবকটির ভ্রাতা, প্রবুদ্ধভারত পত্রিকা পাঠ ক'রে আকৃষ্ট হন এবং স্বামীজীর রচিত বই কিছু আনিয়ে পড়েন। এই যুবকটি সে সব পাঠ করেছে, এবং কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে অন্তরের আকুতি নিয়ে।

সারদামণিকে প্রণাম ক'রে সে প্রার্থনা জানালো, "মাঈজী, কুছ মূলমন্ত্র দীজিয়ে জিসসে খোদা পহচান যায়।"

একথা শুনে করুণায় ভরে উঠল তাঁর অন্তর। অরূপানন্দজীকে বললেন, "দেবো ? দিয়ে দিই কি বল ?"

তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "সে কি ! কাউকে দর্শন পর্যন্ত

করতে দেওয়া হয় না, সবে অসুখ হতে উঠেছেন, শরৎ মহারাজ শুনলে কি বলবেন ? এখন নয় এর পরে হবে।"

"আচ্ছা তাহলে শরৎকে তুমি জিজ্ঞেস ক'রে এসো।"

শরৎ মহারাজকে সব কথা জানানো হলে তিনি বললেন, "আমি আর কি বলবো ? মার যদি একটা পার্শী চেলা করতে ইচ্ছা হয়ে থাকে করুন। বলে আর কি হবে।"

স্বামী অরূপানন্দ লিখেছেন, "ফিরিয়া গিয়া দেখি, মা ইতিমধ্যেই দীক্ষা দিবার জন্য নিজেই দুইখানি আসন পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। দীক্ষা হইলে আমাকে বলিতেছেন, "বেশ ছেলেটি, যা বললুম ঠিক বুঝে নিলে।" বুঝিলাম, মা কেন বলিতেন,—এসব ঠাকুরই পাঠাচ্ছেন।

"এই সকল ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের দীক্ষার সময় মা যাহা বলিবার বাংলাতেই বলিয়া যাইতেন, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিত। যখন দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, সেখানেও মা বলিতেন, লোক এসে বলত, 'মন্ত্রম্' 'উপদেশম্'—আর কোনো কথা তো বুঝতে পারছি নে।" সেখানেও তিনি ঐরূপে অনেককে দীক্ষা দিয়াছেন। দীক্ষা দিবার সময় তাঁহার মনের অন্তস্তল হইতে যে মন্ত্র উদিত হইত তাহাই দীক্ষা প্রার্থীর যথার্থ মন্ত্র জানিয়া মা উহাই তাহাকে দিতেন। বলিতেন, 'কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়েই মন থেকে ওঠে, 'এই দাও, এই দাও।' আবার কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়ে মনে হয় যেন কিছুই জানি নে, কিছুই মনে আসে না। বসেই আছি, পরে অনেক ভাবতে ভাবতে তবে দেখতে পাই।' ইহার কারণ মা বলিতেন,—যে ভাল আবার তার বেলায় তক্ষুনি মন থেকে ওঠে।"

সমদর্শিনী ছিলেন মা সারদামণি। একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, "আমি আর কারও দোষ দেখতে শুনতে পারিনে, বাবা, প্রারব্ধ কর্ম যার যা আছে। যেখানে ফালটি বেত সেখানে ছুঁচটি তো যাবে ?"

একটি নূতন ভক্ত সারদামণির কাছে তাঁর এক পুরাতন সেবকের নিন্দা সমালোচনা করছিলেন। এর উত্তরে তিনি বললেন, "আমার কাছে ওর কত সব দোষের কথা বললে। তখন এরা সব কোথায় ছিল? সে আমার কত সেবা করেছে। আমি তো তখন ভাইদের ঘরে ধান সিদ্ধ করি। বউরা সব ছোট। সে শীত বর্ষা গ্রাহ্য না ক'রে সকাল থেকে গায়ে কালি মেখে আমার সঙ্গে বড় বড় ধানের হাঁড়ি নামাত। এখন তো অনেকে ভক্ত হয়ে আসে। তখন আমার কে ছিল? আমরা কি সেগুলো সব ভুলে যাব? তা লোকেরই বা দোষ কি? আমারও আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি নে'—বলে কত প্রার্থনা করায় তবে দোষ দেখাটা গেছে। মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ করো, মুখটি তখনই বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষটি দেখে! গুণটি দেখা চাই।"

সেবা ও ইষ্টনিষ্ঠার ভেতর দিয়ে যারা সাধনপথে এগিয়ে যেতে চায় তাদের সদাই সজাগ থাকতে হবে—অহংবোধ যেন কোনো রকমে ভেতরে প্রবেশ না করে।

মহাপুরুষদের সেবায় রত ভক্তদের দুর্বুদ্ধি প্রসঙ্গে একদিন ঈশানানন্দজীকে বলেন, "ছাখো, সে ব্যাপারটি একটা আছে বটে। সেটা হচ্ছে, সেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে সে তখন পুতুলের মতো নাচাতে চায়। উঠতে, বসতে, খেতে সব তাতেই কর্তা। সেবার ভাব আর থাকে না। যারা নিজের দেহসুখ ভুলে তাঁর সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখ জ্ঞান করে, তাদের ও রূপ হবে কেন? আর পতনের কথা বলছ? অনেক মহাপুরুষের চারদিকে ঐশ্বর্যের ভাব থাকে। তাই দেখে অনেকে তাঁদের সেবা করতে হলে ওতেই মত্ত থাকে, আর পরে ওতেই ডুবে যায়। ঠিক ঠিক তাঁর সেবা করে কজন, বল?"

"ছাখো, কথায় আছে যে, পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে তাই দেখে ছোট ছোট মাছেরা আনন্দে সেইখানে লাফালাফি করে খেলা

করছে—ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্ব অবস্থা। লাফালাফির পর অবসাদ এল—কিছুই বুঝতে পারলে না।"

এক সাধু ভক্ত বললেন, "কেদার মহারাজ বলেন, গুরুর কাছে বেশীদিন থাকতে নেই। গুরুর অলৌকিক আচরণ দেখে অনেক সময় শিষ্যের নাকি ভক্তিশ্রদ্ধা কমে যায়।"

সারদামণি সহাস্যে উত্তর দিলেন, "তোমরা বাবা, ও সব কথায় মন খারাপ ক'রো না। তাহলে আমার কাজ চলে কি ক'রে? অত ভগবান্ বুদ্ধি না ক'রে মানুষ বুদ্ধিতে আমি যা বলি, দেখে শুনে, কাজগুলি যা করছ ক'রে যাও। তোমাদের কোনো ভয় নেই।"

সাধু জীবনের দায়িত্ব ও সতর্কতা সম্বন্ধে সারদামণি সদা সচেতন ছিলেন এবং প্রায়ই কথাপ্রসঙ্গে তরুণ ভক্তদের অন্তরে এই সতর্কভাব কথাটি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ক'রে দিতেন।

সেদিন বলছিলেন, অসুস্থ হয়েছে বলে গৃহস্থ-বাড়িতে সন্ন্যাসী থাকবে কেন? মঠ রয়েছে, আশ্রম রয়েছে। সন্ন্যাসী ত্যাগের আদর্শ। কাঠের স্ত্রী-মূর্তি পুতুল যদি রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, সন্ন্যাসী কখনও পায়ে ক'রে উলটে দর্শন করবে না। তাছাড়া সন্ন্যাসীর অর্থ থাকা একান্ত খারাপ। টাকা না করতে পারে এমন জিনিস নেই—প্রাণ সংশয় পর্যন্ত। পুরীতে একটি সাধু থাকত, সমুদ্রের ধারে। তাই টের পেয়ে দুজন চেলা লোভ সামলাতে না পেরে সাধুটিকে খুন ক'রে টাকা নিয়ে চলে গেল।"

সাধনার্থী ভক্তকে সারদামণি সেদিন জপধ্যান সম্পর্কে বলেছিলেন, "জপ সংখ্যা, করগণনা, এসব শুধু মন আনবার জন্য। মন এদিক ওদিক যেতে চায়; তবু ঐ সবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়। যখন জপ করতে করতে ভগবানের রূপ দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না। ধ্যান হল তো সবই হল।"

"মন চঞ্চল, তাই প্রথম প্রথম মনস্থির করবার জন্য একটু একটু

নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ধ্যানের চেষ্টা করতে হয়। তাতে মন স্থির হবার সাহায্য করে। কিন্তু ও ভাবেও বেশী করতে নেই, মাথা গরম হয়। ভগবান্ দর্শন বল, ধ্যান বল সবই মন। মন স্থির হলে সবই হয়।

"মানুষ তো ভগবান্‌কে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন ক'রে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ।

সহজাত তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন সারদামণি, তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনার মূল কথাটি অতি স্পষ্টরূপে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

ভক্ত কেদার মহারাজ এবিষয়ে একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেন, "মা, এবার কি আমাদের ঠাকুর একটা নতুন জিনিস দিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন যে সর্বধর্ম সমন্বয় ক'রে গেলেন?"

উত্তরে তিনি বলেন, "ছাখো বাবা, তিনি যে সমন্বয় ভাব প্রচার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন তা কিন্তু আমার মনে হয় নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্ ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টান মুসলমান বা বৈষ্ণবেরা যে যে ভাবে তাঁকে ভজনা ক'রে বস্তুলাভ করে, তিনি সেই সেই ভাবে সাধনা ক'রে নানা লীলা আস্বাদ করতেন, আর দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত কোনও হুঁশ থাকত না। তবে কি জান বাবা, এই যুগে ওঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ওরকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখন কেউ দেখেছে? সর্বসমন্বয় ভাবটি যা বললে, ওটিও ঠিক, অন্যান্য বারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব চাপা পড়েছিল।"

জপধ্যান ও মিশনের নিষ্কাম কর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে এক ভক্ত সাধুকে সারদামণি সেদিন বুঝাচ্ছিলেন।[১] বলছিলেন, "কাজকর্ম করবে বই কি, বাবা, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে

১ মায়ের কথা, ২য় খণ্ড, উদ্বোধন

সমস্ত দিন ভাল মন্দ কি করলাম না করলাম, তার বিচার আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়। ধ্যানে প্রথমে ইষ্টের মুখটি আসে বটে, কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান করতে হয়। আজকের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপধ্যান না করলে কি করছ না করছ, বুঝবে কি ক'রে?"

ভক্তটি প্রশ্ন তুললেন, "কেউ কেউ আবার বলেন, কাজকর্মে কিছু হবে না, সর্বদা জপধ্যান করতে পারলেই হবে?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেন সারদামণি, "তারা কি ক'রে বুঝলে, কি করলে হবে আর কি করলে হবে না? কয়েকদিন একটু জপধ্যান করলেই কি সব হয়ে গেল? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কিছুতেই কিছু হবার নয়। সেদিন দেখলে তো, একজন জোর ক'রে জপধ্যান বেশী করতে গিয়ে মাথাটি বিগড়ে এলেন। মাথাটি যদি বিগড়াল তো আর রইল কি? ইস্ক্রুপের প্যাঁচের একটু এধার ওধার। এক প্যাঁচ আলগা হলেই হয় পাগল হল, না হয় মহামায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে, আমি বেশ আছি। আবার উলটো দিকে এক প্যাঁচ কষা হলেই ঠিক পথে চলে, শান্তি ও আনন্দ পায়। সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন ক'রে প্রার্থনা করতে হয়, 'প্রভু সুবুদ্ধি দাও।' সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে কজন বলতো? প্রথমটা একটু করে। শেষে ন-র মতো বসে থেকে নিচের গরম মাথায় ওঠে (অহংকারী হয়)। গাছ পাথর ভেবে নানা অশান্তি। মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।"

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন মা সারদামণিকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, মা, আপনি যে এত লোককে মন্ত্র দিচ্ছেন, তাদের তো কখনও কোনো খোঁজখবর রাখেন না। এদের কার কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোনো খেয়াল নেই। গুরু শিষ্যের কত খোঁজ রাখেন, উন্নতি

হচ্ছে কিনা দেখেন। আপনার এত লোককে মন্ত্র না দিলেই হয়। যে কয়টির খবর রাখতে পারবেন সে কয়টিকে দেওয়াই ভাল।”

উত্তর হল, “তা ঠাকুর আমাকে তো নিষেধ করেন নি। তিনি আমাকে এত সব কথা বুঝিয়েছেন, আর এটা তাহলে কি কিছু বলতেন না? আমি ঠাকুরের উপর ভার দিই। তাঁর কাছে রোজ বলি, যে যেখানে আছে দেখো। আর জান, এসব ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র, তিনি আমাকে দিয়েছিলেন—সিদ্ধমন্ত্র।”

শিষ্য ভক্তদের সাধনার দায়িত্ব সম্পর্কে সারদামণি ছিলেন সদা সজাগ, সদা সচেতন। স্বামী ঈশনানন্দ লিখেছেন:

শেষাশেষি মায়ের শরীর দুর্বল থাকায় বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু দেখিতাম, তিনি এই শুইয়া থাকার সময়েও জপ করিতেছেন। জয়রামবাটীতে রাত্রি একটা-দুইটার সময় হঠাৎ কোনো কার্য উপলক্ষে তাঁহাকে ডাকিয়া দেখিয়াছি, তিনি এক ডাকেই সাড়া দিতেন। ‘আপনি কি ঘুমান নাই?’ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ‘কি করি, বাবা, ছেলেরা ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত—নিয়মিত কেন কেউ হয়তো বা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি। আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, ‘হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও। এই সংসারে বড় দুঃখ-কষ্ট। আর যেন তাদের না আসতে হয়।’

বলিতে বলিতে অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিতেন। আবার বলিতেন, ‘এত আগ্রহ ক’রে মন্ত্রটি তো নিয়ে গেল, কিন্তু কিছু করে না কেন? এমন আর কি শক্ত? একটু অভ্যাস ক’রে করতে থাকলেই কেমন আনন্দ আসে।’

দীর্ঘদিন আশ্রিত ভক্ত ও ত্রিতাপ দগ্ধ মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ ক’রে সারদামণির দেহ ক্রমে জীর্ণ হয়ে আসছে। সেদিন

একনিষ্ঠ সেবক সাধুটির দিকে মমতাপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে বললেন, "এ শরীরটা চলে গেলে তোমাদের খুব কষ্ট হবে, বুঝতে পারছি।"

সাধুটি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "মা, ওকি কথা বলছেন ? ওষুধেও যখন তেমন ভাল হচ্ছে না, আপনি ঠাকুরকে শরীরটার জন্যে একটু জানান না ? তা হলেই তো সব সেরে যায়।"

স্মিতহাস্যে সারদামণি বললেন এক নিগূঢ় কথা, "কোয়ালপাড়াতে অত জ্বর হত, বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই অসামাল হয়ে পড়তাম , কিন্তু হুঁশ হলে শরীরটার জন্য যখনই তাঁকে স্মরণ করতাম তখন তাঁর দর্শন পেতাম। দুর্বল শরীরে একদিন বারান্দায় বসে আছি, খুব রোদ, চারিদিক খাঁখাঁ করছে। দেখি যেন সদর দরজা দিয়ে ঠাকুর এসে ঠাণ্ডা বারান্দায় বসে শুয়ে পড়েছেন। আমি তাই দেখে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল পেতে দিতে গেছি। পেতে দিতে গিয়ে কেমন হয়ে গেলাম। কেদারের মা-টা সব নানারকম গোলমাল করতে লাগল। তাই তাদের বলেছিলাম, 'ও কিছু না, ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন হয়ে গেল।' তোমাদের দিকে চেয়ে শরীরটার জন্যে ঠাকুরকে কি মাঝে মাঝে না জানাচ্ছি ? কিন্তু শরীরটার জন্যে তাঁকে যখন স্মরণ করি কিছুতেই তাঁর দর্শন পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছা নয় যে শরীরটা থাকে [১]।"

১৯২০ সাল। জয়রামবাটীতে বার বার জ্বরে ভুগে সারদামণির দেহ অতিশয় দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। ভক্তেরা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন চিকিৎসার জন্য। প্রাচীন ও আধুনিক কোনো চিকিৎসাই বাকী রইল না, কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। রোগ নির্ণীত হল—মারাত্মক কালাজ্বর। ভগ্ন শরীরে কোনো ওষুধই কার্যকরী হল না।

স্বেচ্ছায় তুলে নেওয়া সংসারের সবকিছু মায়িক বন্ধন সারদামণি এবার চিরতরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। উন্মুখ হয়ে আছেন লীলা সংবরণের জন্য।

---

১ মায়ের কথা, ২য় খণ্ড, উদ্বোধন

শোকার্ত এক ভক্তকে সেদিন খোলাখুলি মৃদু স্বরে বললেন, "মনে হচ্ছে, এ শরীর দিয়ে ঠাকুরের যা করবার ছিল, শেষ হয়েছে। এখন মনটা সদাই তাঁকে চায়, অন্য কিছু আর ভাল লাগে না।"

আরও বললেন, "ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য এতকাল মায়িক বন্ধন দিয়ে মনটাকে নামিয়ে রেখেছিলেন, নইলে তিনি যখন চলে গেলেন তারপর কি আমার থাকা সম্ভব হতো?"

তিরোধানের তখনো দিন সাতেক বাকী। নিজের শয্যাপাশে স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়ে আনলেন। তাঁর হাতখানি ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "শরৎ, এরা রইল।" যে ভক্ত সেবিকা ও আত্মীয়রা সারদামণিকে কেন্দ্র ক'রেই দিনাতিপাত করছেন, তাঁদের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর একান্ত ভক্ত ও সেবক মাতৃগত প্রাণ সারদানন্দজীকে।

পায়ে শোথ নেমেছে, মা সারদামণি একেবারে শয্যাশায়িনী, সেবিকারা তাঁর আপ্রাণ শুশ্রূষা ক'রে চলেছেন। ডাক্তারের নিষেধে কাউকে রোগশয্যার পাশে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি প্রধান ভক্তদেরও না। একটি মেয়ে ভক্ত ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকেই মাকে দর্শনের চেষ্টা করছেন।

মেয়ে ভক্তটি কেঁদে উঠতেই সস্নেহে ক্ষীণকণ্ঠে সারদামণি বললেন, "ভয় কি গো? তুমি ঠাকুরকে দেখেছো, তোমার আবার ভয় কি?"

একটু থেমে আবার বললেন, "যদি শান্তি চাও মা, কারুর দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎটাকে আপনার ক'রে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, এ জগৎ যে তোমার নিজেরই।" মুমূর্ষু এবং আর্ত, ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর জন্য এটাই তাঁর শেষ বাণী।

এরপর প্রায় তিন দিন অবস্থান করেন আত্মলীন হয়ে, প্রায় নির্বাক অবস্থায়। ১৯২০ সালের ২১শে জুলাইর নিশীথ রাতে চিরবিদায়ের ক্ষণটি ঘনিয়ে আসে। রোগক্লিষ্ট বিশীর্ণ আননে ফুটে ওঠে দিব্যজ্যোতির আভা, মহাসাধিকা সারদামণি ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন মহাসমাধিতে।

যশোদা মাঈ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। জানুয়ারীর শেষ ভাগ। এ সময়ে উত্তর ভারতের নানা জায়গায় পরিব্রাজন ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ এসে পৌঁছেছেন গাজীপুরে। উঠেছেন বাল্যবন্ধু সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে। স্বামীজীর ইচ্ছা, এখানে কিছুদিন থেকে মহাত্মা পওহারী বাবাকে দর্শন করবেন, কৃতার্থ হবেন তাঁর আশীর্বাদ লাভে।

গগনচন্দ্র রায় মহাশয় এখানকার প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এক গণ্যমান্য ব্যক্তি। ধর্মপ্রাণ ও কৃষ্টিসম্পন্ন বলে তাঁর খ্যাতি যথেষ্ট। সর্বোপরি, পওহারী বাবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলেও এ অঞ্চলে তিনি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তাছাড়া প্রায়ই তাঁর বাড়িতে ছোটখাটো একটি ধর্মসভা বসে, সাধুসজ্জনেরা তাতে আমন্ত্রিত হন। স্বামীজীর সন্ধান পেয়ে গগনবাবু পরম আগ্রহে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন।

এই সুপণ্ডিত, তেজস্বী সন্ন্যাসীর অগ্নিগর্ভ বাণী শুনে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে যান, তাঁর মধুর কণ্ঠের অধ্যাত্মসংগীত শুনে মন প্রাণ তাদের উদ্বেল হয়ে ওঠে। স্বামীজীকে ঘিরে সেখানে আনন্দের হাট বসে যায়।

হঠাৎ এক সময়ে স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ে গগনচন্দ্রের নয় বৎসর বয়স্কা বালিকা কন্যার দিকে। ফুটফুটে রং, সারা অঙ্গে লাবণ্যশ্রী, আয়ত নয়ন দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝক্‌ঝক্ করছে। একদৃষ্টে স্বামীজী চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। বড় বিস্ময়কর এই বালিকার আকর্ষণ।

গগন রায় মহাশয় সোৎসাহে পরিচয় করালেন, "স্বামীজী, এটি আমারই মেয়ে—নাম মণিকা। আপনি দয়া ক'রে একে একটু আশীর্বাদ করুন।"

"আপনার এ মেয়েকে আশীর্বাদ অনেক আগেই আমি করেছি।

এবার করতে চাই মাতৃরূপে তার অর্চনা।—" স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

গগনচন্দ্র চমকে ওঠেন। এ কি অদ্ভুত কথা এই শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী অতিথির মুখে।

প্রসন্নমধুর কণ্ঠে স্বামীজী বলেন, "বড় শুদ্ধসত্ত্ব আপনার কন্যা। দর্শনের পর থেকেই আমার মনে সংকল্প জেগেছে একে আমি অর্চনা করবো দেবী জগন্মাতা জ্ঞানে। আপনারা আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করুন, কুমারী পুজোর আয়োজন ক'রে দিন।"

গগনচন্দ্রের আনন্দের অবধি নেই। পরদিন এক শুভলগ্নে কুমারী পূজার অনুষ্ঠান হল তাঁর ভবনে। স্বামীজী সেদিন অপরূপ ভাবাবেশে উদ্দীপিত। জগন্মাতার আরাধনা শেষ ক'রেই তিনি নিমজ্জিত হলেন ধ্যানের গভীরে।

ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হবার পর স্বামীজীর কণ্ঠ হতে নির্গত হল অর্ধস্ফুট মন্তব্য—"এ বালিকা সামান্যা মানবী নয়। জন্মান্তরের বিপুল সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়ে এ জন্মেছে।"

উত্তরকালে স্বামীজীর এই বাণী সত্য হয়ে ওঠে গগনচন্দ্রের কন্যা মণিকার জীবনে। অপূর্ব আধ্যাত্মিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তিনি অধিষ্ঠিতা হন এক অসামান্য বৈষ্ণব সাধিকার আসনে। ভক্ত জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর 'যশোদা মাঈ' নাম। বারাণসী, আলমোড়া আর মের্তোলার 'উত্তর-বৃন্দাবনে'র বহু সাধক ও সাধুসজ্জনের পালয়িত্রী ও প্রেরণাদাত্রীরূপে দেখা যায় তাঁর অভ্যুদয়।

যশোদা মাঈর জন্ম হয় উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। বাল্য ও কৈশোর থেকেই তাঁর জীবনে অঙ্কুরিত হয় সহজাত ভক্তি ও ভগবৎ-প্রেম। এই সঙ্গে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে যশোদা মাঈর বিবাহ হয়। এই বিবাহ সম্পন্ন হবার পর থেকে তাঁর জীবনধারা প্রবাহিত হয় এক নূতনতর খাতে।

মনস্বী ও কর্মকুশল বলে জ্ঞানেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল। তাছাড়া, দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল তাঁর সহজাত। প্রথম জীবনে থিয়োসফি আন্দোলনের অন্যতম নায়করূপে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সাধনজীবনে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, প্রেম-ভক্তিরসের প্রবল প্রবাহ তাঁকে আকুল ক'রে তোলে। বৈষ্ণবীয় সাধনা ও সিদ্ধির পথে অনেক দূর তিনি অগ্রসর হতে সমর্থ হন। স্বামীর মহৎ চরিত্রের আদর্শ, তাঁর আত্মিক জীবনের প্রেরণা, যশোদা মাঈকে বৎসরের পর বৎসর প্রভাবিত করতে থাকে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন আদর্শ শিক্ষাবিদ্, মনীষী ও ভাবুক মানুষ। উত্তর ভারতের শিক্ষিত-সমাজের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ব'লে, বিশিষ্ট সাধক পুরুষ ব'লে, এই বাঙালী অধ্যাপক দীর্ঘদিন পরিচিত ছিলেন।

সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই তাঁর ছিল অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও মানমর্যাদা। স্যর হারকোর্ট বাটলার তখন সবেমাত্র লাখ্‌নৌ ইউনিভার্সিটির পত্তন করেছেন। ভালো ক'রে এটিকে গড়ে তোলবার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি নেই। দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর, তাই দৃষ্টি পড়ল প্রতিভাধর জ্ঞানেন্দ্রনাথের ওপর। ডেকে এনে বললেন, "এই নূতন ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ তোমায় গ্রহণ করতে হবে, নিতে হবে সমস্ত দায়িত্বের ভার। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির চাইতেও একে বড় ক'রে তোল, এই আমি চাই।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ এ ভার গ্রহণ করেন। নিজের অসাধারণ দক্ষতা মনস্বিতা ও নেতৃত্ব শক্তির বলে ইউনিভার্সিটিকে করে তোলেন প্রাণবন্ত। শিক্ষা-সংগঠনের বিশিষ্ট নেতারূপে এসময়ে তাঁর খ্যাতি দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এ সময়ে ইউনিভার্সিটি ছাড়া আর একটি বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন পরমোৎসাহী, তা হচ্ছে থিয়োসফি। এর নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন, সক্রিয় অংশ গ্রহণ

কবতেন এই আন্দোলনে। চিকাগোব যে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মেব জয পতাকা উড্ডীন কবেন, সেই সম্মেলনে জ্ঞানেন্দ্রনাথ উপস্থিত হন অন্যতম সদস্যরূপে। সেখানে ভাবতীয থিযোসফিস্টদেব প্রতিনিধিত্ব কবেছিলেন তিনি।

স্বামীব সাথে যশোদা মাঈকেও ঘুরে বেডাতে হযেছে বিশ্বেব নানা অঞ্চলে। ইউবোপ ও আমেবিকাব শিক্ষিতসমাজে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কবেছেন, আধুনিক বীতিনীতি ও চালচলনে হযেছেন অভ্যস্তা। বেশভূষাব ফ্যাসানেও তাঁব মতো অগ্রণী মহিলা তখনকাব লখ্‌নৌব সমাজে খুব বেশী দেখা যায নি। দীর্ঘকাল সেখানকাব অভিজাত বমণীদেব তিনি ছিলেন মধ্যমণি।

লখ্‌নৌতে থাকাব কালেই ঘটতে দেখা যায যশোদা মাঈব অধ্যাত্ম-জীবনেব উন্মেষ। জীবনেব বাতাযনে হঠাৎ একদিন আসে অতীন্দ্রিয়-লোকেব আলোর ঝিলিক। অনাস্বাদিতপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি বাব বাব তাঁকে উচ্চকিত ক'বে তুলতে থাকে।

থিযোসফিস্ট নেতা জ্ঞানেন্দ্রনাথেব অন্তর্জীবনেও ইতিমধ্যে এসে গিযেছে এক দূবপ্রসাবী পবিবর্তন। ভক্তিপ্রেমবসেব অমৃত প্রস্রবণ খুলে গিযেছে তাঁব মর্মলোকে।

বৈষ্ণবীয ধর্মেব নিগূঢ তত্ত্ব ভাবনায আজকাল তিনি সদা মত্ত। তাঁব এই রূপান্তবেব ছোঁযা অজানিতে কখন যেন যশোদা মাঈব জীবনেও লেগে গিযেছে। পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কাব হযে উঠেছে উদ্দীপিত। অন্তবাত্মা তাঁব ব্যাকুল হযে কেবলি হাতডে বেডাচ্ছে নূতনতর জীবনেব পথ।

কিছুদিন থেকে চক্রবর্তী দম্পতিব স্নেহাশ্রয লাভ কবেছেন এক তরুণ ইংবেজ যুবক। নাম তাঁব বোনাল্ড নিক্‌সন। লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালযে ইংবেজী সাহিত্যেব অধ্যাপকেব কাজ নিযে এসেছেন। বাস-ভবন এখনো নির্ধাবিত হয নি, তাই বাস কবছেন ভাইস-চ্যান্সেলাব জ্ঞানেন্দ্রনাথেবই ভবনে। এই ইংবেজ তনযকে যশোদা

মাঈ অপার স্নেহ ও করুণায় গ্রহণ করেছেন, দেখছেন তাঁকে আপন তনয়ের মতো। যশোদা মাঈর মধ্যে নিক্সনও প্রাপ্ত হয়েছেন এক মমতাময়ী মাতৃমূর্তিকে, আর দিনের পর দিন বর্ধিত হচ্ছেন তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায়।

যশোদা মাঈকে নিয়ে এক একদিন কিন্তু নিক্সনকে বড় ধাঁধায় পড়তে হয়। কি এক দুর্বোধ্য রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে তাঁর এই মাঁকে ঘিরে। চক্রবর্তী ভবনে মাঝে মাঝে পার্টি আর অ্যাট্‌হোম্ অনুষ্ঠিত হয়, শহরের সম্ভ্রান্ত নরনারীরা সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। যশোদা মাঈ-ই হচ্ছেন এ সব উৎসব অনুষ্ঠানের আনন্দউৎস। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রূপের প্রভায়, হাস্যোজ্জ্বল সম্ভাষণে, আলাপ-আলোচনায় গৃহ অঙ্গন মুখর হয়ে ওঠে। অভ্যাগতেরা আপ্যায়িত হন, মুগ্ধ হয়ে যান।

কিন্তু এই আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশে, বন্ধু-বান্ধবীদের হাসিহুল্লোড়ের মাঝে এক এক সময়ে যশোদা মাঈ কেন এমন উচ্চকিত হয়ে ওঠেন? এমন চঞ্চল হতেই বা তাঁকে দেখা যায় কেন? বহিরঙ্গ জীবনের তরঙ্গভঙ্গ এক মুহূর্তে কি জানি কেন শান্ত হয়ে যায়। চকিত চোখে মুখে নেমে আসে গাম্ভীর্যের আবরণ।

স্বগৃহে অনুষ্ঠিত সেদিনকার এক পার্টিতে ঘটল এমনতর এক অদ্ভুত ভাবান্তর। অতিথিদের নিয়ে বসে যশোদা মাঈ গল্পগুজব হাসি-কৌতুক ও সংগীতে মেতে রয়েছেন, ড্রয়িংরুম মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর কলহাস্যে। আচম্বিতে কেন যেন তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন, গম্ভীর মুখে কক্ষ থেকে বার হয়ে প্রবেশ করলেন শয়নগৃহে।

মায়ের এই অদ্ভুত আচরণ রোনাল্ড নিক্সনের দৃষ্টি এড়ায় নি। নিঃশব্দে অনুসরণ করলেন তিনি, ভেজানো দরজায় উঁকি মেরে দেখলেন ধ্যান নিমীলিত নেত্রে, অর্ধবাহ্য অবস্থায় যশোদা মাঈ শয্যার ওপর উপবিষ্ট রয়েছেন। নিশ্চল নিশ্চুপ একেবারে অন্য জগতের মানুষ।

খানিক বাদেই কিন্তু বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে যশোদা মাঈর।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন আসন থেকে। শিথিল কবরী এঁটে বেঁধে নেন, নূতন ক'রে করেন প্রসাধন। রুজ্ লিপস্টিকের ছোঁয়া নূতন ক'রে লাগিয়ে, বেশবাস গুছিয়ে নিয়ে, আবার ড্রয়িংরুমে এসে যোগ দেন অভ্যাগতদের সাথে।

এতদিন নিরঞ্জন যে সন্দেহ পোষণ করছিলেন, এবার তা ঘনীভূত হয়। যশোদা মাঈর বহিরঙ্গ জীবনের যে চাকচিক্য, আসলে তা কিছু নয়। জীবনের গোপন পর্দাতে তাঁর উৎসারিত হয়ে চলেছে অন্তঃসঞ্চারী অধ্যাত্মরসের বহুধারা। এবার সে ধারাপথ বেয়ে নামছে স্ফীতকায় বন্যার প্রবাহ। তার মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে যশোদা মাঈর জীবনসত্তা।

রহস্যভেদের জন্য নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, ব্যাকুলভাবে করেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন। উত্তরে যশোদা মাঈকে সব কথা ভেঙে বলতে হয়ঃ হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন নিরঞ্জন। বেশ কিছুদিন যাবৎ যশোদা মাঈর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এসে গিয়েছে। অযাচিতভাবে উন্মোচিত হয়েছে অজানা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। লীলাময় বালগোপালজী যখন তখন আবির্ভূত হতে শুরু করেছেন তাঁর নয়নসমক্ষে। জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রভুজীর পরম প্রকাশ এক একদিন ঘটে যায়, আর তাঁর অসমোর্ধ মাধুর্যে যশোদা মাঈ আত্ম-হারা হয়ে পড়েন। সুতীব্র রসানুভূতিতে সারা দেহ মন বিহ্বল হয়ে ওঠে। তাইতো ঐ অতীন্দ্রিয় দর্শনের কালে তিনি হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যান। বন্ধুবান্ধবীদের সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে অপসৃত ক'রে নেন, প্রবেশ করেন নিভৃত কক্ষে। শুরু হয় তীব্র ভাবাবেশ আর ধ্যান তন্ময়তা।

মায়ের এই রূপান্তর লক্ষ্য ক'রে, তাঁর মুখ থেকে এ অপূর্ব অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা শুনে নিরঞ্জন বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে যান।

কি ক'রে, কোন্ পথ ধরে, যশোদা মাঈ এই নূতনতর অধ্যাত্ম-রসের তরঙ্গে ভেসে গিয়েছেন, তা তিনি নিজেও ভাল ক'রে বুঝতে

পাবেন নি আজ অবধি। স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনধারায় মোড় বেশ কিছুদিন যাবৎ ঘুরে গিয়েছিল। থিয়োসফির রহস্যবাদ ছেড়ে তিনি অনুসরণ করছিলেন প্রেম-ভক্তির নিগূঢ় সাধন পথ। প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ও পণ্ডিতদের সাথেই এ সময়ে দেখা যেত তাঁর বেশী ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য। স্বামীর এই বৈষ্ণবীয় মনোবৃত্তির স্পর্শ ধীরে ধীরে যশোদা মাঈর জীবনেও এসে লাগে। প্রাণে জেগে ওঠে প্রবল আকুতি।

যশোদা মাঈর পিতৃকুল বৈষ্ণব ভাবধারার জন্য বিখ্যাত। পিতা গগনচন্দ্র নিজেও ছিলেন প্রেমভক্তির সাধনায় উন্নত। এই সাধনার প্রভাব স্বভাবতই যশোদা মাঈকে ছোটবেলায় অনেকাংশে গড়ে তোলে।

কিন্তু যশোদা মাঈর সাধনা ও সিদ্ধির মূলে সব চাইতে বেশী ছিল তাঁর জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার। এবার ঐশ কৃপায় সে সংস্কার নূতন ক'রে উদ্বোধিত হয়ে ওঠে। এরই ফলে মাঝে মাঝে ঘটতে থাকে অপরূপ দিব্যদর্শন। অহেতুক কৃপার মধুভাণ্ডটি উন্মোচন ক'রে, জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হন তাঁর জন্মজন্মান্তরের ইষ্টদেব শ্রীশ্রীবালগোপাল।

প্রভুজীর এই দিব্যদর্শন ও হাতছানি, ভাবাবেশ আর ধ্যানতন্ময়তা, যশোদা মাঈকে দিনের পর দিন টেনে নিয়ে যায় ভক্তিসাধনার তুঙ্গ শিখরে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাধিকা যশোদা মাঈর মানসপুত্ররূপে গৃহীত হয়েছিলেন রোনাল্ড নিক্‌সন। উত্তর জীবনে ভারতীয় সাধক-জীবনে ইনিই পরিচিত হয়ে ওঠেন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ কৃষ্ণপ্রেম নামে। এই মানসপুত্রেরই সাধনসত্তায় বিশেষ ক'রে প্রতিফলিত হয়েছিল মহাসাধিকা যশোদা মাঈর ঋদ্ধি ও সিদ্ধিময় জীবনের আলোকচ্ছটা।

মণিকাদেবী তখনো রূপান্তরিতা হন নি প্রখ্যাতা সাধিকা যশোদা

মাঙ্গরূপে। তাঁর আভ্যন্তরীণ জীবনে তখন চলছে একটা দ্রুত পরিবর্তন। অন্তরঙ্গ মহলের কেউ কেউ এ পরিবর্তন কিছুটা লক্ষ্য করেছেন, হয়েছেন বিস্মিত ও বিমুগ্ধ। ভক্ত সাধক, সুরশিল্পী দিলীপ-কুমার রায় সে সময়ে চক্রবর্তী পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরূপে মণিকাদেবী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "মণিকাদেবীকে আমি আখ্যা দিয়েছিলাম, 'দাম্ দ্য সালো',—সামাজিক মিলনউৎসবের মধ্যমণি। কারণ, জন্মেছিলেন তিনি সম্ভ্রান্ত গৃহে। শিক্ষায় দীক্ষায় ছিলেন বরনারী। আপাদমস্তক অভিজাতমণ্ডিত, রূপেগুণে ব্যক্তিত্বে নয়নমন ভোলানো এই মহিলা, ছিলেন সহজাত সামাজিক নেতৃত্বের অধিকারিণী, ছিলেন এক 'বর্ন হোস্টেস্'।

"কিন্তু ক্রমেই উপলব্ধি করলুম, আসলে বাইরে যা দেখছি, ঠিক তেমনটি তিনি নন। একটা গভীরতর আত্মিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর ভেতরে যা বাইরে থেকে হঠাৎ ধরা পড়ে না। এটা ধরা পড়ে তারই চোখে যে বাইরের চাকচিক্যে না ভুলে, সন্ধানী দৃষ্টিকে চালনা করে তাঁর সেই ভেতরকার আসল ব্যক্তিত্বের দিকে। এ সত্যটি আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল—যখন দেখলুম ভক্তিরসের সংগীত শুনে, বিশেষ ক রে বাংলা কীর্তন ও ভজন শুনে কি বিস্ময়কর ভাবের জোয়ার উথলে ওঠে তাঁর সারা সত্তায়, প্রভুর দরদভরা বাঁশীর কথা, তাঁর প্রেমলীলার কথা, গাইবা মাত্র অঝোর ধারে দুচোখ বেয়ে তাঁর ঝরে পড়ে অশ্রুধারা।

"আরো লক্ষ্য করতুম, এসময়ে কৃষ্ণপ্রেম (নিক্‌সন) কি অপার শ্রদ্ধা নিয়ে মণিকাদেবীর এই ভাবময় মূর্তির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতো। 'গোপাল' বলে আদর ক'রে তিনি যখন তখন ডাকতেন, (এ যেন নীলমণি কৃষ্ণকে ডাক দিয়েছেন মমতাময়ী মা যশোদা) রোনাল্ড নিক্‌সন সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ত তাঁর চরণতলে। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, সিংহসম পুরুষ, নিক্‌সন যেভাবে তাঁর সম্মুখে মেষ শাবকটির মতো হয়ে যেতো, তা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকতো না। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে যে তাঁকে গুরুরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, তা

আমি জানতুম না। এ ঘটনাটি জানতে পেরেছিলুম প্রায় এক বৎসর বাদে।"

একদিন লখ্‌নৌতে সংগীতের আসরে প্রাণঢালা ভজন গাইছিলেন দিলীপকুমার। কৃষ্ণপ্রেম-রসের প্লাবন বয়ে গেল সেখানে, আর এই প্লাবনে কোথায় কোন্ অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে ভেসে গেলেন মণিকাদেবী, ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেল বাহ্যজ্ঞান। তখন তিনি যেন অন্য জগতের মানুষ।

মণিকাদেবীর এই দ্বৈতসত্তা সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমকে একান্তে প্রশ্ন করলেন সেদিন দিলীপকুমার। বললেন, "যখন এঁকে দেখি পার্টিতে, সামাজিক উৎসবে হাসি আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠছেন, সিগারেট খাচ্ছেন, রসিকতা ও রঙ্গরসে উজিয়ে তুলছেন সবাইকে, সবাইর মুগ্ধ দৃষ্টি ঘিরে আছে শুধু এঁকেই, সব কিছুর মধ্যমণি ইনিই। বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ-আলোচনা আর বিতর্কে সবাইকে যখন সচকিত ক'রে তোলেন, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আমি এই মণিকাদেবীর দিকে। আবার যখন কৃষ্ণকথা নিয়ে ভজন শুরু করি, তখন দেখি অন্যতর রূপ, ভাবাবেশে কেঁদে ভাসাচ্ছেন, এ যেন আর একটি নূতন মানুষ। কৃষ্ণপ্রেম। এক এক সময়ে মনে হয় আমার, উনি সত্যিই এক ভিন্ন জগতের লোক, আত্মার গভীরে নিভৃতে বিচরণ করছেন এই প্রচ্ছন্ন সাধিকা!"

স্নেহভরে দিলীপকুমারের পিঠ চাপড়ে কৃষ্ণপ্রেম বললেন, "তোমার একথায় আমি সায় দিই দিলীপ। আমি খুশী হলাম অন্য লোকের মতো তুমি বাইরের দিকটা দেখে তোমার সিদ্ধান্ত নাও নি। অনেকে এঁকে জানে অভিজাত মহলের মক্ষীরাণী বলে, তার বেশী আর কিছু যেন ইনি নন। এঁকে ধরা, মূল্যায়ন করা মোটেই সহজ নয়। এঁকে বিশ্বাস করতে হবে, এঁর ওপর নির্ভর করতে হবে, তবেই তো আসবে উপলব্ধি। বোধ হয় ধরতে পেরেছো আমার একথার নিহিতার্থ?"[১]

১ যোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—দিলীপকুমার রায়।

গুরুগত প্রাণ, যশোদা মাঈব কৃপাপ্রাপ্ত, বোনাল্ড নিক্সন কি ক'বে কৃষ্ণপ্রেম হলেন, ৰূপান্তবিত হলেন, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষৰূপে, সেকথাটি একটু সংক্ষেপে বলে নেওযা ভালো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে। অন্যান্য দেশপ্রেমিকদেব মতো, ব্রিটিশ যুবক বোনাল্ড নিক্সনও কলেজেব পড়া স্থগিত বেখে যোগ দিযেছেন সামবিক বাহিনীতে। বযেল এযাব ফোর্সে পাইলটেব শিক্ষা নিযে অবতীর্ণ বযেছেন সমবাঙ্গনে।

এসময়ে একদিনেব দৈব ঘটনা তাঁব জীবনে নিযে আসে বৈপ্লবিক পবিবর্তন। বম্বাব প্লেনেব ককপিটে বসে উড়ে চলেছেন তিনি জার্মানীব উপব বোমা বর্ষণেব জন্য। হঠাৎ এক অলৌকিক ভাবেব আবেশে আবিষ্ট হযে পড়লেন তিনি, ক্রমে সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেল। যখন জ্ঞান হল, দেখলেন, ব্রিটিশ এবোড্রোমে সুস্থ দেহে ফিবে এসেছেন। সঙ্গীবা বললেন, "আজ মৃত্যুব বিবব থেকে বেঁচে এসেছো তুমি। জার্মান জঙ্গী বিমানগুলো ওত পেতে ছিল, অনেক বম্বাবকে ঘাযেল কবেছে, তুমি কি ক'বে যেন ছিটকে চলে এসেছো বিপদেব গণ্ডী অতিক্রম ক'বে।"

নিক্সনেব বিশ্বাস তিনি সংজ্ঞা হাবিযেছিলেন, প্লেনকে নিবাপদ ক্ষেত্রে এনে দিযেছে তাঁব বক্ষাকারী দৈবী শক্তি, তাঁব পবমপ্রভু ঈশ্বরই সবিয়ে এনেছেন তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুব মুখ থেকে।

জীবনেব মোড় এবাব তাঁব ঘুবে গেল। অধ্যাত্মসাহিত্য আর অধ্যাত্মবিচাব ও চিন্তা এখন থেকে হল তাঁব উপজীব্য।

এই সঙ্গে জেগে উঠল পূর্ব জীবনেব এক সুপ্ত সংস্কাব। বাব বার মনে পড়তে লাগল ভাবতবর্ষেব কথা, ভাবতীয সাধনা ও সাধু-সন্তদেব কথা। স্থিব কবলেন, ভাবতে গিযে বসবাস করবেন, গ্রহণ কববেন ভাবতেব অধ্যাত্মসাধনাব প্রকৃত পবিচয। নিজ মুমুক্ষার পথটি বেছে নিযে শুরু কববেন নূতনতর অভিযাত্রা। দৈবক্রমে সুযোগ শিগগীবই মিলে গেল, অল্প কিছুদিনেব মধ্যে লখ্নৌব ভাইস্-চ্যান্সেলাব ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এসে উপস্থিত হলেন ইংল্যাণ্ডে।

নিক্‌সন তাঁব সাথে পবিচিত হলেন, তাবপব অধ্যাপকেব পদ গ্রহণ ক'বে চলে এলেন ভাবতে, লখ্‌নৌ শহবে। এখানে এসে পেলেন মাতৃস্বৰূপিণী যশোদা মাঈব পবিত্র সান্নিধ্য ও স্নেহচ্ছাযা এঁবই প্রেবণায তাঁব জীবনক্ষেত্রে প্রবাহিত হল ভক্তিপ্রেমেব অপূর্ব বসস্রোত।

অতঃপব যশোদা মাঈব জীবনে খুলে যায অমৃতলোকেব সিংহদ্বাব। দিনেব পব দিন তিনি অভিসিঞ্চিত হতে থাকেন তাঁব বালগোপালেব স্নেহপ্রেমে। লীলাময়েব বসেব খেলাব যেন আব অন্ত নেই। এই খেলাব মধ্য দিযে জেগে উঠছে নিত্য নূতন অনুভূতি, ঘটছে নূতন নূতন চমকপ্রদ দর্শন। ক্রমে কৃষ্ণ-ধ্যানের গভীবে নিমজ্জিত হতে লাগলেন যশোদা মাঈ, কৃষ্ণকৃপাব অমৃতপ্রবাহ ওতপ্রোত হযে উঠল তাঁব সাধনময জীবনে, উত্তবণ ঘটালো সিদ্ধিপ্রাপ্তা এক বৈষ্ণব সাধিকাৰূপে।

তাঁবই ধর্মপুত্র বোনাল্ড নিক্‌সনেব জীবনেও ইতিমধ্যে এসে গেছে এক বিবাট পবিবর্তন। গোড়াব দিকে বৌদ্ধ দর্শন ও সাধনতত্ত্বের ওপব তাঁব ঝোঁক ছিল। এ সম্বন্ধে বহুতব গ্রন্থাদি তিনি অধ্যযনও কবেছিলেন। এদেশে আসাব পবও অধ্যযন ও তত্ত্বানুসন্ধানে ছেদ পড়ে নি। এবার পবিবর্তিত হল তাঁব সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী। যশোদা মাঈব অলৌকিক অভিজ্ঞতাব বর্ণনা, তাঁব গোপালেব কৃপালীলাব কথা— নিক্‌সনেব জীবন-দর্শনে ঘটালো দূবপ্রসাবী বিপ্লব। শ্রদ্ধেযা ধর্মমাতাব উপলব্ধ সত্যকেই সারা মনপ্রাণ দিযে গ্রহণ কবলেন নিজেব আদর্শ ও সাধন-লক্ষ্যৰূপে। অফুবন্ত স্নেহপ্রেমেব আধাব যশোদা মাঈ এখন থেকে হলেন তাঁর অধ্যাত্মজীবনেব প্রেবণাদাত্রী। কৃষ্ণপ্রেমেব বসসমুদ্রেব দিকে ধাবিত হলেন বোনাল্ড নিক্‌সন।

যশোদা মাঈ তাঁব এই ধর্মপুত্রকে ডাকেন গোপাল বলে। এবাব গোপালেব অধ্যাত্মজীবনেব ভিত্তি গড়ে তুলতে ব্রতী হলেন তিনি। গোড়াতেই বলে দিলেন, "পবমপ্রাপ্তিব জন্য তুমি ব্যাকুল হযেছো, কিন্তু,

বাবা, তার প্রস্তুতি দরকার। এ দেশের প্রেমভক্তি-পথের সন্ধান করতে হলে আগে এখানকার সমাজে মনন, চিন্তন ও ভাবময়তাকে আয়ত্ত করতে হবে। শিখতে হবে এদেশের ভাষা, অধিগত করতে হবে সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র।"

এই নির্দেশ নিক্সন তখনি শিরোধার্য ক'রে নেন, হিন্দি, বাংলা, সংস্কৃত শিক্ষায় তিনি লেগে যান কোমর বেঁধে। এসময়ে যশোদা মাঈ এক সুন্দর কৌশল উদ্ভাবন করেন নিক্সনের ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্যে। দেশীয় ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ তিনি নিক্সনের কাছে অনুবাদ ক'রে পাঠ করতেন, আর এই পুরাণ শ্রবণের ভেতর দিয়ে সাধকপুত্র আয়ত্ত করতেন এদেশের ভাষা ভাব ও ধর্মতত্ত্ব। বিশেষ ক'রে মহাভারত ও ভাগবত শ্রবণের মধ্যে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও মাধুর্য তাঁর হৃদয়ে স্ফুরিত হয়ে ওঠে, ভাবতে থাকেন তাঁকে ইষ্টরূপে।

এই সঙ্গে বৈষ্ণবীয় সাধনার নানা নিগূঢ় নির্দেশ দিয়েও যশোদা মাঈ নিক্সনের ধর্মজীবনকে উন্নততর ক'রে তুলতে থাকেন।

যশোদা মাঈকে সেদিন কিন্তু এক বিপদে পড়তে হল। নিক্সন এসে বললেন, "মা, কিছুদিন যাবৎই মনে ইচ্ছে জেগেছে, আমি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হবো, আর সন্ন্যাস নেবো। এবার সে ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠেছে। বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। আমার একান্ত ইচ্ছা—তুমি আমায় দীক্ষা ও সন্ন্যাস দাও, কৃষ্ণভজনের সত্যকার অধিকার আমায় অর্জন করতে দাও।"

যশোদা মাঈ উত্তরে বলেন, "গোপাল, একি কথা বলছো, বাবা। সংসারাশ্রমে থেকে সাধনভজন করছো, এই-ই তো ভালো। সন্ন্যাস নেওয়া আবার কেন? তুমি অভিজাত ইংরেজ ঘরের ছেলে, সুপণ্ডিত, কর্মকুশল। আর কিছুদিন পরে যে ইউনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলার হবে তুমি।"

"সন্ন্যাস নেবো বলেই যে আমি সংকল্প করেছি মা, তার অন্যথা হয় না।"

"বেশ বাবা, সন্ন্যাস তুমি নাও। কিন্তু আমার পক্ষে তো তোমার সন্ন্যাসগুরু হওয়া চলবে না। এক বড় প্রতিবন্ধক রয়েছে। আমি নিজে সন্ন্যাস নিই নি, তবে তা কি ক'রে তোমায় দেবো? তাছাড়া সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছো, গুরুপরম্পরা তো থাকা চাই। তুমি বরং বৃন্দাবনের কোনো সিদ্ধ বৈষ্ণব-আচার্যের কাছ থেকে দীক্ষা ও সন্ন্যাস নিয়ে এসো।"

নিক্‌সন তাতে সম্মত নন। বললেন, "মা, তোমার কাছেই পেয়েছি পরম পথের সন্ধান, পেয়েছি কৃষ্ণ ভক্তিরসের আস্বাদন। এ জীবনে সন্ন্যাস যদি নিতেই হয়, তা তোমার কাছেই নেব, আর কারুর কাছ থেকে নয়।

নিক্‌সন ভেবে দেখেছেন,—যশোদা মাঈ ছাড়া জীবনে তাঁর আর কোনো সত্যকার আশ্রয় নেই। ইংল্যাণ্ডের গৃহ পরিবার, সমাজ, ধর্মসংস্কৃতি সব কিছু চিরতরে ত্যাগ ক'রে তিনি চেয়ে আছেন শুধু এই মায়েরই মুখের দিকে। যশোদা মাঈর প্রেরণাই উদ্বোধিত করেছে তাঁকে, এনে দিয়েছে তাঁর জীবনে ভারতীয় প্রেমভক্তি সাধনার দিগ্‌দর্শন। এখনো দিনের পর দিন এই মা-ই সে আলোকবর্তিকার মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন তাঁর সাধনপথের সম্মুখে। মা ছাড়া রোনাল্ড নিক্‌সনের জীবনে নেই কোনো অস্তিত্ব, নেই কোনো পরম সম্ভাবনা। গুরুবরণ যদি করতেই হয়, মাকেই তিনি করবেন এজন্য মনোনীত।

এসব সমস্যার স্থলে যশোদা মাঈ নির্দেশ প্রার্থনা করতেন কৃষ্ণশক্তি শ্রীশ্রীরাধারাণীর কাছে। দিব্যদর্শনের ভেতর দিয়ে সেদিন প্রিয়াজীর প্রত্যাদেশ পাওয়া গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যশোদা মাঈ। নিক্‌সনকে ডেকে বললেন, "গোপাল, রাধারাণীর অনুমতি আমি পেয়েছি। তোমায় আমি দীক্ষা দেবো, কিন্তু এখনই নয়। তোমায় সামান্য কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। আমি বৃন্দাবনে গিয়ে আগে সন্ন্যাস নেবো, সেখান থেকে ফিরে আসবার পর পূর্ণ করবো তোমার প্রার্থনা।'

বাধাবমণজীউব মন্দিব বৃন্দাবন ধামেব এক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবীয় সাধনকেন্দ্র। এখানকাব আচার্যেবা মধ্ব-মতাবলম্বী। শাস্ত্রবেত্তা ও উচ্চকোটিব বৈষ্ণব বলে উত্তব ও দক্ষিণ ভাবতে এঁদেব খ্যাতি ও মর্যাদা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। এখানকাব মোহান্ত, মহাত্মা বালকৃষ্ণ দাসগোস্বামীব প্রতি যশোদা মাঈ আন্তবিক শ্রদ্ধা পোষণ কবতেন। এবাব এঁবই নিকট থেকে তিনি গ্রহণ কবলেন বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস।

ভক্তিশাস্ত্রে পাবদর্শিতা এবং সাধন কুশলতাব দিক থেকে বাধাবমণ মন্দিবেব ঐতিহ্য দীর্ঘদিনেব। গোস্বামী বালকৃষ্ণদাসেব ভ্রাতা লালা দামোদব দাসজী পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে তৎকালীন বৃন্দাবনে প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোটলাল গোস্বামীজীব সাধন-উৎকর্ষ সম্বন্ধে আজো ব্রজমণ্ডলে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

নিক্সনেব প্রার্থনা পূবণেব পথে এবাব আব কোনো বাধা বইল না। সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী যশোদা মাঈ পবমানন্দে তাঁকে সন্ন্যাস আশ্রয় প্রদান কবলেন। নব নামকবণ হল—কৃষ্ণপ্রেম।

সন্ন্যাস দেবাব পূর্বে যশোদা মাঈ দুটি শর্ত কৃষ্ণপ্রেমকে দিয়ে অঙ্গীকাব কবিয়ে নেন। তাঁকে বলেন, "গোপাল, এই নূতনতব জীবনে প্রবেশেব প্রাক্কালে দুটো সংকল্প তোমায় গ্রহণ কবতে হবে। প্রথমত, এ জীবনে ঈশ্বব দর্শন হোক বা না হোক এই গুরুপবম্পবা আব প্রেমভক্তি সাধনাব এই বিশেষ প্রণালী জীবনে তুমি ত্যাগ কবতে পাববে না। দ্বিতীয়ত, সাধনাব পথে চলতে গিয়ে অলৌকিক দর্শনাদিব জন্য তুমি লুব্ধ হবে না। এ বিষয়ে থাকতে হবে সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত হয়ে।"

গুরু যশোদা মাঈব কাছে এ দুটি অঙ্গীকাব কৃষ্ণপ্রেম কবেছিলেন, উত্তব-জীবনে তা বক্ষা ক'বেও চলেছেন অনন্য নিষ্ঠায়।

যশোদা মাঈব প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য, তাঁব মানসপুত্র, কৃষ্ণপ্রেমেব মধ্যে উত্তবকালে রূপায়িত হয়ে ওঠে তাঁব প্রেমভক্তি তপস্যা। এই

তপস্যার ধারাকে বহন ক'রে কৃষ্ণপ্রেম দীর্ঘকাল বর্তমান ছিলেন। যের্তোলার আশ্রম কুটিরে রাধাকৃষ্ণের সেবা ও ভজনে তিনি নিমগ্ন ছিলেন। হিমালয়ের নিভৃতিতে বাস ক'রেও সমতলের বহু সাধকের ছিলেন তিনি দিগ্‌দিশারী।

লখ্‌নৌর পর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নব কর্মস্থল হয় বারাণসী। ভারতখ্যাত নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জীর আহ্বানে ও আগ্রহাতিশয্যে তিনি হিন্দু ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেন। স্বামীর সঙ্গে এসে যশোদা মাঈকেও বারাণসীতে অবস্থান করতে হয়।

নাগোয়ার এক প্রান্তে, গঙ্গাতীরে, রাধাবাগস্থিত তাঁদের ভবনটি এ সময়ে পরিণত হয় বিখ্যাত সাধু-সজ্জনদের এক মধুচক্রে। বারাণসীর পবিত্র পরিবেশ যশোদা মাঈর সাধনার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়ে ওঠে। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভজনের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবীয় সাধনার ঊর্ধ্বতন স্তরগুলি একের পর এক তিনি অতিক্রম ক'রে চলতে থাকেন। ধীরে ধীরে অর্জন করেন অতীন্দ্রিয় দর্শনের শক্তি ও অলৌকিক বিভূতি। পূর্ব জন্মার্জিত শুদ্ধ সংস্কারের ফলে এ সময়ে যশোদা মাঈর সাধনজীবনে উন্মোচিত হয় এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

স্বনামধন্যা আনি বেসান্টের কর্মকেন্দ্র ছিল বারাণসীতে। এই পবিত্র ধামে অবস্থান ক'রে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের উজ্জীবনের জন্য, থিয়োসফির প্রচারের জন্য, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের সঙ্গে আনি বেসান্টের পরিচয় দীর্ঘদিনের, এবার সে পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। মনীষী ও সাধক জ্ঞানেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রেরণায় প্রায়ই তিনি উদ্‌বুদ্ধ হতেন, তাঁর দার্শনিকতায় হতেন চমৎকৃত। এসময়ে দেখা যেতো, আত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের নানা সমস্যায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের উপদেশ আনি বেসান্ট সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। স্বভাবতই জ্ঞানেন্দ্রনাথের স্ত্রী, সাধিকা যশোদা মাঈর প্রতিও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।

বারাণসীতে শেষ কয় বৎসরে যশোদা মাঈর সাধনৈশ্বর্যের খ্যাতি কিছু কিছু প্রচারিত হয়ে পড়ে। একদল জিজ্ঞাসু ভক্ত ও মুমুক্ষু এই সময়ে তাঁর কাছে আনাগোনা করতে থাকেন।

আনি বেসাণ্টও প্রায়ই আসেন চক্রবর্তীদের বাধাবাগ ভবনে, যশোদা মাঈর আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা ও অলৌকিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে তিনি দিন দিন আরো বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠেন। এই বিস্ময় ও শ্রদ্ধা ক্রমে পরিণত হয় প্রগাঢ় আস্থা ও অন্তরঙ্গতায়।

একদিন যশোদা মাঈকে বেসাণ্ট নিবেদন করলেন তাঁর অন্তরের অভিলাষ। বললেন, "আমি তোমায় পেতে চাই অধ্যাত্ম জীবনের পথ-প্রদর্শিকারূপে। দীক্ষা চাই আমি তোমার কাছে।"

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যশোদা মাঈ সেদিন আনি বেসাণ্টকে নিবৃত্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেন গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে। তাঁর মতে, শিষ্য হবে গুরুতে সমর্পিতপ্রাণ, অনন্যনিষ্ঠায় গুরুর নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন ক'রে তাঁকে সাধনা ক'রে যেতে হবে। আর গুরু সেই শিষ্যকেই দেবেন দীক্ষা, যার আত্মিক উন্নয়নের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করতে তিনি সমর্থ।

আনি বেসাণ্ট তখন তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত, দিনের পর দিন নিজস্ব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদ প্রচার ক'রে চলেছেন তিনি অক্লান্তভাবে। হয়তো এজন্যই যশোদা মাঈ সেদিন তাঁর অনুরোধকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

সন্ন্যাস নেবার পর যশোদা মাঈ চিরতরে চলে এলেন হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত আলমোড়ায়। সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম এবং আরো কয়েকটি পুত্র-প্রতিম ভক্ত।

প্রকৃতির রম্যলীলাভূমি কুমায়ুনের এই পার্বত্য অঞ্চল। উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে, যেদিকে তাকানো যায়, চোখে পড়ে শুধু দিগন্ত বিস্তারী পাহাড়ের ঢেউ। সবুজ আর গৈরিকের অপরূপ সমারোহ। দূরে আকাশের প্রান্তে অটল মহিমায় দণ্ডায়মান নন্দাদেবী, ত্রিশূল

প্রভৃতি উত্তুঙ্গ তুষারশৃঙ্গ। যশোদা মাঈ ও কৃষ্ণপ্রেম ঠিক করলেন, হিমালয়ের এই নিভৃত অঞ্চলে একটি স্থান নির্বাচন ক'রে স্থাপন করবেন স্থায়ী সাধন-আশ্রম। সেখানে মায়ের আশিস্‌প্রাপ্ত ভক্ত শিষ্যেরা একান্তভাবে কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণভজনে রত থাকতে পারবেন।

মানসপুত্র কৃষ্ণপ্রেমকে তিনি চিহ্নিত করলেন তাঁর এই পরিকল্পিত আশ্রমের প্রধান পরিচালক রূপে। এজন্য কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যার প্রস্তুতি দরকার, তার ব্যবস্থা করতেও যশোদা মাঈর ভুল হল না। তাঁকে ডেকে বললেন, "গোপাল, কৃষ্ণভজনের জন্য তুমি বৈরাগীর জীবন বেছে নিয়েছ, এবার বৈরাগ্যময় তপস্যা শুরু হোক তোমার জীবনে। এখন থেকে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে মেগে আনো, সেই ভিক্ষান্নে করো ইষ্টসেবা ও নিজের উদরপূর্তি। বাবা, এই ভিক্ষাবৃত্তিতে অহংজ্ঞান দূর হয়, স্ফুরণ হয় প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমের।"

গুরুর এই আদেশ কৃষ্ণপ্রেম সানন্দে শিরোধার্য ক'রে নেন। আলমোড়ার লোকের স্মৃতি থেকে আজো যশোদা মাঈর শিষ্যপ্রধান কৃষ্ণপ্রেমের সেই ভিক্ষুমূর্তি মুছে যায় নি। দীর্ঘ বপু, আজানুলম্বিত বাহু, সুগৌর-সুঠাম, সুশিক্ষিত এই ইংরেজ তনয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে উপস্থিত হতেন, জয়ধ্বনি দিতেন রাধারাণীর, আর গৃহস্থেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো সপ্রশংস দৃষ্টিতে।

আলমোড়া থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে, যাগেশ্বর মহাদেবের আস্থানের কাছে অবস্থিত মের্তোলার ক্ষুদ্র পাহাড়টি। সম্মুখে প্রসারিত রয়েছে পুণ্যময় কৈলাসের দূর দুর্গম পথ। এখানকার শান্ত পরিবেশ ও নয়নাভিরাম নৈসর্গিক রূপে যশোদা মাঈ মুগ্ধ হলেন। এই পাহাড়-টিকেই নির্বাচন করলেন তাঁর শেষ পর্যায়ের সাধনস্থানরূপে। এটি ক্রয় ক'রে এখানে পত্তন করা হল একটি নাতিবৃহৎ আশ্রম। সাড়ম্বরে এখানে স্থাপিত হলেন শ্রীরাধিকা ও শ্রীরাধারমণের বিগ্রহদ্বয়। মের্তোলার এই সেবাকেন্দ্রিক বৈষ্ণব-উপনিবেশের যশোদা মাঈ নামকরণ করলেন—উত্তর-বৃন্দাবন।

এই সময় থেকে ভক্তিসিদ্ধা সাধিকা যশোদা মাঈকে কেন্দ্র ক'রে

উত্তর-বৃন্দাবনের এই সাধনকেন্দ্র আবর্তিত হতে থাকে। তাঁর প্রেরণায় ও ভজনের আদর্শে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে নব নব উদ্দীপনা। প্রবাহিত হয় প্রেমভক্তিরসের ধারাস্রোত।

বিগ্রহ সেবা, বৈরাগ্য-সাধন ও আন্তর সাধনের ওপর যশোদা মাঈ বরাবরই অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁর নিজস্ব এই কৃষ্ণভজনের সেবা-পদ্ধতিটি তিনি শিষ্য কৃষ্ণপ্রেম ও অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের শিখিয়ে যান হাতে-কলমে। তাঁর উত্তর-সাধক, মের্তোলা উত্তর-বৃন্দাবনের ইংরেজ বৈষ্ণবদ্বয়, কৃষ্ণপ্রেম ও মাধবাশীষের নিষ্ঠাপূর্ণ দিনচর্যায় এর পরিচয় মেলে।

শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ ক'রেই সাধুদের লাগতে হয় ভজনে, ইষ্টবিগ্রহের সেবায়। কুমায়ুনের ভয়াবহ শীতেও এ ব্যবস্থায় কোনো নড়চড় হবার উপায় নেই। ঠাকুরের শয্যা-উত্থান মঙ্গলারতি, পূজা, ভোগ নিবেদন থেকে শুরু ক'রে শয়ান দেওয়া অবধি সমস্ত সেবাকর্মই করতে হয় নিখুঁতভাবে। ফুল তোলা চন্দন ঘষার সঙ্গে রান্নাবান্না, বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়ার কাজও তাঁদের স্বহস্তে করতে হয়।

আশ্রমের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বিস্তারিত চাষের খেত। অতি কষ্টে জল সেচন ক'রে তাতে জন্মানো হয় গম, আলু, বেগুন, ভিণ্ডি। নিপুণ হস্তে ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে সাধুরা নিজেরাই এগুলি সংগ্রহ করেন, খাদ্যোপযোগী ক'রে নিয়ে তা থেকে তৈরি করেন ভোগপ্রসাদ। ভোগ ও আরতি শেষ হলে অতিথি অভ্যাগত ও স্থানীয় দীন দুঃখীদের প্রসাদান্ন বেঁটে দিয়ে তবে ভক্ত সেবকেরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিগ্রহ সেবা ও দিন রাতের কর্তব্যের পালা শেষ হলে তাঁরা নিবিষ্ট হন নিজ নিজ ভজন ও ইষ্টধ্যানে।

যশোদা মাঈর উত্তর-সাধক কৃষ্ণপ্রেমকে একদিন বলেছিলাম, "আপনার গুরুর কাছে, মাঈর কাছে যে ভজনতত্ত্ব শিখেছেন তার মূল কথাটি সাধারণের উপযোগী ক'রে খুলে বলুন।"

উত্তর দিলেন, "সে মূল কথাটি হচ্ছে কৃষ্ণবিগ্রহের সেবা। সেবার চিন্তা, সেবার কর্ম চলতে থাকুক দিনরাত—এরই ভেতর দিয়ে

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ফিকে হয়ে আসবে। পরে হবে তা নিশ্চিহ্ন। আমার যেটুকু রয়েছে, মায়ের কৃপাই এই সেবার ভেতর দিয়েই হয়েছে।”

একটু থেমে আবার বললেন, “আরো, একটা কথা। ইষ্টকে ব্যাকুলভাবে ধরতে হবে দুহাত দিয়ে—এক হাতে নয়। এক হাতে সংসার, আর এক ইষ্ট—এতে কিন্তু হবে না। রাধারাণীর কৃপা তাতে মিলবে না। এই দুহাতে ধরা মানে—কোনো পেছনের টান না রেখে, বাসনা না রেখে ইষ্টসেবা ইষ্টভজন ক'রে যাওয়া। সর্বস্ব ছাড়লে তবেই তো সর্বময় এগিয়ে আসেন।”

যশোদা মাঈর ভজন ও তপস্যায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর স্থাপিত যুগল বিগ্রহ—মের্তোলা উত্তর-বৃন্দাবনের শ্রীরাধারাণী ও শ্রীরাধারমণ। ইষ্টবিগ্রহের নানা অলৌকিক কৃপার কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তাদের দু'একটি এখানে বিবৃত করব যশোদা মাঈর সাধন-সামর্থ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য।

সে-বার বিখ্যাত সাধক ও সংগীতশিল্পী দিলীপকুমার রায় মের্তোলায় এসেছেন। পূজার শেষে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে তাঁর ভজন শুরু হল, যশোদা মাঈ তখন খুব অসুস্থ, পার্শ্বস্থিত কক্ষে নিজের শয্যায় শায়িত রয়েছেন। দিলীপকুমারের ভজনের বাণী ও সুর তাঁর হৃদয়ে জাগিয়ে তুলল কৃষ্ণবিরহের আর্তি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল বিস্ময়কর অলৌকিক দর্শন। দেখলেন, ভজনকক্ষে প্রসন্নমধুর মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান রয়েছেন দিলীপকুমারের পশ্চাৎভাগে, একমনে শুনছেন তাঁর মধুর কণ্ঠের ভজন সংগীত।

যশোদা মাঈর সারা সত্তায় জেগে উঠল দিব্য আনন্দের উদ্দীপনা। চলৎশক্তিহীন রোগিনী তিনি, কিন্তু আজ যেন কোনো হুঁশই তাঁর নেই। অবলীলায় উপস্থিত হলেন পার্শ্বস্থ শ্রীমন্দিরে। ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে তৎক্ষণাৎ হলেন ধ্যানস্থ।

কিছুক্ষণ বাদে সেবকেরা যশোদা মাঈর শয়নকক্ষে গিয়ে দেখেন তিনি শয্যায় নেই। কোথায় গেলেন তিনি অমন রুগ্ন দেহ নিয়ে।

কি ক'রেই বা চলবার ক্ষমতা লাভ করলেন? এ যে মহাবিস্ময়ের ব্যাপার।

খোঁজাখুঁজি করার পর শ্রীমন্দিরে তাঁকে পাওয়া গেল। পীড়ার ভাব কেটে গেছে, চোখেমুখে ফুটে উঠেছে দিব্যজ্যোতির আভা। ইষ্টবিগ্রহের কৃপালীলা তাঁকে ক'রে তুলেছে উজ্জীবিত।

স্নিগ্ধমধুর হাস্যে দিলীপকুমারকে সেদিন বলেছিলেন যশোদা মাঈ, "দিলীপ, তোমরা কেউ ছাখো নি, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখলাম। আমার লীলাময় আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার ভজন শুনছিলেন।"

যশোদা মাঈর তপস্যায় জাগ্রত মের্তোলার শ্রীবিগ্রহ। এই বিগ্রহের লীলার প্রকাশ শুধু যশোদা মাঈর জীবনেই নয়—তাঁর উত্তর-সাধকদের জীবনেও বার বার দেখা গিয়েছে।

সাধিকা যশোদা মাঈর অন্তর্জীবন দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল তাঁর বালগোপালজীর আবির্ভাব ও লীলাখেলায়। আর বহির্জীবনে বিকশিত হয়ে উঠেছিল মাতৃত্ব ও করুণার এক স্নেহঘন রূপ। প্রভু বালগোপালজীর সেবা পূজায় যেমনি তিনি সদা উন্মুখ হয়ে থাকতেন তেমনি ব্যাকুলতা ছিল তাঁর অজস্র সংখ্যক ধর্মপুত্রের জন্য। এই মমতাময়ী যশোদা'র দৃষ্টিতে তারা এক একটি গোপাল বিশেষ। যশোদা মাঈর এই মানব-গোপালের সংখ্যা অর্ধশতের কম নয়। এদের মধ্যে দেখা যত নানা জাতি নানা বর্ণের সমাবেশ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবাই পরম সমাদরে স্থান পেতেন তাঁর বিরাট মাতৃ-হৃদয়ে। ধনী, নির্ধন, উচ্চ নীচ, অধ্যাপক, ডাক্তার, দারোয়ান, ঝাড়ুদার সবাই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে প্রাণপ্রিয় নন্দদুলালের মূর্তবিগ্রহ।

যশোদা মাঈর সিদ্ধির খ্যাতি, তাঁর বালগোপাল সেবার মনোজ্ঞ কাহিনী শুনে মা আনন্দময়ী একবার গিয়েছিলেন মের্তোলায়। আশ্রমে পৌঁছেই প্রেমভরে তিনি জড়িয়ে ধরলেন যশোদা মাঈকে। দুই মহীয়সী সাধিকার মিলনে মের্তোলার পাহাড়ে আনন্দের বান ডেকে উঠেছিল।

আশ্রমের পাশেই রয়েছে পুণ্যাদ্রি কৈলাসের দুর্গম পথ। অদূরে

যাগেশ্বর মহাদেওজীর প্রাচীন, সুপ্রসিদ্ধ মন্দির। কাজেই এ পথে তীর্থযাত্রীদের গমনাগমনের বিরাম নেই। পরিব্রাজনের পথে বহু সাধু সজ্জন ও মহাত্মা এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হতেন। এঁদের সেবা যত্নও ছিল যশোদা মাঈ ও তাঁর শিষ্যদের দিনচর্যার এক প্রধান অঙ্গ।

দীর্ঘ বৎসর শ্রীগোপাল ও তাঁর মানববিগ্রহের সেবা করেছিলেন যশোদা মাঈ, পূর্ণ হয়েছিল তাঁর সর্বাভীষ্ট। তারপর ১৯৩৪ সালের ২রা ডিসেম্বরের এক বিশেষ লগ্নে বেজে উঠল মহাপ্রয়াণের সুর। সিদ্ধ সাধিকা প্রবিষ্ট হলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় বালগোপালজীর নিত্যলীলায়।

যশোদা মাঈ নেই। কিন্তু মের্তোলার নিভৃত শৈলাশ্রমে আজো তাঁর ভক্তি-প্রেম সাধনার আগুনকে অনির্বাণ রেখে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ভক্তের দল।

সেবার কুমায়ুন পরিব্রাজনের পথে আলমোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আশ্রয় নিয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ কুটিরে। কুটিরের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট অপর্ণানন্দ মহারাজের সান্নিধ্য ও আতিথেয়তার লোভ এমনিতেই ছাড়া দায়, তদুপরি রয়েছে অদ্ভুতকর্মা জগদানন্দজীর আন্তরিক সেবাযত্ন। আলমোড়ার রামকৃষ্ণ কুটিরের রেস্ট হাউসে বেশ কিছুদিন চেপে বসে আছি, আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি আশপাশের সব দর্শনীয় বস্তু।

অপর্ণানন্দজী সেদিন অঙ্গুলি সংকেতে দেখাচ্ছিলেন রাস্তার অপর পারে অবস্থিত দেশখ্যাত বিজ্ঞানী বশী সেনের মনোরম বাংলোটি। আলমোড়ায় এসে স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক মাস এখানেই অবস্থান করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিপূত এই ভবনটি আজ তাই অগণিত ভক্তের কাছে তীর্থস্বরূপ।

ক্ষণপরেই আলমোড়ার পাহাড়ের ঢালুতে দৃষ্টি প্রসারিত হল। নিচে বহুদূরে চোখে পড়ল আর একটি শৈলভবন। আরেই এটি

দেখে এসেছি পরমোৎসাহে। ভক্ত সঙ্গে ওখানেই বাস ক'রে গেছেন যশোদা মাঈ।

মুহূর্তে স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আর যশোদা মাঈর গাজীপুরে প্রথম সাক্ষাতের সেই অপরূপ দৃশ্যটি। স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টি কি সেদিন আবিষ্কার করেছিল উত্তরকালের মহাসাধিকা যশোদা মাঈকে ?

তারপর দীর্ঘ দিনের ব্যবধান ঘটেছে, উভয়ের জীবনধারা প্রবাহিত হয়েছে বিচিত্র পথে। স্বামীজী বিশ্ব জুড়ে ছুটে বেড়িয়েছেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনবার জন্য। আর ভক্তিসিদ্ধা যশোদা মাঈ তাঁর বালগোপালের নিগূঢ় প্রেমকে বুকে ধরে লুকিয়েছেন এসে হিমালয়ের নিভৃতিতে।

দুই পৃথক ধারায় রূপ পেয়েছিল তাঁদের জীবনসাধনা। এই ধারা দুটির প্রকাশভঙ্গী আলাদা, উৎস কিন্তু ছিল একই। গন্তব্যস্থল মহাসাগরেও ছিল না কোনো পার্থক্য। বেদান্তী আর বৈষ্ণব দুই-ই যে চেয়েছিলেন মনের বিলয়, আর মহামনের মহাপ্রকাশ।

গৌরীমা

শ্রীক্ষেত্রে প্রভু জগন্নাথকে দর্শন ক'বে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন সাধিকা গোবামায়ী। কিছুদিনের জন্য স্থান নিয়েছেন বাগবাজাবেব জমিদার রাধামোহন বসুর প্রাসাদোপম ভবনে।

বাধামোহন বর্ষীয়ান্ প্রতিপত্তিশীল ধনাঢ্য ব্যক্তি, দেবদ্বিজ সাধু-সন্ন্যাসীব প্রতি ভক্তি তাঁব অপবিসীম। তরুণী সাধিকা ও পবিব্রাজিকা গোরামাযীব ওপর তাঁব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট, সুযোগ পেলেই নিজেব ভবনে বা দেবালযে নিযে এসে তাঁর সেবাপবিচর্যা কবেন, কৃতার্থ মনে কবেন নিজেকে।

বাধামোহনেব পুত্র বলবামও পেযেছেন পিতাব সাত্ত্বিকতা ও ধর্মভাব, গোবামায়ীকে তিনিও দেখেন পবম শ্রদ্ধাব বস্তুরূপে। বলবাম জেনেছেন, তাঁব সহপাঠী অবিনাশ এই সাধিকাব সহোদব ভাই, তাই এঁকে ডাকতে শুরু কবেছেন দিদি বলে।

ইষ্ট দামোদব-শিলাব পুজো ও ভোগবাগ সব শেষ কবেছেন গোরামাযী, বলবাম প্রণাম ক'বে কাছে এসে বসলেন, বললেন, "দিদি, দেশেব দূব-দূরান্তে অনেক তীর্থ, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী তো তুমি দেখেছো। তাই না?"

"হ্যাঁ ভাই, সে কথা ঠিক"—স্মিতহাস্যে উত্তব দেন গোবামাযী।

"কিন্তু এবার এমন একটি সাধু তোমায আমি দেখাবো যার জুড়ি কোথাও নেই।"

"সাধু-সন্ন্যাসী এযাবৎ কম দেখি নি ভাই। এখন আব এ নিযে ছুটোছুটি করতে চাইনে, সে উৎসাহও নেই। কিন্তু কোথায তোমাব এ সাধু, বলতো?"

"দক্ষিণেশ্বরে। যাবে তাঁকে দর্শন কবতে?"

গোবামায়ীর মনে পড়ে যায, পুবীতে থাকতে এক কন্যা-শোকাতুর

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলুম এক অসাধারণ মানুষ, অপরূপ রূপ, জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢলঢল, ঘন ঘন সমাধি।" বলরাম তবে কি সেই মহাপুরুষেরই ভক্ত? ভাবতে থাকেন গোরামায়ী।

"দিদি, তাঁকে না দেখলে, শেষটায় কিন্তু আপসোস থেকে যাবে তোমার, বলে দিচ্ছি।" দিদিকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে চান বলরাম, তাই এতবার এত ক'রে বলা।

"তোমার সাধুর যদি শক্তিবিভূতি থাকে তবে আমায় যেন টেনে নিয়ে যান। তার আগে কিন্তু আমি যাচ্ছিনে ভাই।" হাসির তরঙ্গ তুলে বললেন গোরামায়ী।

কয়েকদিন ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। সেদিন দামোদর-শিলার অভিষেক সম্পন্ন ক'রে গোরামায়ী তাঁকে সিংহাসনে বসাচ্ছেন, এমন সময়ে দেখেন এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড। সিংহাসনের একপাশে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে এক জোড়া মনুষ্য-চরণ। এ তাঁর স্বপ্ন নয়, দৃষ্টির বিভ্রম নয়। দিব্য লাবণ্যময় গৌরকান্তি, কোনো মানুষের জীবন্ত দুটি পা। রক্ত-মাংসে গড়া এ-দুটি পা ছাড়া দেহের অপর কোনো অংশ কিন্তু চোখে পড়ে নি তাঁর। কিছুক্ষণ সিংহাসনে বিরাজিত থেকেই, চরণ দুটি কিন্তু আবার কোথায় মিলিয়ে গেল।

ইষ্টবিগ্রহ দামোদরের অনেক কিছু লীলাবিলাস গোরামায়ী এর আগে দেখেছেন, অনেক কিছু অতীন্দ্রিয় দর্শনও ঘটেছে তাঁর, সাধন-জীবনে। কিন্তু এ ধরনের অদ্ভুত ঝাঁকি-দর্শন তো কখনো ঘটে নি।

ইষ্টদেব দামোদরকে ঘিরে, তাঁর পবিত্র সিংহাসনটি ঘিরে এই বিস্ময়কর রহস্য আজ ঘনিয়ে এসেছে।

দিব্য আবেশে ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে গোরামায়ীর দেহ, কণ্টকিত হচ্ছে অপার্থিব পুলকের তরঙ্গে।

পবিত্র ইষ্টশিলার দেহটি মুছিয়ে দেবার জন্য যেই উঠিয়েছেন, অমনি কম্পমান করপুট থেকে হঠাৎ তা স্খলিত হয়ে পড়ে গেল ভূমিতলে।

ডুক্‌রে কেঁদে-উঠলেন গোরামায়ী। নারায়ণ-শিলা আজ কেন এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছেন যে হাত থেকে পড়ে গেলেন। একি তাঁর আনন্দ চাঞ্চল্য, না আর কিছু? গোরামায়ীর কোনো সেবা-অপরাধ হয় নি তো প্রভুর কাছে? একি দুর্ভেদ্য রহস্যজাল ঘনিয়েছে তাঁর সম্মুখে?

ভক্তিভরে তখনি তাড়াতাড়ি দামোদর-শিলাকে তুলে নিলেন গোরামায়ী। আবার নূতন ক'রে করলেন তাঁর স্নান-অভিষেক। মন্ত্র পড়ে সেই সচন্দন তুলসী নিবেদন করছেন, অমনি আবার দৃষ্টি সমক্ষে আকারিত হয়ে উঠল কাঁচা সোনার রঙ মাখানো কোমল দুখানি চরণ। তাঁর নিবেদিত চন্দনলিপ্ত তুলসীর পত্র পড়ল গিয়ে সেখানে।

এভাবে বার বার তিনবার তিনি নিবেদন করলেন তুলসী, আর তিনবারই অমোঘ দৈবী আকর্ষণে নিপতিত হল সেই রহস্যময় অলৌকিক পাদপদ্মে।

দিব্য আনন্দের এক বিপুল ভাবতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গোরামায়ীর সমগ্র সত্তায়, বাহ্য চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে গেল, লুটিয়ে পড়লেন কক্ষতলে।

বসু ভবনের সবাই তরুণ সাধিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সবাই সতত উন্মুখ তাঁর সেবার জন্য। সেদিন অনেক বেলা হয়ে গেল, তবুও ঠাকুরঘর থেকে তিনি বেরিয়ে আসছেন না দেখে, অন্তঃপুরিকারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। ঠাকুরঘরে প্রবেশ করতেই দেখা গেল, গোরামায়ী সংবিৎহারা হয়ে পড়ে আছেন, দুই চোখ দিয়ে অবিরাম ধারে ঝরে পড়ছে পুলকাশ্রু।

বহির্বাটীতে বলরামবাবুকে তখনি খবর দেওয়া হল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে পূজাকক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি। সব দেখে শুনে বললেন, "ভয় নেই, এ কোনো রোগ নয়, দিব্যভাবে আবিষ্টা রয়েছেন গোরামায়ী। তোমরা ওঁকে অমনিভাবে থাকতে দাও। আবেশ কেটে গেলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

বেলা পড়ে এলে গোরামায়ী কিছুটা প্রকৃতিস্থা হলেন বটে, কিন্তু দিব্যভাবের ঘোর তখনো একেবারে কাটে নি। যে ভাবাতীত বাজ্যে বিহাব কবছিলেন, তারই মোহময আবেশ জড়িত রয়েছে তাঁর সারা দেহে মনে।

অন্তঃপুবিকাবা প্রশ্নেব পব প্রশ্ন ক'বে চলেছেন, কিন্তু কোনো কথাব জবাব আসছে না তাঁব মুখ থেকে, উদাস অর্থহীন নেত্রে চাবিদিকে কবছেন দৃষ্টিপাত।

পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ফিবে এসে জানালেন, বুকেব ভেতবটা তাঁব কে যেন একটা শক্ত সুতোর জাল দিযে জড়িযে ফেলেছে, আব ধীবে ধীবে কবছে তাঁকে আকর্ষণ। এ আকর্ষণ অমোঘ, প্রাণপণ প্রাযসেও গোবামায়ী তা এড়াতে পাবছেন না। জগৎ-সংসাব বিবৎ বলে মনে হচ্ছে তাঁব, আব অন্তবেব অন্তস্তলে গুমবে গুমবে উঠছে একটা অব্যক্ত ও সুতীব্র বেদনা। ইচ্ছে হচ্ছে, উন্মাদিনীব মতো কোথাও কোনো নির্জন স্থানে ছুটে বেবিযে যান, ফেটে পড়েন মর্মভেদী কান্নায়।

সেদিন বাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখেন গোবামাযী। গৌবকান্তি এক আনন্দময দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হযেছেন তাঁব সম্মুখে। অভিমানেব সুরে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন, "কিবে, আমি টেনে না আনলে তুই বুঝি আসবিনে আমাব কাছে?"

"কে তুমি!' চমকে উঠে বলেন গোরামায়ী, "তোমাকে বড চেনা-চেনা লাগছে যেন। সেই কবেকার শোনা কণ্ঠস্বব। কিন্তু স্পষ্ট ক'বে বুঝতে পাবছিনে তোমাব পরিচয।"

"চিনবি বৈ কি আমায, খুব চিনবি। কাছে এলে সব বুঝতে পারবি। শিগগীব আয, চলে আয।"

তন্দ্রা টুটে যায, ধড়মড়িযে বিছানায উঠে বসেন গোবামাযী। কে এ মহাত্মা? স্নেহ মধুব কণ্ঠেব এমন প্রাণগলানো পাগল-কবা ডাক্ তো কোনোদিন তাঁব শ্রবণে পশে নি। থেকে থেকে বাব বাবই গুঞ্জবিত হয মধুকণ্ঠেব ঝঙ্কাব—আয, আয, আয়!

দুয়ার খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান গোরামায়ী, বিপর্যস্ত বেশবাস, কুরঙ্গিণীর মতো চঞ্চল দুটি আয়ত নয়ন, ত্রস্তপদে পাগলিনীর মতো ছুটে যান বাড়ির সদর দেউড়ীতে। দেউড়ী বন্ধ ক'রে দারোয়ানেরা তখনো ঘুমন্ত। ভারী লোহার হাতলটা নিয়ে টানাটানি শুরু করতেই তাদের একজন জেগে ওঠে। কাছে এসে প্রশ্ন করে, "পিসীমা যে। এত রাত্রে বাইরে যাচ্ছেন? গঙ্গাস্নানে যাবেন? তা এখনো তো ভোর হতে অনেক বাকী।"

কোনো কথাই পৌঁছে না গোরামায়ীর কানে, অর্থহীন দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন। স্বপ্নের ঘোর তখনো কাটে নি, ভাবের আবেশে সারা দেহ থরথর ক'রে কাঁপছে, বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছে না।

দারোয়ানের মুখে সংবাদ পেয়ে দ্বারের সম্মুখে ছুটে এসেছেন কর্তা, বলরাম বসু। বিস্ময়ভরা স্বরে জিজ্ঞেস করেন, "দিদি, তুমি এসময়ে এখানে কেন? রাত যে এখনো পোহায় নি। কোথায় যাবে, আমায় বলতো।"

কোনো উত্তর নেই। অর্ধবাহ্য অবস্থায়, নিষ্পলক নেত্রে, দাঁড়িয়ে আছেন গোরামায়ী।

বলরাম বুঝলেন, পূর্বদিনের ভাবাবেশ ও দিব্যোন্মাদনার ঘোর তখনো তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। নিজ সংসারের অনেক কিছু সংকট ও সমস্যায় ভক্ত বলরাম স্বভাবতই ছুটে যান দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। এ সময়েও মনে পড়ল সেই কৃপাঘন দেব-মানবেরই কথা। ভাবলেন, এই ভক্তিময়ী সাধিকাকে একবার যদি ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, তাঁর সব সমস্যার সমাধান হবে, ঠাকুরের পরমাশ্রয় লাভেও হবেন কৃতার্থ।

সাগ্রহে আবার প্রশ্ন করেন, "দিদি, কোথায় যাবার জন্য এত ব্যাকুল হয়েছো। দক্ষিণেশ্বরে যাবে? মহাপুরুষের কাছে যাবে? তবে চলো, এক্ষুণি সবাই সেখানে যাই, কি বলো?"

একেবারেই নির্বাক হয়ে, বিস্ফারিত নয়নে, অর্ধবাহ্য অবস্থায়, দাঁড়িয়ে আছেন গোরামায়ী। ভক্তপ্রবর বলরাম এবার নিজেই সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করলেন। কোচমানকে ডেকে আদেশ দিলেন তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত হতে। অল্প সময়ের মধ্যেই গোবামাযীকে নিযে বওনা হলেন দক্ষিণেশ্ববে। সঙ্গে চললেন তাঁব স্ত্রী এবং ঠাকুবেব ভক্ত ও তাঁবই প্রতিবেশিনী কযেকটি মহিলা।

প্রত্যূষের আব বেশী দেবি নেই। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বযে চলেছে, গাড়িতে উঠেই বলবামেব স্ত্রী একটি শুভ্র চাদবে গোবামাযীব আপাদমস্তক সযত্নে ঢেকে দিলেন। গোবামাযী তখনো দিব্যভাবে আবিষ্ট হযে বযেছেন, আব অসাড দেহটি এককোণে এলিযে দিযে নিশ্চুপ নিস্পন্দ হযে বসে আছেন। তাঁব সঙ্গী ও সঙ্গিনীদেব মুখেও নেই কোনো সাড়া-শব্দ। ঠাকুরেব আসন্ন দর্শনেব আনন্দে সারা অন্তব তাঁদের ভরে উঠেছে।

গাড়ি যখন দক্ষিণেশ্ববে পৌঁছুলো, পঞ্চবটীর তরুতলায আব মন্দিরেব গাযে গাযে তখন ছড়িযে পড়েছে নবারুণের শুচিস্নিগ্ধ আলো। তাড়াতাড়ি ঠাকুবের সকাশে সবাই উপস্থিত হলেন, নিবেদন করলেন সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আপন কক্ষে একলাটি বসে রযেছেন। একটা কাঠি হাতে নিযে কতকগুলো সুতো জড়াচ্ছেন তাতে, আব মনেব আনন্দে, মৃদুমধুর স্ববে গাইছেন,

যশোদা নাচাতো গো মা, বলে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনী শ্যামা,
—একবাব নাচ্ মা শ্যামা।

ভক্তদেব দেখেই হাতেব সুতো জড়ানো কাঠিটি সন্তর্পণে শয্যাব একপাশে বেখে দিলেন শ্রীবামকৃষ্ণ। দিব্য আনন্দে আননখানি তাঁব প্রোজ্জ্বল হযে উঠেছে। স্নেহভরা কণ্ঠে আশীর্বাদ জানালেন সবাইকে, শুরু হল কুশল প্রশ্ন।

সবাব সাথে, যন্ত্রচালিতেব মতো, গোবামাযীও প্রণাম কবেছেন ঠাকুবকে। শুভ্র চাদরেব গুণ্ঠন একটু ফাঁক ক'বে চবণ দুটিব দিকে

দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই দেহে এল দিব্য আনন্দের শিহরণ। একি! এ যে সেই কাঁচা সোনার মতো রাঙা চরণ, যা তিনি দর্শন করেছিলেন ইষ্টপ্রভু দামোদরজীর সিংহাসনে। সেই দর্শনের পর থেকেই যে ভাবলোকের তুফান উঠেছে সারা সত্তায়, উন্মাদিনীর মতো হয়ে গিয়েছেন তিনি।

কিন্তু সে তুফান এবার শান্ত হয়ে এসেছে। যে অব্যক্ত বেদনা একদিন গুমরে গুমরে উঠেছিল তাঁর বুকে, সে বেদনাও যে ঠাকুরের এই পাদপদ্ম দর্শনের পর ইন্দ্রজালের মতো হয়েছে অন্তর্হিত।

শয্যায় রেখে-দেওয়া সুতো জড়ানো কাঠিটির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। সেই সুতোর দিকে চোখ পড়তেই বিস্ময়ে আঁতকে ওঠেন গোরামায়ী, মনে পড়ে স্বপ্নে দৃষ্ট সেই মহাপুরুষের অভিমানভরা কণ্ঠ, "আমি না টানলে বুঝি তুই এখানে আসবিনে?"

আজকের এই দর্শনের পর থেকে কিন্তু গোরামায়ী বুকের সেই সুতোর জালের মতো আকর্ষণ আর একটুও অনুভব করছেন না। ঠাকুরকে প্রণাম করবার পর থেকেই, অন্তরের সব ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে গেছে, অপার্থিব আনন্দ ও শান্তির মোহময় প্রলেপ কে যেন বুলিয়ে দিয়েছে তাঁর বিষাদখিন্ন হৃদয়ে।

নির্নিমেষে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন গোরামায়ী। বিস্মৃতির গাঢ় কুহেলিকা ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোকরশ্মি, সবিস্ময়ে ভাবছেন বার বার, এ মহাপুরুষকে যে আমি চিনি, আগেও দর্শন করেছি তাঁর এই সুমোহন আনন্দময় মূর্তি। ঐ তো রয়েছে সেই দিব্যলাবণ্যশ্রী, সেই গৌরকান্তি, আর সেই নিটোল প্রশান্তি। ইনি অজানা নন, অপরিচিত নন, দূরের নন। পরম আপনার জন ইনি। পরমাত্মীয় ইনি।

কিন্তু তবুও রহস্যময় থেকে যান এই মহাপুরুষ, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, সহজভাবে গোরামায়ী ধরতে পারেন না তাঁকে, আর ভেদ করতে পারেন না তাঁর এই দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা।

কিছুক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গ চলবাব পব শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টিপাত কবেন গোবামায়ীব দিকে। চাদবে আপাদমস্তক আবৃত ক'বে নীববে এককোণে বসে আছেন তিনি। আঙুল দিয়ে তাঁকে দেখিয়ে ঠাকুব বলেন, "ও বলরাম, ওটি কে গো ?"

"ঠাকুব, ওটি আমাব বোন।" করজোড়ে, ক্ষিপ্রকণ্ঠে, নিবেদন কবেন বলবাম।

"তোমাব আপন বোন ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ"—বলবামেব কণ্ঠ কিন্তু দ্বিধাজড়িত।

"অ্যাঁ, কা-যে-ৎ। উঁহুঃ"—ব'লে ঠাকুব বামকৃষ্ণ উডিযে দেন তাঁব কথা।

এবাব দ্ব্যর্থবোধক কথা না বলে, সহাস্যে বলবাম খুলে বলেন নবাগতাব - পবিচয, "আজ্ঞে আসলে ইনি হচ্ছেন এক ব্রাহ্মণ কন্যা। আমাব এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুব ছোট বোন। আমাব বাবাকে ইনি ডাকেন 'বাবা' ব'লে।"

ঠাকুরেব চোখে-মুখে ছডিযে পডে দিব্য আনন্দেব আভা। মাথা নেডে সোৎসাহে বলেন, "তাই বল, এ যে এখানকাব লোক। অনেক কালেব চেনা।"

একটু থেমে বহস্য ক'বে বলেন, "চাদব দিযে মুখ ঢেকে বাখলে কি পবিচয সব সমযে ঢাকা যায ? টান পডেছে ভেতব থেকে তাইতো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অস্থিব হযে উঠেছে, খুঁজে বেডাচ্ছে হেথায হোথায। বড ভক্তিমযী মেযে। বেশ, বেশ[১]।"

বলবাম বুঝলেন অন্তর্যামী ঠাকুব বামকৃষ্ণেব দিব্যদৃষ্টিব সম্মুখে গোবামাযীব কোনো পরিচযই আব অনুদ্ঘাটিত নেই।

গোবামাযীব ভাবাবেশ ইতিমধ্যে একেবারে কেটে গিযেছে। চাদবেব গুণ্ঠনটি ফেলে দিযে, সতৃষ্ণ নযনে, স্থিব দৃষ্টিতে, তাকিযে আছেন এই আপ্তকাম মহাপুরুষের দিকে।

এবাব ভক্ত বলরাম ও তাঁব সঙ্গিনীদেব বিদায নেবাব পালা।

১ শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ : অক্ষযকুমাব সেন

সবাই একে একে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করলেন ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।” কক্ষের বাইরে যাবার সময় গোরামায়ীর দিকে নিবদ্ধ হল ঠাকুরের প্রসন্নোজ্জ্বল দৃষ্টি। মৃদু মধুর স্বরে বললেন, “আবার এসো, মা।”

বলরাম রহস্যভরে মন্তব্য করলেন, “সবাই একসঙ্গে এলাম, আর দিদি একলাটি পাস হয়ে গেলেন।” একসঙ্গে সবাই হেসে উঠলেন একথা শুনে।

বাড়িতে ফিরে দামোদরের পুজোর উপচার সংগ্রহ করছেন গোরামায়ী। এমন সময়ে ধীরে ধীরে তাঁর মানসলোকে ফুটে উঠল বিগত দিনের বিস্মৃত দৃশ্যপট -

গোরামায়ীর ছোটবেলার নাম মৃডানী, বাড়ির সবাই ডাকতো মাস্তু ব'লে। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বৎসর। ভবানীপুরে তাঁদের গৃহের প্রাঙ্গণে কয়েকটি বালক-বালিকা খেলায় মত্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিল, আর মাস্তু ছিল চুপচাপ একপাশে। হৈচৈ ও দৌড়ঝাঁপে তার যেন তেমন উৎসাহ নেই।

সম্মুখের রাস্তা দিয়ে ধীর পদে হেঁটে চলেছেন এক প্রিয়দর্শন পথিক। গৌরকান্তি, আনন্দময় মূর্তি। আদুল গায়ে চলেছেন। গলার যজ্ঞোপবীতটি দেখে বুঝা যাচ্ছে, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। বালিকা মাস্তুর দিকে দৃষ্টি পড়তে থমকে দাঁড়ালেন। এগিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, “কি গো মা, সবাই এত খেলা করছে, আর তুমি দেখছি চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে?”

“ওসব খেলা আমার ভালো লাগে না।” উত্তর দেয় মাস্তু।

প্রসন্নমধুর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, মুখে আর কোনো কথা বলছেন না।

বালিকা মাস্তুর অন্তর ভরে ওঠে এক অজানা আনন্দে, বার বারই মনে হতে থাকে, এই আগন্তুক তার অতি আপনার জন, অনেককালের চেনা। নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে সে তাঁর দিকে।

ব্রাহ্মণটি এগিয়ে আসেন মাস্তুর দিকে। তার মাথায় হাত রেখে জানান আশীর্বাদ, “কৃষ্ণে ভক্তি হোক, মা তোমার।”

মধুব হাসি হেসে এবাব তিনি অঙ্গন ছেড়ে বাস্তায় এসে দাঁডান। মাস্তুদেব পবিচিতা এক ভক্ত মহিলা অদূবেই দাঁডিযেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দু'চাবটি কথাবার্তা সেবে ব্রাহ্মণটি চলে গেলেন কালীঘাটেব মন্দিবেব দিকে।

অনির্বচনীয় আনন্দে উচ্ছল হযে উঠেছে মাস্তু। ব্যগ্র হযে তখনি সে ছুটে যায ঐ মহিলাটিব কাছে। কে এই আগন্তুক, কোথায থাকেন তিনি, সব কথা না জানতে পাবলে মন শান্ত হতে পাবছে না।

পবিচয কিছুটা পাওয়া গেল। উনি একজন নাম কবা কালীভক্ত, অনেকে ডাকে তাকে ঠাকুবমশাই বলে। আবও জানা গেল, কযেক-দিন পবে নিমৃতে-ঘোলাব কলাবাগানে গিযে দু'একদিন ইনি নিভৃতে অবস্থান কববেন।

বড ভাই অবিনাশচন্দ্র সেদিন কি এক কাজ উপলক্ষে বরানগবে যাচ্ছিলেন, মাস্তুও তাঁব সঙ্গে জুটে যায। তাবপব ববানগর থেকে হঠাৎ এক সমযে সে সবে পডে সবাব অলক্ষ্যে।

একলাটি দীর্ঘ পথ হেঁটে নিমৃতে-ঘোলায ঠাকুবমশাইব নিভৃত কুটিবে যখন সে পৌঁছুলো, দেহ তখন অতিশয ক্লান্ত।

দোব ঠেলতেই দেখা গেল ঠাকুবমশাইকে। নীবব নিস্পন্দ হযে ধ্যানাসনে তিনি উপবিষ্ট, নযন দুটি নিমীলিত, বন্দনমণ্ডল অপার্থিব আনন্দে উদ্‌ভাসিত।

ভক্তিভবে প্রণাম নিবেদন কবে মাস্তু। সন্তর্পণে একধাবে বসে থাকে ধ্যানভঙ্গেব প্রতীক্ষায।

কিছুক্ষণ পরে নযন উন্মীলন কবেন সাধক, মৃদু মধুব স্ববে মাস্তুকে বলে ওঠেন, "তুই এসে গিয়েছিস্ মা, বেশ বেশ।"

সে বাত্রিব মতো নিকটস্থ এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীব গৃহে মাস্তুব থাকবাব ব্যবস্থা কবা হয। পবেব দিন ভোববেলায সেই পবিবাবেব মহিলাদেব সঙ্গে সে গঙ্গাস্নান সমাপন ক'বে উপনীত হয ঠাকুবমশাইব ধ্যানকুটিবে।

সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা। এই পুণ্যময় তিথিতে ঠাকুরমশাই কৃপাভরে মান্তকে দান করেন নামদীক্ষা. অপার্থিব আনন্দের আবেশে সারা দেহ মন তার ভরপুর হয়ে ওঠে।

এদিকে বরাহনগর থেকে বালিকা মান্ত নিখোঁজ হবার পর তার দাদা অবিনাশচন্দ্র দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠেন। অনেক স্থানে খোঁজাখুঁজির পর, নিমতে-ঘোলায় এসে সন্ধান পান প্রিয় ভগ্নীর, আনন্দে অধীর হয়ে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন তাকে।

ঠাকুরমশাই নির্নিমেষে চেয়ে আছেন এই মিলনদৃশ্যের দিকে। চোখে মুখে তাঁর ছড়িয়ে পড়ে রহস্যময় আনন্দের আভা। স্মিতহাস্যে মান্তর বড় ভাইকে সতর্ক ক'রে দেন, "ত্যাখো বাবা, ওকে যেন তোমরা কেউ বোকো না। হলদে পাখি ধরে রাখা দায়।"

সদানন্দময় সাধক ঠাকুরমশাইর সস্নেহ অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ হয়ে যান অবিনাশচন্দ্র, হারানো বোনকে সঙ্গে নিয়ে সানন্দে প্রত্যাবর্তন করেন ভবানীপুরের গৃহে।

গোরামায়ীর অন্তর্দৃষ্টি ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, দিব্য উপলব্ধির মাধ্যমে ধরা দেয় পনের বৎসর পূর্বেকার দেখা সেই ঠাকুরমশাইর প্রকৃত পরিচয়। সেদিনকার সেই ঠাকুরমশাই-ই যে দক্ষিণেশ্বরের এই সিদ্ধ মহাপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

দশ বছরের বালিকা মান্তর জীবনে ঈশ্বরপ্রেরিত পথনির্দেশক হয়ে এসেছিলেন ঠাকুর। দিব্যদৃষ্টি ও করুণাভরা স্পর্শ দিয়ে তার ভেতরে জাগিয়ে তুলেছিলেন অধ্যাত্মচেতনা, নামদীক্ষা দিয়ে ধন্য করেছিলেন তাকে।

সেদিনকার সেই ভাগ্যবতী মান্ত ইতিমধ্যে পরিচিতা হয়ে উঠেছেন পরিব্রাজিকা ও তপস্বিনী গোরামায়ীরূপে। আজ তার পঁচিশ বৎসরের এই তরুণ সাধিকা জীবনে আবার আবির্ভূত হলেন সেই কৃপালু ঠাকুর।

ঐশ্বরীয় কৃপা আর ঐশ্বরীয় শক্তির অমোঘ প্রবাহ গোরামায়ীর জীবনতরীকে ঠেলে নিয়ে এসেছে আজ ঈশ্বর-চিহ্নিত গুরুর চরণতলে।

এবাব কাযমনোবাক্যে সেই গুরুকে ববণ কবলেন গোবামাযী জীবন-তবীব কাণ্ডারীরূপে।

উত্তবকালে ঠাকুব বামকৃষ্ণেব শিক্ষা সাধনা ও কৃপাব বলে গোবামাযী রূপান্তবিত হযেছিলেন এক মহাসাধিকায়। অধ্যাত্মসিদ্ধির অপরূপ উদ্ভাসন দেখা গিযেছিল তাঁব জীবনে, বহু ভক্ত ও সাধকেব হযেছিলেন তিনি দিক্‌দিশাবিণী।

কৈশোবে ও যৌবনে অনন্য নিষ্ঠায গোবামায়ী তপস্যা কবেছেন। পবিব্রাজন ক'বে বেডিয়েছেন সাবা ভাবতেব তীর্থে তীর্থে। যেখানেই গিয়েছেন, তাঁব দিব্যশ্রী-মণ্ডিত আনন, আযত নয়ন এবং অত্যুজ্জ্বল গৌবকান্তি আকর্ষণ করেছে অগণিত ভক্ত নবনাবীব সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। বিশেষ ক'বে তাঁব গৌববর্ণেব জন্য ভক্ত ও তীর্থযাত্রীবা তাঁব নাম দিযেছিলেন গোবামায়ী। তাবপব দক্ষিণেশ্ববে শ্রীবামকৃষ্ণেব পবমাশ্রযে আসার পব এই গোবামায়ী নামটি পবিবর্তিত হয়, পবিচিতা হযে ওঠেন তিনি গৌবীমা নামে। এ সম্পর্কে তাঁব প্রধানা শিষ্যা মাতাজী লিখেছেন

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুব একদিন গৌবীমাব হাতে সন্ন্যাসেব বস্ত্র দিলেন, অন্যান্য বিধিব্যবস্থা ঠাকুবেব উপদেশমতো তিনি নিজেই কবিয়াছিলেন। এই সময ঠাকুব তাঁহাকে গৌবী আনন্দ নাম দিযাছিলেন। গৌবীমা তাহাতে বলেন, "আমি গৌবেব দাসীব দাসী, তাতেই আমাব আনন্দ।" এই হেতু নিজেকে 'গৌবীদাসী' বলিযাই তিনি গর্বানুভব কবিতেন। ঠাকুব তাঁহাকে 'গৌবী' বলিয়াই ডাকিতেন। কদাচিৎ 'গৌবীদাসী'ও বলিতেন। শ্রীশ্রীমা 'গৌবীদাসী' বলিতেন। তৎকালীন ভক্তগণ অনেকে তাঁহাকে 'গৌবীমা' বলিযা সম্বোধন কবিতেন। তাঁহাব আত্মায়স্বজন তাঁহাকে 'যোগিনীমা' এবং 'দামুর-বৌ' (শ্রীদামোদবেব পত্নী) বলিতেন।[১]

গৌবীমাব পূর্বাশ্রমেব নাম মৃডানী, ডাকনাম মাস্ত। কলকাতার

১ গৌবীমা: দুর্গাপুবী দেবী

ভবানীপুরে বিত্তবান্ মাতামহের ভবনে তাঁর জন্ম হয়। পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ, হাওড়া জেলার শিবপুর ছিল তাঁর পৈতৃক নিবাস। খিদিরপুরের এক সওদাগরী অফিসে পার্বতীচরণ সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করতেন।

জননী গিরিবালা দেবীর চরিত্রে সাত্ত্বিকতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখা যেত। দীন দুঃখী ও বিপন্ন মানুষের তিনি ছিলেন আশ্রয়স্বরূপ। তাছাড়া, উন্নত স্তরের কালীসাধিকা বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। পূজা পাঠ ও জপ ধ্যানেই দিনের বেশীর ভাগ সময় তাঁর অতিবাহিত হতো, আর প্রতি অমাবস্যা রাত্রে, গভীর নিশীথে, মহাকালীর আরাধনায় তিনি নিবিষ্ট হয়ে যেতেন। গৃহস্থ ঘরের স্বল্পশিক্ষিতা বধূ হলেও গিরিবালা ধর্মসংগীত রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন। শতাধিক শ্যামা-সংগীত তিনি রচনা ক'রে গিয়েছেন।

গিরিবালা দেবী তাঁর মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন এবং বেশীর ভাগ সময়ে ভবানীপুরেই তিনি বাস করতেন। দুষ্ট আত্মীয়েরা বিষয়বিত্তের লোভে তাঁর সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করেছেন, তাঁকে অপদস্থ করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করেছেন, কিন্তু দৃঢ়চেতা ও কর্মদক্ষা গিরিবালাকে তাঁরা পরাস্ত করতে পারেন নি। স্বামী পার্বতীচরণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বুঝাতেন, "ভগবানের ইচ্ছেয় আমাদের টাকাকড়ির অভাব নেই। বিষয় নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট আর অশান্তি হচ্ছে। কি হবে এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে? এ আপদ ছেড়ে, চল আমরা বরং কাশীতে গিয়ে বাস করি।"

তেজস্বিনী গিরিবালাকে কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী করা যায় নি। দৃপ্তভঙ্গীতে তিনি বলতেন, "অন্যায় অত্যাচার সইলে আমার অধর্ম হবে। অসুরনাশিনী মা-কালী আমার সহায়। দুষ্টেরা আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না তা দেখে নিও।"

গিরিবালার অন্তরের এই আপাতবিরুদ্ধ বৃত্তি কোমলতা ও কঠোরতা, সরলতা ও বিচক্ষণতা তাঁর কন্যা মৃড়ানীর, অর্থাৎ আমাদের গৌরীমার জীবনেও দেখা দিয়েছিল। বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও প্রেম ভক্তির

সঙ্গে গৌরীমার জীবনে যুক্ত হয়েছিল আত্মিক শক্তি, দৃঢ়চিত্ততা ও অনমনীয় নৈষ্ঠিকতা। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সব সময়ে এই কৃষ্ণগতপ্রাণা তপস্বিনী গর্জে উঠতেন সিংহিনীর মতো।

শিশুকাল থেকেই মৃডানীর ভেতর দেখা গিয়েছিল ধর্মভাব ও পরোপকার বৃত্তি। খেলার ঠাকুরটি নিয়ে প্রায় সময়েই সে মশগুল হয়ে থাকতো। জন্মান্তরের শুভ সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে, তদুপরি দিনের পর দিন তার ওপরে পড়েছে জননী গিরিবালার পূজা-অর্চনার প্রভাব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভেতরে মৃড়ানী যেন একটা অদ্ভুত ব্যতিক্রম। কোনো সাধ আহ্লাদ নেই, শাড়ী গয়নার প্রতি আকর্ষণ নেই, রুচি ও বিচারবুদ্ধি জেগে ওঠবার আগে থেকেই খাদ্য থেকে সে মাছ মাংস বর্জন ক'রে দিয়েছে। পাড়ার মহিলারা এসব দেখে মন্তব্য করতেন, কোথাকার সাতজন্মের বিধবা। এক রত্তি মেয়ে, মাছ খাবে না, গয়না পরবে না। সবই যেন সৃষ্টিছাড়া।"

প্রতিবেশী চণ্ডীমামা ছিলেন এক সাধু ব্যক্তি, জ্যোতিষীতে তাঁর বেশ পারদর্শিতা ছিল। মৃডানীর জন্মকুণ্ডলী হস্তরেখা বিচার ক'রে তিনি বলেছিলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি এ মেয়ে যোগিনী হবে। ঘরে থাকবার মেয়ে তো এ নয়।"

চণ্ডীমামা বহুতীর্থ দর্শন করেছেন, দেশ-দেশান্তরের দেব-দেউল দেখে বেড়িয়েছেন। মৃডানী তাঁর অতি প্রিয়। অবসর পেলেই তাকে নিয়ে আসর জমাতেন, বলতেন তাঁর তীর্থ ভ্রমণ এবং হিমালয় পরিব্রাজনের গল্প। নদনদী, প্রস্রবণ আর দুর দুর্গম অরণ্য পর্বতের মোহময় বর্ণনা বালিকা শ্রবণ করতো বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে। মন তার পাখা মেলে উড়ে যেতো ইন্দ্রজাল-ভরা কল্পলোকে।

বালিকা মৃডানীর-শিক্ষার ভাল ব্যবস্থাই করা হয়। ভবানীপুরের একটি নবগঠিত মিশনারী স্কুলে ভর্তি হয়ে সে পাঠাভ্যাস করতে থাকে। অল্পকাল মধ্যে এই স্কুলে সে পরিচিতা হয়ে ওঠে এক মেধাবিনী ছাত্রীরূপে। কিছুদিন পরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়, গৃহে থেকেই শুরু তার বিদ্যাচর্চা। জননী গিরিবালা দেবীর রুচি ও

মনোবৃত্তিব ছাপ পড়ে তাব জীবনে অনড় হযে। এই বয়সেই বহু দেবদেবীব স্তোত্র, চণ্ডী, গীতা, বামাযণ ও মহাভাবতেব শ্লোক তাব কণ্ঠস্থ হযে যায। মুগ্ধবোধ ব্যাকবণেব কিছুটা অংশও সে আযত্ত ক'বে ফেলে। মৃড়ানীব প্রখব বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দেখে পাড়াব বর্ষীযান্ ব্যক্তিবা বিস্মিত হযে যান।

বযস যখন মাত্র দশ বৎসব, তখনি শ্রীভগবানেব বিধানে জীবনেব দ্বাবে আবির্ভূত হন তাব 'ঠাকুবমশাই'। মহাসাধক শ্রীবামকৃষ্ণ রূপে তখনো ঠাকুবমশাইব অভ্যুদয় ঘটে নি। তখনো তিনি নিভৃতে আপন সাধনায় নিমগ্ন রযেছেন।

ঠাকুরমশাইব কাছ থেকে দীক্ষা লাভেব পর মৃড়ানী ভবানীপুরে স্বগৃহে ফিবে এসেছেন। অতঃপব কিছুদিনেব ভেতরই সেখানে উপস্থিত হলেন এক ব্রজমাযী, বৃন্দাবনের এক ভক্তিমতী সাধিকা। এই মাযী চিরকুমাবী।

শ্রীকৃষ্ণচবণে আত্মনিবেদন ক'বে মাযী ভক্তিসাধনায বযেছেন নিমজ্জিত। তাঁব ইষ্ট এবং নিত্যপূজাব বস্তু হচ্ছেন একটি নারায়ণ-শিলা। একটি ক্ষুদ্র পেটিকাস্থিত সিংহাসনে এই শিলাটি বিরাজিত, ভক্তিমতী ব্রজমাযী তাঁব বেশীব ভাগ সময অতিবাহিত কবেন এঁব পূজা এবং জপ ধ্যানে।

বালিকা মৃড়ানী সেদিন ঘবেব মেঝেতে বসে সঙ্গিনীদেব নিয়ে খেলাধুলা কবছে। হঠাৎ দেখতে পেল, মেঝের ওপব পড়ে বয়েছে একটি কালো প্রস্তবখণ্ড।

সাগ্রহে এটি কুড়িযে নেয মৃড়ানী, তাবপব সবিস্ময়ে বলে ওঠে, "একি, এটিকে যে ঠিক শালগ্রাম শিলাব মতো লাগছে। কোত্থেকে এল এখানে?"

কথা কটি বলাব সঙ্গে সঙ্গেই আলুথালু বেশে, ঝড়েব বেগে, সেখানে উপস্থিত হন তাদেব অতিথি ব্রজমাযী। চেঁচিযে বলে ওঠেন, 'খুকী, আমাব ঠাকুব কই? দাও, দাও, শিগ্‌গীব তুমি আমাব ঠাকুব দিযে দাও।"

নয়ন দুটি বিস্ফারিত, দেহটি উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। এগিয়ে এসে ব্রজমায়ী মৃড়ানীর হাত থেকে প্রস্তরখণ্ডটি ছিনিয়ে নেন। তারপর পরম আদরে সেটিকে বুকে চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ধীরে ধীরে ফিরে যান তাঁর আপন কক্ষের দিকে। মৃড়ানী ও তার সঙ্গিনীরা হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে এই উন্মাদিনী প্রায় সাধিকার দিকে।

অতঃপর আরো কয়েকটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বালিকা মৃড়ানীর প্রতি ব্রজমায়ী কি জানি কি কারণে বড় প্রীত হয়ে উঠেছেন, ঘনিষ্ঠতা করতে চাইছেন। মৃড়ানীও প্রায় সময়ে ঐ ভক্তিমতী সাধিকার কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হন, পরমানন্দে উভয়ে নানা কথাবার্তায় কালযাপন করেন। কিন্তু এক এক সময়ে ব্রজমায়ী হয়ে পড়েন ক্ষুব্ধ অভিমানাহত। বালিকা মৃড়ানীর সঙ্গে রূঢ় আচরণ ক'রে বসেন, যেন সে তাঁর সঙ্গে ভয়ঙ্কর হঠকারিতা ক'রে বসেছে, করেছে তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি।

হঠাৎ একদিন ব্রজমায়ী মৃড়ানীকে ডেকে নিয়ে যান তাঁর কাছে, শোকে ও কান্নায় ভেঙে পড়েন। অঝোর ধারে কপোল বেয়ে পড়তে থাকে অশ্রুধারা। বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মৃড়ানী। ভাবেন, আবার শুরু হয়েছে এক নূতন পাগলামি।

এবার ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন ব্রজমায়ী। নয়ন মুছে শান্ত স্বরে বলতে থাকেন, "মৃড়ানী, বয়সে তুমি আমার বেটির মতো, কিন্তু আজ থেকে তুমি হয়ে উঠেছো আমার প্রিয় বহিন। তোমার ভাগ্যের সীমা নেই বহিন। জানতো এই নারায়ণ-শিলা আমার ইষ্ট, প্রাণ দিয়ে এঁকে আমি ভালোবাসি, আর সেবাযত্ন করি। বড় জাগ্রত ঠাকুর ইনি। কিন্তু এবার আমার ঠাকুর তোমার প্রেমে মজেছেন। বেশ, ঠাকুরের অভিলাষটিই আজ আমি পূরণ করবো, যদিও এর ফলে আমার বুক ভেঙে যাবে। তোমার হাতেই প্রাণ-প্রভুকে সঁপে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।"

বালিকা মৃড়ানী তাঁর কথা শুনে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। কি উত্তর দেবে, কি প্রবোধ বাক্য বলবে, খুঁজে পাচ্ছে না।

পরদিন প্রত্যূষে উঠে সবাই সবিস্ময়ে দেখলেন, ব্রজমায়ী যেমনি অযাচিতভাবে এ বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তেমনি আকস্মিকভাবে হয়েছেন অন্তর্হিত। অতঃপর আর তার কোনো সন্ধান মেলে নি।

এই পবিত্র দামোদর বিগ্রহকেই মৃড়ানী গ্রহণ করল তার আরাধ্য ইষ্টদেব এবং স্বামীরূপে। ব্রজমায়ীর পূজার কক্ষে আনাগোনা করার ফলে এ ক'দিনে 'দামোদরে'র সেবাপূজার বিধি ও অনুষ্ঠান-গুলো তার জানা হয়ে গিয়েছিল। এবার থেকে তাই সে অনুসরণ ক'রে চলল নিষ্ঠাভরে। দামোদর প্রভু এবং তাঁর সেবাপূজার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে উঠল মৃড়ানীর বালিকা-জীবন।

মৃড়ানী ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করে। বাড়ির লোকেরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তার বিবাহের জন্য। সুপাত্রের খোঁজখবর মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু পাত্রী দেখানোর প্রস্তাব উঠলেই মৃড়ানী দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দেয়, "মানুষ বরকে আমি কখনো বিয়ে করবো না। এমন বরকে বিয়ে করবো, যে কখনো মরে না।"

দামোদর-শিলার পুজো অনুষ্ঠান নিয়ে মৃড়ানী সদাই মশগুল। মাঝে মাঝে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসলে গভীর ধ্যানাবেশ হয় তার। এ সব শুনে কোনো কোনো পাত্রপক্ষ ভাবে, মেয়েটা ছিটগ্রস্ত, পাগল হতে বেশী দেরি নেই। কেউ বা ভাবে, মেয়েটির সংস্কার ভালো তাই এমন ধর্মপ্রাণা। কিন্তু এই 'দেবী'-কে শুধু প্রশংসা করাই চলে, আট-পৌরে গৃহস্থী তো একে দিয়ে চলে না। ঘর-সংসার করাও প্রায় অসম্ভব। বিয়ের সম্বন্ধ দু'চারটে যা আসে, এসব কথা আলোচনার পর ভেঙে যায়।

জননী গিরিবালা নিজে ভক্তিমতী সাধিকা, তাই কন্যার সমস্যাটি তিনি বিচার করেন ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে। তাঁর দৃঢ় ধারণা, মৃড়ানী

জন্মান্তরেব সাত্ত্বিক বুদ্ধি নিযে জন্মগ্রহণ কবেছে, ঐশ্বরীয চেতনা তাব ভেতবে জাগ্রত বয়েছে অতি স্বাভাবিকভাবে। এই ভাব থেকে তাকে বিচ্যুত কবা যাবে না, দিন দিন সংসাবসম্পর্কে যে বকম উদাসীন সে হচ্ছে, তাব বিয়ে দিলে, খুব সম্ভব সে সুখী হবে না। এ মেযেকে ঘরে আটকিযে বাখা কঠিন হবে।

জ্যোতিষীদেব ভবিষ্যৎ-বাণীও গিবিবালা দেবীর স্মবণে আছে। তাঁবা বলেছেন, কন্যা বৈবাগ্যময জীবন অনুসবণ কববে। সব দিকে ভেবেচিন্তে গিরিবালা নিজে কন্যাব বিয়ে সম্পর্কে তেমন উৎসাহিনী নন। কিন্তু আত্মীযস্বজনেবা সবাই বলতে থাকেন,—অবাধ্য মেযেকে আব আশকাবা দেবাব প্রর্যোজন নেই। বাধ্য কবো তাকে বিয়ে কবতে। একবার স্বামীব ঘবে গেলে অবশ্যই মন তাব পবিবর্তিত হবে, স্বামী ও ঘব-সংসাবেব প্রতি ধীবে ধীবে হবে আকৃষ্ট।

অনেক কিছু বিচাব বিবেচনা ক'রে বাড়িব সবাই স্থিব করলেন, ভগ্নীপতি ভোলানাথ মুখুজ্জের সঙ্গেই মৃড়ানীব বিবাহ দেওয়া হবে। ভালো কুলীনের ঘর, একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকলেই বা। তাছাড়া, সবাই ভাবলেন মৃডানী যদি শ্বশুববাডিতে গিযে ইষ্টপূজা ইত্যাদি নিযে জেদ বা পাগলামিব মাত্রা চডায, তাব বড বোন বিপিনকালী তাকে মানিযে নিতে পাববে। অন্যত্র বিযে হলে, এ মেযেকে অচিবে বিদায নিতে হবে শ্বশুববাড়ি থেকে।

বিযেব শুভদিন এবং শুভলগ্নটি অতঃপব নির্ধারিত হয়ে গেল। মৃডানীব বযস এ সমযে মাত্র তের বৎসব।

সন্ধ্যায বাদ্যভাণ্ড নিযে বব বরযাত্রীবা সবাই এসে উপস্থিত। বিত্তবান্ ঘবেব বিযে, কাজেই বাদ্যভাণ্ড আলো বোশনাইব ব্যবস্থা সুপ্রচুব। চাবিদিকে হৈচৈ ও কর্মব্যস্ততা। এসময়ে হঠাৎ শোনা গেল, মৃড়ানী দৃঢ়স্ববে জানিয়ে দিযেছে, এ বিযে কোনোমতেই সে করবে না। শুধু তাই নয, প্রিয দামোদর-শিলা আব গৌবাঙ্গদেবেব পট একটি পুঁটুলিতে জডিযে নিয়ে কক্ষেব দবজা বন্ধ ক'রে দিযেছে

সে। বিয়েব সাজসজ্জা ও উপকবণ স্তূপীকৃত করা ছিল সেই ঘবে সেখানে আজ কাউকে সে ঢুকতে দেবে না।

আত্মীয়স্বজনদেব সাধ্যসাধনা আর ভীতিপ্রদর্শন, কোনো কিছুই টলাতে পাবছে না মৃড়ানীকে। উগ্রচণ্ডীব মূর্তি ধরেছে সে। জানালাব বাইবে থেকে যাবা তাকে শাসাচ্ছে, তাদেব দিকে বাব বার ছুঁড়ে মাবছে ঘবেব যতকিছু আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, আব দই-মিষ্টির ভাঁড়। বিযে বাড়িতে হঠাৎ যেন খণ্ডযুদ্ধ বেধে গিয়েছে।

এদিকে বিয়ের লগ্ন ছেড়ে যাবার উপক্রম। সবাই মৃড়ানীর মাকে চেপে ধবলেন, 'যা হোক ক'বে মেয়েকে তুমি শান্ত কবো, বিয়ে পণ্ড হলে লজ্জায জ্ঞাতি-কুটুম্বদেব আর মুখ দেখানো যাবে না।'

জননী গিবিবালা কিন্তু বুঝে নিযেছেন, মেযেব এই জেদ ভাঙানো বড় কঠিন। এই সঙ্গে একটা ভীতির সঞ্চারও হয়েছে তাঁর অন্তরে। বেশী জোর কবলে শেষটায় মেযেটা যদি পাগল হয়ে যায়? যদি সে মরিযা হযে আত্মঘাতিনী হয? কেন আব ওকে এমন ক'রে ক্ষেপিযে দেওযা। নাই-বা হল এই বিয়ে। কুলীনেব ঘবে কত মেয়ে তো অবিবাহিতাও থাকে।

বন্ধ দবজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জননী আশ্বাস দিলেন, "মান্ত, মা, তোর কোনো ভয় নেই। আমি বলছি, এ বিযে তোকে করতে হবে না। তুই দুযাব খুলে দে।"

মায়ের কথায় বিশ্বাস হয় না মৃড়ানীব। ঘবেব কপাট কিছুতেই সে খুলবে না, ঢুকতে দেবে না কাউকেই।

গিরিবালা এবার তিন সত্যি কবেন, এ বিযে তিনি এখনি ভেঙে দিচ্ছেন। অনুনয় ক'বে বলেন, মান্ত, এবাব আমায বিশ্বাস কর, আমায় যেতে দে তোব কাছে।"

দবজা খুলে যায়, মৃড়ানী সজল চক্ষে জড়িয়ে ধরে জননীকে, আর্ত-স্বরে জানায়, "কোনো মানুষকে আমি বিয়ে করতে পাববো না, মা। তোমরা যদি জোব করো, বিষ খেযে মরবো আমি।"

কন্যার মনেব অবস্থা বুঝে নিয়েছেন গিরিবালা। সঙ্গে সঙ্গে

নিজেব কর্তব্যও স্থির ক'বে ফেলেছেন। দবজাটি বন্ধ ক'বে মাস্তুকে টেনে নিলেন কোলেব কাছে। সস্নেহে বললেন, "তোব বৈবাগ্যের ফুল যদি সত্যিই ফুটে থাকে, আমি তোকে বিয়ে কবতে বাধ্য কববো না। বিয়েব লগ্ন এসে গিযেছে। বেশ, এই শুভ লগ্নে, মা হযে আজ আমি তোকে সমর্পণ কবলাম শ্রীভগবানেবই পাদপদ্মে। আজ থেকে তিনি গ্রহণ করুন তোব সকল কিছুব ভার।"

বাড়িব সবাই এতক্ষণ ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করছে, বিয়েব লগ্ন বযে যাবাব আগে মৃড়ানীকে তারা ধবে নিযে যেতে চায়।

গিরিবালা ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেন, "মাস্তু, এখনি ওবা জোর ক'বে ঘবে ঢুকবে, তোকে মাবধব করবে। শিগ্‌গীর তুই পালিযে যা। পাড়াব ঠানদিব বাড়িতে গিয়ে লুকিযে থাক্ কযেকদিন, সবাইব বাগ পড়ে গেলে ফিবে আসবি।"

আঁচল থেকে চাবি বাব ক'রে পেছনকাব এক তালাবদ্ধ ক্ষুদ্র কবাট খুলে দিলেন গিরিবালা। শালগ্রাম-শিলা আব গৌবাঙ্গেব পট জডানো পুঁটুলিটি বুকে ধবে মৃড়ানী সেখান থেকে উর্ধ্বশ্বাসে পলাযন কবল।

কক্ষের বাইবে এসে গিবিবালা সবাইকে বলে দিলেন, "অমন জেদী মেয়েকে ধরে বাখা সাধ্য আমাব হয় নি। পেছনেব দবজা ভেঙে সে কোথায ছুটে পালিযেছে।"

প্রতিবেশিনী ঠানদিব বাড়িতে গিয়ে সে রাত্রিতে মৃডানী আশ্রয নেয়। এদিকে বিযে পণ্ড হওযায ববযাত্রী ও আত্মীয় কুটুম্বেবা বোষে গজ্‌গজ্ কবতে কবতে সেখান থেকে প্রস্থান কবে।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েবা এবাব কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠেন মৃড়ানীব জন্য। কোথায় সে নিখোঁজ হযে চলে গেল, জলে ডুবে মবল কিনা, শুরু হল বহুতব জল্পনা কল্পনা। জননী গিবিবালা কিন্তু আসল কথাটি ফাঁস ক'বে দিলেন না। ভাবলেন, উত্তেজনা ও আলোড়ন থেমে গেলে, তাবপব মেযেকে ঘবে ফিবিযে আনবেন।

দুদিন পরেই আশ্রয়দাত্রী ঠানদিব কথায মৃড়ানীব খোঁজ পাওয়া

গেল। অতঃপর বর্ষীয়ান্ আত্মীয়েরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, ঘরে ফিরিয়ে আনলেন তাকে।

এ সময় থেকে মৃড়ানীর জীবনের মোড় ফিরে যায় চিরতরে। ইষ্ট দামোদর-বিগ্রহের সেবা-পূজা, আর স্তব কীর্তনে তিনি মেতে ওঠেন। গৃহের একটি নিভৃত কক্ষ তাঁর ঠাকুরের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় এবং দিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই মৃড়ানী সানন্দে সেখানে অতিবাহিত করে।

সঙ্গিনী ও প্রতিবেশীরা সুযোগ পেলেই তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কেউ কেউ নারী জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা সদুপদেশ দিতেও এগিয়ে আসে। মৃড়ানীর কিন্তু কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। নীরবে, একাগ্রচিত্তে, আপন দিনচর্যা নিয়েই সে দিন কাটায়। কখনো বা প্রিয় চণ্ডীমামাকে ডেকে নিয়ে আসে তার কক্ষে, তাঁর মুখ থেকে শ্রবণ করে তীর্থ পরিব্রাজনের কত মনোজ্ঞ কাহিনী। জাগ্রত দেবদেবী ও বিগ্রহের বিস্ময়কর কথা শুনে শরীর তাঁর পুলকাঞ্চিত হয়ে ওঠে, মন উধাও হয়ে যায় অদেখা অজানা শ্রীভগবানের রহস্যময়-লোকে।

চণ্ডীমামার কাছে বার বার দেবভূমি হিমালয়ের মাহাত্ম্য শুনে মৃড়ানীর দৃঢ় ধারণা জন্মে—ঐ চিরপবিত্র, চিরজাগ্রত মহাশৈলের কন্দরে ব'সে কঠোর তপস্যা না করলে ঈশ্বর দর্শন কখনো সম্ভব নয়। এই ধারণা ও প্রত্যয় ক্রমে মৃড়ানীর সারা অন্তর অধিকার ক'রে বসে। সংকল্প স্থির ক'রে ফেলে, আর এখানে থাকা নয়, সর্বস্ব ছেড়ে সর্বময়ের সন্ধানে সে বার হয়ে পড়বে। চিরতরে ছিন্ন করবে ঘর-সংসার ও স্নেহ-মমতার বন্ধন। তীর্থে তীর্থে হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে খুঁজে বেড়াবে সেই পরমধন যাঁর জন্য যুগ যুগ ধরে বিরাগী হয়েছেন যোগী ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসীর দল।

পলায়নের জন্য চেষ্টিত হয় মৃড়ানী। সেদিন গঙ্গাস্নানের ছলে শেষ রাত্রিতে যেই বাড়ির বাইরে পদার্পণ করেছে অমনি ধরা পড়ে যায় ফটকের দারোয়ানের চোখে। 'দিদিমণি কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে

বলে চেঁচামেচি শুরু হয, বাডিব লোকেবা এসে তাকে ঘিবে ধবে, ঘবে ফিবিযে নেয। এবার ব্যবস্থা হয কডা পাহারাব।

মা ও বাবা কত ক'বে বুঝান "ওবে ঘবে থেকে কি ভগবান্ লাভ হয় না? এখানে থেকে তোব ইচ্ছেমতো ঠাকুবেব সেবাপুজো কব, মাঝে মাঝে তীর্থ দর্শন সাধুদর্শন ক'বে আয। তাই তো ভাল, অনর্থক পাগলামি ক'বে আমাদেব দুঃখ বাডাসনে।"

কিছুদিনেব জন্য সে শান্ত হযে ঘবে থাকে, ইষ্টদেব দামোদবেব পূজায় প্রাণমন ঢেলে দেয। কিন্তু মাঝে মাঝেই মনে ঝিলিক দিযে যায দীক্ষাদাতা সেই তপস্বী ঠাকুবমশাইব ভাবঘন মূর্তিটি। তাঁব সন্ধানের জন্য কত লোককেই যে অনুবোধ জানায। কিন্তু ঠাকুব-মশাই তখন এ অঞ্চল থেকে কোথায চলে গিযেছেন, তাঁব সঙ্গে যোগাযোগের সব চেষ্টা বিফল হয়।

মৃডানীর খুড়োমশাই এবং বডদা সে-বাব যাচ্ছেন কালনায সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করতে। মৃডানীকেও তাঁবা সোৎসাহে সঙ্গে নিযে চলেন। ভাবেন, যদিই বা এই সিদ্ধপুরুষকে দর্শন ক'রে তাঁব উপদেশ পেযে, ওর মন কিছুটা শান্ত হয।

বাবাজী মহাবাজের দর্শন পেয়ে, আব তাঁব মুখে কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ অনুবাগেব কথা শুনে মৃডানীব আনন্দেব অবধি নেই। বাবাজীও এই ভক্তিমতী কিশোবীকে সান্নিধ্যে পেয়ে মহা উল্লসিত। মৃডানীব দাদাব কাছে সিদ্ধ চৈতন্যদাস মৃডানীব কাহিনীর সব শ্রবণ কবলেন। পবিত্র দামোদর-শিলা নিজে যেচে তাব সেবা গ্রহণ কবেছেন, মৃডানীও একাগ্রচিত্তে ক'বে চলেছে তাঁব সেবা-পূজা—এসব শুনে বাবাজী মহারাজ মন্তব্য কবেন, "বাবা, তোমাদেব এ মেযে তো সামান্য নয। এ যে তোমাদেব ভাগ্যেব কথা। জন্মান্তরের পুণ্য চাই, নইলে ঈশ্ববীয কৃপা তো এভাবে পাওযা যায না।"

মৃডানীকেও এই সিদ্ধ মহাত্মা জানান তাঁব সস্নেহ আশীর্বাদ, উৎসাহিত কবেন ধর্মপথে এগিযে যাবাব জন্য। বলেন, "উত্তম পথ

ধরেছো মা, গুরুদত্ত নাম আর ঈশ্বরের কৃপা সম্বল ক'রে এবার এগোতে থাকো তোমার লক্ষ্যের দিকে।"

জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র নিজে ছিলেন একজন ভক্তিমান্ সাধক, খুল্লতাত ও মৃড়ানীকে সঙ্গে ক'রে নবদ্বীপধামেও তিনি উপস্থিত হলেন। এখানে দর্শন পেলেন মহাত্মা চৈতন্যদাস বাবাজীর। বাবাজী গৌরপ্রেমে ও গৌরধ্যানে সদা বিভোর, নবদ্বীপধাম তীর্থ করতে যাঁরাই আসেন, এই প্রেমসিদ্ধ মহাপুরুষকে, তাঁরা দর্শন ক'রে যান। চৈতন্যদাসজীও বালিকা মৃড়ানীকে কৃপা করেন অশেষভাবে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বার বার বলতে থাকেন, "জয় গৌর। বাঃ, একি সত্য? এই এতটুকু মেয়ে এমনি একনিষ্ঠা ভক্তিপ্রেম দিয়ে প্রভু দামোদরকে আকর্ষণ ক'রে আনল! এমনটি তো কখনো শোনা যায় না। জয় গৌর, জয় গৌর।"

ভক্তিমতী মৃড়ানীর দিকে বাবাজী দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন, আর প্রেমানন্দ উথলে উঠছে তাঁর দেহে মনে। এই ভক্ত কিশোরীর উপর ঝরে পড়ল মহাত্মার বিশেষ কৃপা। তিনি বলে বসলেন, "মা, আমার বড় সাধ ছিল, গৌরবর্ণ একখানা ভালো বেনারসী রেশমী শাড়ী পরে আমার গোরাচাঁদের সেবা ও ভজন করবো। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারে নি আমার পছন্দ মতো শাড়ী। তুই মা আমায় এটা যোগাড় ক'রে দিতে পারবি?"

"খুব পারবো, বাবা, খুব পারবো। এতো সামান্য কাজ।" সোৎসাহে বলে ওঠে মৃড়ানী। "গৌর তো আমারও প্রভু, তাঁর পুজোর শাড়ী যোগাড় হবে না, সে কি কথা!"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে তখনি আবদার জানায় সে, যে ক'রে হোক বাজার থেকে এ ধরনের একটি শাড়ী তাঁকে কিনে দিতেই হবে। বহুস্থানে খোঁজাখুঁজির পর বাজারের একটি নূতন চালানী গাঁট থেকে পাওয়া গেল বাবাজীর পছন্দসই একটি শাড়ী। উচ্চ মূল্যে তখনি এটি ক্রয় করে আনা হল। মৃড়ানীর কাছ থেকে এই উপহারটি পেয়ে চৈতন্যদাসজীর আনন্দ আর ধরে না। বালকের মতো আনন্দে

অধীর হয়ে সবাইকে দেখাতে শুরু কবলেন, “ছাখো ছাখো, কি চমৎকাব শাড়ী এ মেয়েটি আমায দিয়েছে। এবাব গোরাচাঁদেব মন ভুলাতে হবে এটি প'বে।”

এইভাবে কয়েক বৎসব অতিবাহিত হয়ে গেল। নানা তীর্থ, দেব-দেউল এবং সাধু মহাত্মাদেব মৃড়ানী দর্শন কবছেন বটে, কিন্তু অন্তবে তাঁব সত্যিকাব স্থাযী আনন্দ তো উপজাত হচ্ছে না। তাছাড়া ইষ্ট সাক্ষাৎকার কোন পথে হবে, কি ক'রেই বা সম্ভব হবে, তাব কিছু জানা নেই।

প্রভুব লীলা দর্শনেব গোপন চাবিকাঠিটি কোথায়, তা-ই বা কে তাকে বলে দেবে? শুধু অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানোই কি তাঁব সাব হবে? আব কতদিন তাঁকে যাপন কবতে হবে এই দুঃসহ প্রতীক্ষায়?

মৃড়ানী এখন অষ্টাদশী তরুণী। স্বাধীন ভাবনা ও বিচাববুদ্ধির বয়স তাঁব হয়েছে। কিন্তু এত ভেবেও ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে কোনো কিছু স্থিব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

এ সময়কার অস্থির মানসিকতা এবং মুমুক্ষুব তীব্রতার এক মনোরম চিত্র এঁকেছেন তাঁর উত্তবসাধিকা দুর্গাপুরী দেবী। তিনি লিখেছেন:

“মৃড়ানী চিন্তাব অকূল পাথারে ভাসিতে লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে গুরুর কৃপালাভ হইল, অযাচিতভাবে দামোদব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাপি কেন চিত্ত পূর্ণতায় পবিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে না? কিন্তু এই পাওয়াই কি চরম সার্থকতা? কই, এই প্রস্তরময় ঠাকুব তো আমাব সঙ্গে কথা কন না। আমাকে তো তাঁহাব ভুবনমোহন-রূপে দেখা দেন না। কই তাঁহাব নূপুবেব রুনুঝুনু ধ্বনি? মোহন-মুবলীব সুব তো শুনিতে পাই না। দামোদব কি তবে শুধুই শিলা? গিবিধাবীলাল তো মীবাবাঈ-এব সঙ্গে কথা কহিতেন। ব্রজবমণীটি কি তবে মিথ্যা বলিয়া গেলেন?

"তিনি তো মিথ্যা বলিতে পারেন না। আসল কথা, তপস্যা করিতে হইবে, কঠোর তপস্যা। যথাসর্বস্ব দিয়া দামোদরকে ভালবাসিব। ইহার মুখ হইতে কথা বাহির করিব, ইহার রূপ দেখিয়া নয়ন এবং জীবন সার্থক করিব। কিন্তু সংসারের মধ্যে বাস করিয়া, এইভাবে বন্দিনী থাকিয়া তাহা কি সম্ভব?"

এই সব চিন্তা দিনের দিন পর ভিড় ক'রে আসে মৃড়ানীর অন্তরে। একদিন হঠাৎ প্রাপ্ত হন দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোক থেকে আগত বহু প্রতীক্ষিত, নির্দেশ—"মন্ত্রের সাধন করতে হবে তোমায়, তবেই তো সিদ্ধ হবে অভিষ্ট। আগে ইষ্টলাভের জন্য তোমার সর্বস্ব ত্যাগ করো, সেই ইষ্টক কৃপা ক'রে দেখিয়ে দেবেন পরম পথ, অমৃতত্ব লাভে জীবন হয়ে উঠবে সার্থক।"

লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটি এবার আলোকিত হয়ে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ কর্তব্য সম্পর্কে সংকল্প স্থির করতেও মৃড়ানীর বিলম্ব হল না। এবার চিরতরে ঘরসংসার ও আত্মীয়স্বজনের মায়া ত্যাগ করবেন তিনি। এখন কিছুদিন থাকতে হবে তাঁকে সুযোগের প্রতীক্ষায়।

স্বজন ও প্রতিবেশীদের একটি বৃহৎ দল সে-বার পুণ্যতীর্থ সাগর-সঙ্গমে স্নান করতে যাচ্ছেন। তীর্থযাত্রিণী হয়ে মৃড়ানীও জুটে গেলেন তাঁদের সঙ্গে।

প্রথম দুইটি দিন স্নান, দেবদর্শন ও সাধু-সন্ন্যাসীর পুণ্যসঙ্গে অতিবাহিত হল। তৃতীয় দিনের প্রত্যূষে মৃড়ানী পলায়ন করলেন তাঁর সঙ্গিনীদের দল থেকে।

প্রথমটায় সবাই ভেবেছিলেন, হয় সে সাগরে স্নান করতে গিয়েছে, বা কোনো সাধুমণ্ডলীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু বাসস্থানে ফিরতে দেরি দেখে সবাই ক্রমে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। চারদিকে তন্ন তন্ন ক'রে বহু অনুসন্ধান চালানো হল, কিন্তু তাঁর কোনো সংবাদই পাওয়া গেল না। যখন দেখা গেল, মৃড়ানীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়

বস্তু দামোদবশিলা এবং গৌবাঙ্গেব পটটি অন্তর্হিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল, পাখি এবাব শিকলি কেটে ডানা মেলে দিয়েছে মুক্তিব আকাশে।

আবো তিনদিন মেলা প্রাঙ্গণে এবং নিকটস্থ সাধু-সন্ন্যাসীব মণ্ডলীতে জোব খোঁজাখুঁজিব পব আত্মীয়েবা হতাশ হযে কলকাতায প্রত্যাবর্তন কবলেন। জননী গিবিবালাব মনে এতদিন আশা ছিল, মৃড়ানী গৃহে থেকে সাধনভজন করবে, অভিষ্ট লাভেব পথে ধীবে ধীবে হবে অগ্রসব। এবাব সে আশা একেবাবে হযে গেল ধূলিসাৎ। শোকাকুল জননী শয্যা গ্রহণ কবলেন।

অভিভাবকেবা তীর্থে তীর্থে লোকজন পাঠিযে অনেক অনুসন্ধান চালালেন। অবশেষে তাঁবা ঘোষণা করলেন, মৃডানীব সন্ধান যে এনে দিতে পাববে তাকে দেওযা হবে হাজাব টাকা পুবস্কাব। কিন্তু সব কিছু প্রয়াসই হল ব্যর্থতায পর্যবসতি।

এদিকে মৃড়ানী তাঁদেব আস্তানা ছেডে আশ্রয় নিযেছেন নিকটস্থ এক জঙ্গলে। দুদিন সেখানে আত্মগোপন থাকাব পর বুঝলেন, সহযাত্রীবা তাঁর সম্পর্কে হতাশ হয়ে ফিবে চলে গেছেন কলকাতায। এবাব তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঝাঁপ দিতে পাববেন বহুদিনেব আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিব তপস্যায।

প্রথম পশ্চিম দেশীয় একটি সন্ন্যাসিনী দলের সঙ্গে মৃডানী ঘনিষ্ঠতা ক'বে নিলেন। নিজেব বেশভূষা পবিবর্তন ক'রে সাজলেন পাহাডী রমণীব বেশে। তারপব ঐ দলটিব সঙ্গে শুরু হল তাঁব পথ পবিক্রমা। দুই-তিন মাস নানাস্থানে ভ্রমণেব পবে উপনীত হলেন হবিদ্বাবে। অতঃপব এখান থেকেই শুরু হয় তাঁব দীর্ঘ পবিব্রাজন ও কৃচ্ছ্রময সাধনা।

দেবদেউল, সাধুমণ্ডলী ও উদাসী পঙ্গত যেখানেই তিনি উপস্থিত হতেন আবালবৃদ্ধবনিতা সবাবই দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো তাঁব দিকে। অত্যুজ্জ্বল গৌরকান্তি, তীক্ষ্ণনাসা আযত নযন এবং দীর্ঘায়ত তনুব

বৈশিষ্ট্য সদাই তাঁকে পৃথক করে রাখত শত শত সাধক এবং সাধিকাদের থেকে। ভক্ত পাহাড়িয়ারা এই গৌরবর্ণা তপস্বিনীর নামকরণ করেছিল, গোরামায়ী। উত্তরকালে এই নামই পরিবর্তিত হয় 'গৌরামা'-য়। গৌরমার পরিব্রাজিকা জীবন ও তপস্যাপূত জীবনের কিছু কিছু তথ্য ও কাহিনী উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের কাছে নিজেই তিনি বিবৃত ক'রে গিয়েছেন। এইসব তথ্য এবং কাহিনী তাঁর মহাজীবনের মূল্যবান উপকরণ। আজো তা ভাস্বর হয়ে আছে অগণিত ভক্ত-সাধক ও অধ্যাত্ম-রসপিপাসু ব্যক্তিদের কাছে, আলোকিত ক'রে তুলছে ভক্ত ও মুমুক্ষুদের তমসাবৃত যাত্রাপথ।

পরিব্রাজনের শুরুতেই দেবতাত্মা হিমালয়ের অমোঘ আকর্ষণে আপনহারা হয়ে গেলেন গৌরীমা। সর্পিল গৈরিক পথ মাইলের পর মাইল ঊর্ধ্বায়িত হয়ে চলেছে, দূর স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে ঝলমল ক'রে উঠেছে রূপালী আলোর স্বপ্নে ভরা বরফান পাহাড়। চূড়ার পর চূড়া এগিয়ে গিয়েছে রহস্যঘন অসীম অনন্তলোকে। কানে কানে বলে চলেছে সাধনজীবনের সেই শাশ্বত মহাবাণী, চরৈবেতি চরৈবেতি। এগিয়ে যাও—আরো, আরো, এগিয়ে যাও, সেখানে গিয়ে পাবে তোমার পরমধনকে, সর্বময়কে।

কেদার, বদরী দর্শন করলেন গৌরীমা। লিঙ্গরাজ অমরনাথের করলেন অর্চনা ও পরিক্রমা। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী এবং জ্বালামুখীর পুণ্যতীর্থে কিছুকাল তপস্যা ক'রে আবার বহির্গত হলেন মধ্যভারতে তীর্থ ও সাধনপীঠে পরিব্রাজন করার জন্য। এই সময়ে এই সহায়-সম্পদহীনা অষ্টাদশী তরুণী ব্রহ্মচারিণীকে যে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়, যে বিঘ্ন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তা ধারণায় আনা কঠিন। মাতাজী দুর্গাপুরীজীর শ্রুত তথ্যাদি থেকে এ-সময়কার অবস্থার কিছুটা আভাস আমরা পাই:

"অনভ্যাসবশত প্রথম তাঁহার পথশ্রমে ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় কষ্টবোধ হইত, ক্রমশ সমস্ত কষ্ট অভ্যস্ত হইয়া গেল। হিমালয় ভ্রমণকালে

অনাহার দুর্বলতা এবং শীতেব প্রকোপে তিনি অনেকবাব সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছেন, সবল পবোপকারী পাহাড়ী মাযীবা নিজেদেব বস্তিতে লইযা গিযা তাঁহাব সেবাশুশ্রূষা কবিয়াছে।

"দৈহিক রূপ বিকৃত কবিযা দিবাব জন্য গৌবীমা ভগবানেব নিকট প্রার্থনা কবিতেন। সময় সময় মৃত্তিকা ও ভস্ম গাযে মাখিতেন, মাথাব চুল কাটিযা ফেলিতেন, কখনও বা পাগল সাজিতেন। আবাব কখনও আলখাল্লা এবং পাগড়ি পরিয়া পুরুষেব বেশে থাকিতেন। নিতান্ত প্রযোজন ব্যতীত কাহাবও সহিত তিনি কথা কহিতেন না। প্রয়োজনমতো কখনও বলিতেন, তিনি বিবাহিতা, স্বামীর অনুমতি লইযাই গৃহস্থাশ্রয ত্যাগ করিযাছেন, কখনও বলিতেন, স্বামী সঙ্গেই আছেন। বলা বাহুল্য, স্বামী বলিতে তিনি দামোদব, শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌবাঙ্গদেবকেই বুঝাইতেন। এই সময তিনি গৈবিক বসন পরিতে আরম্ভ কবেন। গলায দামোদব-শিলা ঝুলাইযা রাখিতেন, আব ঝোলাতে থাকিত মা কালী, ও গৌরাঙ্গদেবেব পট, চণ্ডী, ভাগবত এবং নিত্য ব্যবহার্য সামান্য জিনিসপত্র। অধিকাংশ সময তিনি পাযে হাঁটিয়াই চলিতেন।"

"তাঁহাব জীবনে এমন সময়ও গিয়াছে যে, দিনেব পব দিন উদয়াস্ত তপস্যা করিযাছেন, মাধুকরীতে বাহির হইবাবও অবসব পান নাই। আবাব এমনও ঘটিযাছে, তাঁহাব অজ্ঞাতসারে কেহ আসিয়া কিঞ্চিৎ আহার্য দ্রব্য বাখিযা গিয়াছেন।"

পবিব্রাজনেব কালে দীর্ঘদিন একটি নির্দিষ্ট দলেব সঙ্গে পথ চলা গৌবীমাব পক্ষে সম্ভব হতো না। গৃহস্থ যাত্রী বা সাধুমণ্ডলী অনেক সময় পূর্ব নির্ধাবিত স্থানসমূহ দর্শন কবতেন, এবং হিসেব কবা সময অনুসাবে থাকতেন। গৌবীমাব চালচলন ছিল ভিন্নরূপ। কোনো তীর্থ, দেবদেউল বা বিগ্রহ তাঁব ভালো লাগলে, সেখানে কিছুদিনেব জন্য তিনি অবস্থান কবতেন, তপস্যা ও সাধনায ডুবে যেতেন। ফলে অনেক সময় বহু দুর্গম তীর্থে তাঁকে একাকিনী অগ্রসব্ হতে হযেছে। এবং নিভৃতে বাস ক'বে সাধনভজন কবতে হযেছে।

তাঁর এসময়কার বিপদসঙ্কুল পথ পরিক্রমার কাহিনী উত্তরকালে তিনি ভক্তদের কাছে বিবৃত করতেন।[১]

একবার হিমালয়ের দুরধিগম্য অঞ্চলের এক গুহায় বসে তিনি কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন। সেখান থেকে অবতরণ করার সময় সম্মুখে পড়ল একটি খরস্রোতা নদী। পাহাড়ীরা গাছের গুঁড়ি ফেলে একটি সেতু নির্মাণ করেছে, কিন্তু বহুকাল যাবৎ এর সংস্কার করা হয় নি, এবার এটি খুব জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এই সেতু পার হবার সময় গৌরীমা পা ফস্‌কে পড়ে গেলেন তুহিনশীতল জলস্রোতে। উদ্দাম ফেনিল জলধারা মুহূর্ত মধ্যে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল তীব্রবেগে। এ অবস্থায় মৃত্যু অবধারিত, গৌরীমা তাই ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে ভেসে চললেন নিচের দিকে। এমন সময়ে হঠাৎ পাশের পাহাড়ে ধস নামল এবং চকিতে একটি সুবৃহৎ বরফের চাঁই নদীর গতিপথ করল অবরুদ্ধ। গৌরীমার ভাসমান শরীর আটকে গেল ঐ বরফে, তারপর হাতড়ে হাতড়ে তীরে এসে উঠলেন তিনি। মনে প্রাণে উপলব্ধি করলেন, ইষ্টদেবের কৃপার ফলেই এই অভাবনীয় উপায়ে তাঁর জীবন রক্ষা হল।

আর একবার শীতের সময় উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের এক দীর্ঘ অরণ্য অতিক্রম করছেন গৌরীমা, হঠাৎ আকাশ থেকে শুরু হল তুষারপাত। তুষারের আবরণে সারা দেহ ঢেকে গিয়েছে। তবুও তাঁর চলার বিরাম নেই। দুর্জয় সাহস নিয়ে এগিয়ে কোনোমতে বাকী পথটা তিনি শেষ করতে চান। দুই একজন পাহাড়ী পথচারীর কাছে শুনেছেন, অরণ্যের প্রান্তে লোকালয় পাওয়া যাবে, সেখানে পৌঁছে আগুন পাওয়া যাবে, এই একমাত্র ভরসা। কিন্তু পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। এদিকে তুষার পড়ার ফলে সারা দেহ প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। ক্রমে তিনি চলৎ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেতে বসেছে। অবসাদ ও নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পাকদণ্ডীর পথে এলিয়ে পড়ল তাঁর দেহ।

---

১ গৌরীমা · শ্রীদুর্গাপুরী দেবী

এমন সময়ে এই জনমানবহীন বনে হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভূত হল প্রৌঢ়া ঘাগবা-পবা, এক পাহাড়ী বমণী। মাথায় ঝুঁটি বাঁধা চুল, হাতে একটি লাঠি। খপ্ ক'বে গৌবীমাব হাতটি ধবে সে তাঁকে টেনে ওঠায়, দৃঢ় স্ববে ভর্ৎসনা ক'বে বলে, "এই লেডকী, জলদি উঠে আয়। ববফেব কববে চাপা পড়বি নাকি?"

পাহাড়ী নাবীব কথায় যেন বিদ্যুতেব শক্তি খেলে যায়। চকিতে উঠে দাঁড়ান গৌরীমা, তাব লাঠিটিব উপব ভব দিযে তাবই ইঙ্গিত অনুসাবে, এগিয়ে চলেন খানিকটা। কযেক মিনিট চলাব পবই দেখা গেল তাবা একটি কাঠুবে বসতিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সহৃদয় পাহাড়ীরা তৎক্ষণাৎ আগুনেব পাত্র এনে হাজিব করে, সেঁকেব ফলে গৌবীমাব অসাড় দেহটি অল্পকাল মধ্যে চাঙ্গা হযে ওঠে। চা দুধ খাওযাব পব সুস্থ বোধ কবামাত্র তিনি ব্যাকুল হযে ওঠেন তাঁব সেই ত্রাণকাবিণী পাহাড়ী রমণীকে দেখবাব জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে কোথায যেন সে অদৃশ্য হযে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা গেল, এ-অঞ্চলেব কেউ তাকে চেনে না, চোখেও দেখে নি কোনোদিন। সবিস্ময়ে গৌবীমা ভাবতে লাগলেন, তবে কি এই বমণী কোনো বনদেবী, অথবা সর্বদুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা? তাঁব অপাব কৃপাব কথা স্মবণ ক'বে গৌবীমার নযন অশ্রুসিক্ত হয়, সাবা অন্তব ভবে ওঠে কৃতজ্ঞতায।

একবার আপন মনে পথ চলতে চলতে গৌবীমা এক দুর্গম পাহাড়ে এসে পৌঁছেছেন। আশপাশে জনমানবেব চিহ্ন নেই। কিন্তু অদূবে দেখা যাচ্ছে একটি নাতিবৃহৎ শিবমন্দিব। কৌতূহলী হয়ে ঐ মন্দিবেব দিকে তিনি এগিযে এলেন। দেখলেন মন্দিবে প্রবেশ কববার কোনো দবজা নেই। এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান একটি বৃহৎ বেলগাছ, অপব পার্শ্ব দিযে প্রবাহিত হযে চলেছে একটি ক্ষুদ্রকাযা পার্বত্য নদী।

গৌরীমাব মনে তীব্র ইচ্ছে জাগল, এই দ্বাব-গবাক্ষহীন বদ্ধ মন্দিবের অভ্যন্তরে কি বযেছে তা তিনি দেখবেন। মন্দিরগাত্র

পরীক্ষা করতে করতে নিচের দিকে একটি ক্ষুদ্র গর্ত পাওয়া গেল। পাথরের চাঁই দিয়ে এই গর্তটির ওপর বার বার চাপ দিতেই, এটি বড়ো হয়ে উঠল, বেরিয়ে পড়ল এক সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ। অকুতোভয়ে এই সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়লেন গৌরীমা, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে এসে পড়লেন মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখে। সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন, শ্বেতপাথরের এক মনোরম শিবলিঙ্গ সেখানে সংস্থাপিত। কয়েকটি বিষধর সর্প পরম আনন্দে ও নিশ্চিন্তে এই লিঙ্গবিগ্রহকে বেষ্টন ক'রে আছে।

একপাশে মিটিমিটি জ্বলছে একটি ঘৃতের প্রদীপ, ব্যবস্থাপনার কুশলতায় একটি বৃহৎ আধারে সঞ্চিত ঘৃত এসে জড়ো হচ্ছে প্রদীপের উপর, দীপশিখাকে রেখেছে অনির্বাণ। "আরো আশ্চর্য কাণ্ড, লিঙ্গবিগ্রহের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ক্ষুদ্র জলধারা, উপবিস্থিত বেলগাছ থেকে টুপ্-টাপ্ ক'রে এক একটি পত্রগুচ্ছ সেই জলস্রোতে ঝরে পড়ছে আর শিবলিঙ্গকে স্পর্শ ক'রে আবার অন্তর্হিত হচ্ছে মন্দির পার্শ্বস্থ নদীগর্ভে।

সর্পকুল নবাগতা গৌরীমাকে দেখে জড়োসড়ো হয়ে একপাশে সরে গেল, এবং তিনিও পরমানন্দে শিবস্তোত্র পাঠ ক'রে শিব বন্দনা ক'রে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঐ রহস্যময় মন্দির থেকে।

উত্তরকালে এই মন্দির প্রসঙ্গে গৌরীমা তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন কোনো সময়ে ঐ পবিত্র স্থানটিতে বসে এক শৈব সাধক কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন, তারপর হয়েছিলেন সিদ্ধকাম। পরবর্তীকালে তাঁরই এক ভক্ত শিষ্য গুরুর সাধনপীঠের উপর গড়ে তুলেছিলেন এই মন্দির। সিদ্ধপীঠে স্থাপিত শিবলিঙ্গের আশেপাশে বিষধর সর্পেরা স্বভাবতই অবস্থান করতে ভালবাসে।

বদরীনাথ দর্শন ক'রে সে-বার গৌরীমা সন্নিহিত পাহাড়গুলিতে ঘোরাঘুরি করছিলেন। মনে আশা, যদি ভাগ্যক্রমে কোনো ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার সন্ধান পান।

হঠাৎ একদিন এক নিভৃত পর্বত কন্দরে দর্শন পেলেন এক

প্রাচীন মহাত্মাব। এ মহাত্মাটি খুব কঠোবী, দর্শনার্থী ভক্ত বা তীর্থ-যাত্রীদেব সঙ্গে কদাচিৎ তাঁকে বাক্যালাপ কবতে দেখা যেতো।

প্রণাম নিবেদন ক'বে দীর্ঘকাল গৌবীমা তাঁব সম্মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে বসে আছেন। সহসা সাধুটি তাঁব নয়ন দুটি উন্মীলন কবলেন। মুখে একটি শব্দ নেই, প্রসন্নমধুব হাস্যে বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নিজেব কবতল দুটি বুকেব কাছে নিযে এসে, পাশাপাশি-ভাবে স্থাপন কবলেন, স্থিবভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবলেন তাব ওপর। তৎক্ষণাৎ গৌবীমা বুঝে নিলেন মহাত্মাব এই ইঙ্গিতেব গূঢ় তাৎপর্য। নবীন সাধিকাকে তিনি জানিযে দিলেন, স্বচ্ছ দর্পণে যেমন নিজেব দেহেব প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত কবা যায, তেমনি পবমাত্মাকেও উপলব্ধি কবা যায হৃদয়-দর্পণে। এ হচ্ছে সকল সাধনাব মূল কথা। হৃদয় দর্পণকে স্বচ্ছ ও মালিন্যমুক্ত বাখতে পাবলে তবেই সাধক হবেন সিদ্ধকাম।

কেদাবনাথেব মন্দিবের নিকটস্থ অঞ্চলে গিযে গৌবীমাব একবাব পথভ্রম হযে গেল, অবণ্যপথ দিয়ে চলতে চলতে বহুদূব চলে গেলেন তিনি। অতি দুর্গম স্থান, মানুষের কোনো বসতি নেই, প্রায় দুদিন তাঁকে কাটাতে হল অনাহাবে।

শ্রান্ত অবসন্ন দেহে একটি পাহাড়েব পাদদেশে শুয়ে আছেন, এমন সময কোথা থেকে এক পাহাড়ী তাঁর পাশে এসে বসল। স্নেহপূর্ণস্বরে বলল, "এ লালি, কাঁহা যাওগী তুম।" বড প্রসন্নমধুব মূর্তি তাব, গৌবীমা উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। জানালেন, কেদাব দর্শনে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথ হাবিযে ফেলেছেন।

"আও লালি, আও মেবে সাথ," বলে সাগ্রহে গৌবীমাকে নিযে একটা পাকদণ্ডীব পথে এগিযে যায সেই বৃদ্ধা। তাবপব অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দেয একটা সোজা বনপথ। এই পথ ধবে অল্পকিছু কাল হাঁটবাব পব গৌবীমাব নযনসমক্ষে দেখা দিল কেদাবনাথজীব পবিত্র মন্দিব। এত কাছে থেকেও এ দুদিন তিনি কেবলি ঘুবে বেড়িযেছেন এবই আশেপাশে। বৃদ্ধাটি যেন দৈব প্রেবিতা, হঠাৎ

কোথা থেকে তার আবির্ভাব ঘটল, কত সহজেই গৌরীমাকে তিনি পৌঁছে দিলেন মন্দিরের সম্মুখে। কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য বৃদ্ধার দিকে নয়ন ফিরিয়েছেন, কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড! নিমেষের মধ্যে কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সে-বার হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, পরিব্রাজিকা গৌরীমা পাহাড় থেকে নেমে সেই দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে, চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে রাত্রির ঘন অন্ধকার। অরণ্যময় অঞ্চলে গৌরীমা পথ হারিয়ে ফেললেন। দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে কোথায় কোন্ দূর অঞ্চলে গিয়ে পড়বেন কে জানে? দুশ্চিন্তায় মন বড় ভারাক্রান্ত। এমন সময়ে জঙ্গলের পথে শুনতে পেলেন অশ্বখুরের ধ্বনি। হাতে মশাল নিয়ে, যোদ্ধাবেশধারী এক অশ্বারোহী তাঁর দিকে ছুটে আসছে। গৌরীমা থমকে দাঁড়ালেন, ভীত হয়ে ভাবতে লাগলেন, তবে কি ডাকাতের হাতে পড়তে যাচ্ছেন?

লোকটি নিকটে এলে তার সৌম্য দর্শন মূর্তি দেখে ভয় দূর হল। অশ্বারোহী পুরুষ আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই।" হস্ত প্রসারণ ক'রে বললেন, "ঐ দিকের পথে চলতে থাকো, কাছেই বসতি পাবে।"

অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যে লোকালয়ে পৌঁছে গেলেন গৌরীমা। এখানে কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে ইষ্টদেব দামোদরের ভোগ লাগিয়ে, আবার পা বাড়ালেন হরিদ্বারের দিকে।

পরিব্রাজন ও তীর্থদর্শনের সময় কত সময় তাঁকে একাকিনী পথ চলতে হয়েছে, কত সময়ে সাপ বাঘ ও হিংস্র মানুষের সম্মুখে পড়েছেন। কিন্তু সর্বত্যাগিনী এই সাধিকাকে সব সময়ে রক্ষা করেছেন তাঁর ইষ্টদেব, সতত প্রসারিত ক'রে রেখেছেন তাঁর কল্যাণময় করপল্লব।

বৃন্দাবন, পুষ্কর প্রভৃতি স্থান পরিব্রাজন ক'রে গৌরীমা দ্বারকায় উপস্থিত হন। এখানে ঠাকুর রণছোড়জী কৃপা ক'রে অলৌকিক রূপে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন।

বিগ্রহ দর্শনের পর নাটমন্দিরে বসে গৌরীমা একান্ত মনে জপ ক'রে চলেছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল গর্ভমন্দিরের দিকে। দেখলেন, শ্যামকান্তি, প্রিয়দর্শন, একটি বালক সেখানে বসে পরমানন্দে নানা মিষ্টদ্রব্য ভোজন করছে। অতঃপর এই বালক ভোজন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, আচমন না ক'রেই মন্দিরের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে আর মাঝে মাঝে গৌরীমার দিকে করে দৃষ্টিপাত।

গৌরীমা প্রথমে ভাবলেন, বোধকরি কোনো পুরোহিতের বালক মন্দিরে বসে ভোজন করছে, আর এদেশে হয়তো আচমনের তেমন কড়াকড়ি নেই। কিন্তু একটু পরেই চমকে উঠলেন এক অলৌকিক দৃশ্য দেখে। দেখলেন, সারা গর্ভগৃহটি দিব্য আলোক-ধারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মন্দিরের পুরোহিত সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসে ঐ প্রিয়দর্শন বালককে আচমন করিয়ে দিলেন, আর সেও তৎক্ষণাৎ পরম আনন্দে উঠে গিয়ে উপবেশন করল প্রভু রণছোড়জীর রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে।

এ দর্শন যে স্বয়ং প্রভুরই দিব্যদর্শন। ইষ্টদেব নওল কিশোরই যে অসীম কৃপাভরে আবির্ভূত হয়েছেন সাধিকা গৌরীমার নয়ন-সমক্ষে। সারা দেহ তাঁর থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে, নয়ন থেকে ঝরে পড়ে পুলকাশ্রু। তখনি মন্দিরের দ্বারে ছুটে গিয়ে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়েন ভূমিতলে, তাঁর আর্তি ও ক্রন্দনে চতুর্দিকের ভক্ত দর্শনার্থীরা অভিভূত হয়ে পড়ে।

মন্দিরের পুরোহিত আসল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। গৌরীমা কিছুটা শান্ত হবার পর তিনি সস্নেহ দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদুস্বরে বললেন, "মা, আমি বুঝতে পেরেছি। প্রভুজীর কৃপা মিলেছে, অতীন্দ্রিয় দর্শন লাভ ক'রে তুমি এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছো।"

প্রভাসতীর্থে উপনীত হয়ে গৌরীমার ভাবাবেশ আরো বর্ধিত হল। কৃষ্ণরসে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। এই সময়কার আবেগময় অবস্থার কথা তাঁর মুখে শুনে বর্ণনা দিয়েছেন মাতাজী দুর্গাপুরী :

"এই সময় গৌরীমা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। স্বপ্নে অথবা আভাসে-

ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন এমন কি হৃদয়ে দিব্যানন্দের অনুভূতিতেও তিনি আর পরিতুষ্ট নহেন। মানুষ যেমন নিজের প্রিয়জনকে সম্মুখে দাঁড়াইয়া চর্মচক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে পায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সেইভাবে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিযাছেন। কোথায় গেলে কি করিয়া ডাকিলে বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর বংশীধারীকে পাওয়া যায়—অহোরাত্র কেবল এই এক চিন্তা। অন্তরের আহ্বানে আবার তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

"অন্তরের তীব্র বিরহবেদনা লইয়া কখনও সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনাহারে একাসনে কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন; কখনও বা বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে, যমুনার তীরে তীরে, খুঁজিযা বেড়াইতেন—কোথায় শ্যামল বংশীধারী। আবার, কখনও নির্জন স্থানে গিয়া অভিমানী শিশুর মতো ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেন—ঠাকুর, তোমারি জন্যে আমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। একটিবার প্রাণভরে দেখা দাও।"

প্রাণপ্রভু মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাণভরে পাচ্ছেন না, প্রভু স্থায়িভাবে অটল মহিমায় বিরাজ করছেন না তাঁর অন্তর্জীবনে, এ-দুঃখ রাখবার ঠাঁই নেই গৌরীমার। আকুতি আর ক্রন্দন চলতে থাকে অবিরাম। একদিন তীব্র অভিমান ভরে ললিতাকুণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সংকল্প করেছেন, এই পবিত্র কুণ্ডনীরেই দিবেন সেদিন জীবন বিসর্জন। কিন্তু প্রাণপ্রভু তাঁর সেদিনকার ঐ সংকল্পে বাধা দিলেন। গভীর রাতে জলে ঝাঁপ দিতে এসে, বাহ্যচৈতন্য হারিয়ে, গৌরীমা লুটিয়ে পড়লেন ললিতাকুণ্ডের তীরে।

পরের দিন তাঁর অচেতন দেহের চারদিকে জমে উঠল ব্রজনারীদের ভিড়। এই ব্রজনারীরা সাধিকা গৌরীমাকে চিনতেন, তাঁদের অনেকে গভীরভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। অতঃপর তাঁদের সেবা পরিচর্যায় তিনি সুস্থ হযে উঠলেন। উত্তরকালে এই ব্রজনারীদের প্রসঙ্গ উঠলেই গৌরীমা তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হযে উঠতেন।

গৌবীমাব এক দূব সম্পর্কিত খুল্লতাত বৃন্দাবনে বাস কবতেন, হঠাৎ একদিন গৌবীমাকে চিনে ফেললেন তিনি এবং তাঁব মাধ্যমে কলকাতাব আত্মীয়বা গৌবীমাব সংবাদ জ্ঞাত হন। অতঃপব তাঁদেব সনির্বন্ধ অনুরোধে গৌবীমা কিছুদিনের জন্য কলকাতায় আগমন করেন। বহুদিন পবে হাবানো কন্যার দর্শন পেযে জননী গিরিবালা দেবী আনন্দে আত্মহাবা হযে যান।

এ সময়ে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবকে দর্শনেব জন্য গৌবীমা উতলা হয়ে ওঠেন। শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হবার পর মন তাঁব দিব্য আনন্দে ভবপুর হযে ওঠে।

মন্দিরে বিবাজিত দারুব্রহ্মেব দিকে নির্নিমেষে তিনি তাকিযে থাকতেন, অপূর্ব ভাবাবেশে উদ্বেল হয়ে উঠতো সাবা দেহ মন প্রাণ। গৌবীমা বলতেন, তাঁব পতি হচ্ছেন নদীয়া-বল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ, আব ইষ্টদেব শ্রীদামোদব। এই, দামোদবেব দারুব্রহ্ম মূর্তিকে বৎসবেব পর বৎসর শ্রীগৌবাঙ্গ দর্শন কবতেন, আর মহাভাবের উত্তাল তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো তাঁর সমগ্র সত্তায়, সহস্র সহস্র ভক্তেব হৃদযে উঠতো তাঁব অনুবণন। সেই স্মৃতি জেগে উঠতো গৌবীমার অন্তবে, প্রতিদিন শ্রীজগন্নাথেব দর্শনেব সময ভাবাবিষ্ট হযে পড়তেন, দিন শেষে সুস্থ ও স্বাভাবিক হযে তবে স্বগৃহে ফিবে আসতেন।

পুবীধামে থাকাব সময় সিদ্ধ মহাত্মা বাসুদেব বাবাজীব সহিত গৌরীমাব পবিচয ঘটে এবং এই পরিচয় ক্রমে পবিণত হয অন্তরঙ্গতায়।

এই মহাত্মাব মুখ থেকে গৌরীমাব সাধন-মাহাত্ম্যের কথা শুনে উডিষ্যাব বহু ভক্ত তাঁব সান্নিধ্যে আসেন। ভক্তপ্রবব বাধামোহন বসুব সঙ্গে এ সময়ে গৌরীমাব ঘনিষ্ঠতা হয। বাধামোহন বাগ-বাজাবেব জমিদাব, উডিষ্যাব কোঠাব অঞ্চলে তাঁব জমিদারীব কিযদংশ অবস্থিত ছিল। তাঁব ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হযে গৌবীমা কোঠাবেব কৃষ্ণমন্দিবে এবং তাঁব বৃন্দাবনস্থিত কালাবাবুব কুঞ্জে কিছুদিন অবস্থান কবেছিলেন। বাধামোহনেব পুত্র হচ্ছেন বলবাম

বন্ধু, রামকৃষ্ণের স্নেহধন্য এই ভক্তেরই আগ্রহের ফলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন গৌরীমা। বহুদিনের হারানো গুরুদেবের সান্নিধ্য ও পরমাশ্রয় লাভ ক'রে সাধনজীবন তাঁর নূতন ক'রে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, ভক্তিপ্রেম ও প্রশান্তিতে তিনি ভরপুর হয়ে ওঠেন।

গুরুর সহিত দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর গৌরীমার জীবনতরী আবার এসে ভিড়ল তাঁর চরণতলে। দৃশ্যত ভক্তপ্রবর বলরামের সনির্বন্ধ অনুরোধেই গৌরীমাকে নিয়ে এসেছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্য সান্নিধ্যে। কিন্তু আসলে ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছা আর তাঁর অলৌকিক নির্দেশ ও কার্যক্রমেই সম্ভব ক'রে তুলেছিল গুরু ও শিষ্যের এই পুনর্মিলন।

ঠাকুরের প্রথম দিনের দর্শন ঘটিয়ে দিল গৌরীমার অন্তর্লোকে এক বিস্ময়কর রূপান্তর। সাধনজীবনের ভিত্তিভূমি দৃঢ় হয়ে ওঠে, লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে স্পষ্টতর ও প্রোজ্জ্বল। মন প্রাণ দিয়ে হারিয়ে পাওয়া গুরুকে, জীবনকাণ্ডারীকে, আঁকড়ে ধরেন তিনি। এবার থেকে একান্তভাবে গুরু রামকৃষ্ণের চরণেই করেন তিনি আত্মসমর্পণ, আর গুরুও অপার স্নেহমমতায় করেন তাঁর সাধনজীবনের নিয়ন্ত্রণ, প্রকাশ্যে ও প্রচ্ছন্নে থেকে সদাই যুগিয়ে চলেন তাঁর পরম পথের পাথেয়।

পুনর্মিলনের পরের দিন। অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান সেরে গৌরীমা উপনীত হন দক্ষিণেশ্বরে। অন্তরে তাঁর সংকল্প, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাবেন, দক্ষিণেশ্বরে থেকে তাঁর চরণসেবার অধিকারটি যেন তিনি প্রাপ্ত হন।

কৃপাময় ঠাকুর কিন্তু আগে থেকেই বাগানের ফটকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখখানি দিব্য আনন্দে ঝলমল। সোৎসাহে বলে উঠলেন, "এসে গিয়েছিস্। বেশ বেশ। তোর কথাই ভাবছিলুম।"

প্রণাম নিবেদন ক'রে গৌরীমা অকপটে বলে গেলেন তাঁর প্রাণের

কথা, "ইষ্টদেব দামোদরকে নিযেই কেটেছে এতকাল। তাঁর সেবা উপলক্ষ ক'বেই বেঁচে আছি। কিন্তু ঠাকুব, তুমি যে তাঁবই আড়ালে লুকিয়ে ছিলে তা কে জানতো? দামোদরেব সিংহাসনে তোমাব কাঁচা পা দুখানি দেখে তবে তো বুঝলাম আসল কথাটি। কিন্তু এতদিন এমন লুকিযে ছিলে কেন, বলতো?"

"নইলে এত সাধনভজন, এত কঠোব তপস্যা, তোব কি ক'বে হতো?" সহাস্যে উত্তর দেন শ্রীবামকৃষ্ণ।

এবার গৌবীমাকে নিয়ে ঠাকুর উপস্থিত হলেন নহবত ঘবে। লোকচক্ষুব আড়ালে থেকে, সেখানে অবস্থান ক'বে পত্নী সারদামণি একান্ত নিষ্ঠায় তাঁব সেবা পরিচর্যা ক'বে চলেছেন। দোবগোড়ায গিযে ডেকে বললেন, "ওগো ব্রহ্মমযী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও, সেই সঙ্গিনী এবার এল।"

সারদামণি ছিলেন গ্রাম্যবধূ, লজ্জাশীলা এবং অন্তবালবাসিনী। ঠাকুরের পুরুষ ভক্তেব সংখ্যাই তখন বেশী, তাদেব সঙ্গে তিনি খুব কম কথাই বলতেন। গৌবীমাব আগমনে তাঁর নিঃসঙ্গত্ব অনেকাংশে কাটল। গুরু ও গুরুপত্নী উভয়েব প্রতিই গৌবীমার প্রবল অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, তিনিও সাবদামণিব সঙ্গ পেযে ধন্য হযে গেলেন।

সাবদামণি যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে অন্যত্র যেতেন গৌরীমা তখন অবস্থান কবতেন বাগবাজাবে বলবাম ভবনে। কিন্তু যেখানেই থাকুন, সারা মন তাঁব পড়ে থাকতো ঠাকুব বামকৃষ্ণেব দিকে। এক-একদিন ভাবতন্ময়তায অধীব হযে এক একটা বিচিত্র কাণ্ড ক'বে বসতেন।

একদিন বসুভবনে বসে আহাবেব সময ঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল। আচমন না ক'বেই ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে গেলেন দক্ষিণেশ্ববে। ঠাকুবকে প্রণাম ক'বে একপাশে বসতে যাবেন, তখন স্মবণ হল, আহাবেব পব হাত মুখ তো ধোযা হযনি! লজ্জিতা হযে তখনি ছুটে গেলেন গঙ্গাব ধাবে।

একৈক নিষ্ঠায়, ভাবেব গাঢ়তায, আধ্যাত্মিক আনন্দেব উচ্ছলতায গৌরীমা ছিলেন অনন্যা। নবীন ও প্রবীণ, ঠাকুরের সব ভক্তেবাই তাঁকে একটা বিশেষ সম্ভ্রমেব চোখে দেখতেন। এ সময়কাব কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেবক বামলাল, চট্টোপাধ্যায় বলতেন গৌরী দিদিমণি ছিলেন ঠাকুরের প্রিয় শিষ্যা, এঁর প্রতি ঠাকুবেব বিশেষ স্নেহ ও কৃপা ছিল। ঠাকুবেব সেবায় ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, নানা উপাদেয় খাবার ঠাকুরেব জন্য তৈবি ক'বে আনতেন। আবাব নহবতে বসে মধুর কণ্ঠে ভক্তিবসের গান গেযে ঠাকুবকে তিনি কত আনন্দ দিতেন। এক-একদিন ঠাকুর তাঁব মুখেব গান ও কীর্তন শুনে সমাধিস্থ হযে যেতেন, আমবা সে দেবদুর্লভ দৃশ্য প্রত্যক্ষ কবতুম। ঠাকুব বলতেন, "গৌবী বড় ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী, মহাতপস্বিনী।"

গৌবীমাব প্রতি ঠাকুবেব কৃপাব নানা কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তেবা বর্ণনা করেছেন। মাঝে মাঝে তাব মনেব ভাব ও সংকল্প অনুযায়ী ঠাকুব বিভাবিত হয়ে উঠতেন, বহুবিচিত্র ভাবতবঙ্গ তাঁর ভেতবে উদ্বেলিত হযে উঠতো।

একদিন গৌবীমা মনে মনে ভাবলেন, 'প্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁর পরিকবদেব নিয়ে কত ভাববৈচিত্র্য দেখিযেছেন, কত লীলাবিলাস কবেছেন। তাঁব দর্শনে ও স্পর্শনে ভক্ত ও দর্শনার্থীদেব মধ্যেও প্রেমেব জোয়াব উথলে উঠতো। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! এ ধরনের দৃশ্য কি ঠাকুবেব লীলায দেখা যাবে না?' শ্রীবামকৃষ্ণ সেদিন ভক্ত সেবকদল পবিবৃত হযে বসে আছেন। বেলা অনেক হযেছে। এবাব ঠাকুবকে খাবাব দিতে হবে। অন্ন ব্যঞ্জন তৈবি ক'বে থালায সাজিযে, গৌবীমা ঠাকুরকে খেতে দিতে এসেছেন। হঠাৎ ঘবে ঢুকতেই এক অপূর্ব প্রেমাবেশে তিনি আবিষ্ট হয়ে পড়লেন, দুই নয়ন বেযে অঝোরে ঝবতে লাগল প্রেমাশ্রুব ধাবা।

ঠাকুব সবেমাত্র দু-এক গ্রাস মুখে দিযে খাওযা শুরু করেছেন।

গৌরীমাব আকস্মিক ভাবাবেশ -দর্শনে তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রেমপ্রমত্ত হয়ে উঠলেন। খাবাবেব থালা সম্মুখে পড়ে রইল, উভয় হস্তে ফুটে উঠল মুদ্রা, গণ্ড বেয়ে দবদর ধারে নামল অশ্রুব ঢল। চাবপাশে যে ভক্তেরা উপবিষ্ট রয়েছেন তাদের ভেতবও ছড়িয়ে পড়ল এই প্রেমাবেশ। দিব্য আনন্দে সবাই বিহ্বল মাতোয়ারা।

কিছুক্ষণ পরে .শ্রীবামকৃষ্ণেব বাহ্যজ্ঞান কিবে এল, একে একে সবাইকে স্পর্শ ক'রে তাদের ফিরিয়ে আনলেন স্বাভাবিক অবস্থায়।

আব একদিন একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল গৌরীমার অন্তবে। ঠাকুরেব কীর্তনানন্দ, ভাবাবেশ, আনন্দবঙ্গ কতই তো দেখেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যেমন ভাবপ্রমত্ত হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারাতেন, খুলায় লুটিয়ে পড়ে হতেন সংজ্ঞাহীন, ঠাকুরকে তেমনি হতে একদিনও দেখেন নি। এই ভাববৈবশ্য দর্শনেব জন্য গৌবীমা বড় কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

সেদিন কলকাতা থেকে রাম দত্ত ও অন্যান্য প্রবীণ ভক্তেরা সবাই এসেছেন। জোর ভগবৎ প্রসঙ্গ চলেছে। হঠাৎ ঠাকুর দিব্য উদ্দীপনায় উঠে দাঁড়ালেন, প্রেমাবেশে নৃত্য করতে করতে হয়ে গেলেন বেসামাল। কেউ তাঁর দেহটি ধরবার আগেই সবেগে পতিত হলেন ভূমিতলে। সঙ্গে সঙ্গে হলেন সংবিৎহারা।

গৌরীমা কিন্তু এই দৃশ্য দেখে বড় মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। ক্লিষ্টচিত্তে বার বার ভাবছেন, 'কেন আমার এমন ছেলেমানুষি ও দুর্বুদ্ধি হল, ঠাকুবেব মহাভাবপ্রমত্ত অবস্থা দেখতে চাইলাম। কোমল অঙ্গে কি দারুণ আঘাতই না লেগেছে। তিনি নিঃসন্দেহ যে, অন্তর্যামী ঠাকুব আজকেব এই কাজটি করেছেন শুধু তাঁব প্রিয় গৌরদাসীব মনের গোপন সাধ পূবণের জন্য। ছি-ছি-ছি এ তিনি কি কবেছেন ?

মণ্ডলীর ভেতব ইতিমধ্যে গুঞ্জন উঠেছে। উপস্থিত সকলেই বলাবলি কবছেন, এমন অদ্ভুত কাণ্ড তো কখনো ঘটে নি। ঠাকুব

ভাবপ্রমত্ত হয়ে অনেকবার অনেক কিছুই করেছেন, কিন্তু জ্ঞানহারা হয়ে ভূতলে আছড়ে পড়ার ঘটনা এই প্রথম।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু সুস্থ হলে, প্রবীণ ভক্ত রাম দত্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন এই রহস্যের কথা। মুচকি হেসে ঠাকুর দৃষ্টিপাত করলেন গৌরীমার দিকে।

ভক্তপ্রবর রাম দত্ত এবার সরাসরি ধরে পড়লেন গৌরীমাকে। এই বিচিত্র ঘটনার তাৎপর্য তিনি নিশ্চয় জানেন, এর রহস্য তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

গৌরীমা এবার খুলে বললেন নিজের গোপন ইচ্ছার কথা, সেই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়েই ঠাকুর ঘটিয়েছেন এই বিপত্তি। একথা বলতে গিয়ে দুঃখে, অভিমানে ও কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি।

কলকাতার কয়েকটি পরিচিতা মহিলা ভক্তের সাথে গৌরীমা সেদিন নৌকাযোগে খড়দহে যাচ্ছেন শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দর্শন করতে। দক্ষিণেশ্বর ঘাটে পৌঁছুলে নৌকা থেকে নেমে পড়লেন, সঙ্গিনীদের বলে গেলেন, ঠাকুরকে একটিবার দর্শন ক'রে তখনই তিনি ফিরে আসছেন।

ঠাকুর তখন দিব্যভাবে বিভোর। হাতের কাছে পড়ে আছে ভক্তবীর প্রহ্লাদের একটি প্রাচীন চিত্র। সেই দেখেই ভক্তিপ্রেম রসের উদ্দীপনা হয়েছে। অর্ধনিমীলিত নয়নে স্থাণুবৎ বসে আছেন, কোনো বাহ্যজ্ঞান নেই! কিছুক্ষণ পরে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন, পিপাসার্ত হয়ে গৌরীমার কাছে চাইলেন একটু পানীয় জল। আরও সুস্থ হবার পর বলে উঠলেন, "তুই যে নৌকায় মেয়েদের রেখে এলি, ওরা তো এতক্ষণ ছট্‌ফট্ করছে।"

তাই তো সবাইকে এতক্ষণ এভাবে ঘাটে বসিয়ে রাখা তো ঠিক হয় নি, কত কি যেন ওরা ভাব্‌ছে। গৌরীমা সবাইকে নিয়ে এলেন ঠাকুরকে দর্শন করাতে। এবার কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয় কথাবার্তা হল,

বৃন্দাবনে তপস্যা করিতেন, তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধন দর্শনে একটি ব্রজবালক তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আরে মায়ী ক্যায়া তু দিনভব ভজনসাধন করতী হ্যায় ? সবেরে উঠ্‌কে একদমসে বোল দেনা—রাধেশ্যাম। —ব্যাস্, হো গেয়া।"

"গৌরীমা নিজেও বলতেন, 'সত্যিকারেব সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যদি ডাকার মত ডাকা যায় তবে তো এক ডাকেই হয। কিন্তু মনকে সেভাবে প্রস্তুত করতে হলে অভ্যাস যোগ অর্থাৎ তপস্যার প্রয়োজন।'

"তিনি নিজে কঠোর তপস্যা করিয়া আনন্দ পাইতেন। বৃদ্ধ-বয়সেও তিনি প্রতিদিন লক্ষ নামজপ করিতেন। দিনের বেলায় কর্মকোলাহলে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে গভীর নিশীথে উঠিয়া জপ করিতেন।"

কৃচ্ছ্রব্রত ও কঠোব তপস্যার মধ্য দিয়া দীর্ঘদিন নিজেকে চালিত করেছেন গৌবীমা, কিন্তু এই সাধন-কঠোরতার ভিতরকার স্তবে নিজের প্রাণমনকে ক'বে রেখেছেন প্রেমভক্তির রসে রসায়িত। রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ-জায়া, সারদামণির শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিযেছেন তিনি, আর দিনের পর দিন এই কৃপাসিদ্ধা সাধিকা এগিয়ে চলেছেন তাঁব ইষ্টদেব দামোদরজীর দিব্যোজ্জ্বল আনন্দঘন পরমসত্তাব দিকে।

দৃপ্ততেজ, কঠোর ব্রহ্মচর্যধৃত জীবন ও ঋজু ব্যক্তিত্ব, এসব ছিল গৌবীমার বাইরেকার রূপ। ভিতরে ছিল তাঁর প্রেমপাগলিনী সাধিকার পরম রসানুভূতি। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই স্বরূপটি ভালোভাবেই জানতেন, তাই গৌরীমা সম্পর্কে নিজের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের বলতেন, "গৌরী হচ্ছে কৃপাসিদ্ধা গোপী, ব্রজের মেয়ে, গোপীভাবের সাধনায় বুঁদ হয়ে থাকবে।"

গৌরীমার নিত্যকার পূজাব বিগ্রহ, ইষ্ট-দামোদব-শিলা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত আদরেব বস্তু। দামোদবকে বুকে ও মাথায় বেখে ঠাকুব আদব করতেন, দরদব ধাবে তাঁর দু'নযনে ঝ'বে পড়তো পুলকাশ্রু। ভাবের আবেগ প্রশমিত হলে বলতেন, "তোর এটি

হচ্ছেন সিদ্ধ শালগ্রাম, আমায় যিনি সাধনভজন শিখিয়েছিলেন, তাঁরও এরকম একটি জাগ্রত পবিত্র শিলা ছিল।"

স্বামী সারদানন্দ বলতেন, "ঠাকুরের মেয়ে শিষ্যাদের মধ্যে গৌরীমা-ই সন্ন্যাসিনী এবং প্রধানা।" এই স্নেহধন্যা শিষ্যাটির প্রশংসায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সদাই ছিলেন পঞ্চমুখ। সুযোগ পেলেই গৌরীদাসীর গৌরব বাড়ানোর জন্য, তাঁর ভক্তি প্রেমের মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য, উৎসাহী হয়ে পড়তেন। এক একদিন গৌরীমা অভিমান ভরে অনুযোগ করতেন ঠাকুরকে, "তুমি অমন ক'রে আমার কথা ও প্রশংসা যেখানে সেখানে করতে পারবে না।"

কেদার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের এক প্রবীণ ভক্ত সেদিন মিঃ উইলিয়াম্‌স নামক এক পরিচিত ব্যক্তিকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এসেছেন ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য। এই ইংরেজ ভদ্রলোকটি অধ্যাত্মরস পিপাসু। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। ঠাকুর একদিন বললেন, তুমি বলরাম বসুর বাড়িতে যেয়ো। সেখানে গৌরীদাসী নামে এক তপস্বিনী থাকে, তাকে দেখলে পুণ্য হয়।"

মিঃ উইলিয়াম্‌স বাগবাজারে বসুভবনে গিয়ে গৌরীমাকে দর্শন করেন। গৌরকান্তি, দিব্যলাবণ্যময়ী এই মহীয়সী সাধিকার দর্শন পাওয়া মাত্র তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। মুগ্ধনেত্রে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বার বার বলতে থাকেন, "মাদার, মেরী, মাদার মেরী।" তারপর ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন করেন গৌরীমার উদ্দেশে।

গৌরীমাও এই স্বভাবভক্ত বিদেশী দর্শনার্থীকে স্নেহভরে আপ্যায়িত করলেন, ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করলেন তাঁকে। যতক্ষণ সেখানে ছিলেন উইলিয়াম্‌স গৌরীমার কৃপাধন্য হয়েছেন বলে বার বার প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কৃতজ্ঞতা।

দক্ষিণেশ্বরে তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে এক আনন্দের হাট। একের পর এক ভক্ত এবং দর্শনার্থীরা আসছেন,

তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনছেন মধুময় ভগবৎপ্রসঙ্গ। ত্যাগী ভক্তেরাও একে একে এসে জড়ো হয়েছেন ঠাকুরের আশে পাশে।

একদিন একলাটি নিজ কক্ষের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে, বাহুদুটি আন্দোলিত ক'রে বার বার বলছেন, "মায়া আয়, মায়া আয়।" গৌরীমা কখন নিঃশব্দে এসে ঠাকুরের পেছনে দাঁড়িয়েছেন, কৌতূহলভরে দেখছেন তাঁর কাণ্ড।

"বলি ব্যাপারটা কি? বড় যে ব্যস্ত হয়ে মায়াকে ডাকা হচ্ছে?" তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন গৌরীমা।

ধরা পড়ে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তাঁর গৌরীদাসীও বড় নাছোড়, সহজে সে তাঁকে অব্যাহতি দেবে না। ঠাকুর সহাস্যে জবাব-দিহি করেন, "আসল কথাটা কি জানিস, মনটা আজকাল সব সময়ে চড়েই থাকে ওপরের দিকে। চেষ্টা ক'রেও নামিয়ে আনতে পারিনে, তাই তো মায়াকে ডাকছি। মায়ায় জড়িয়ে, ছেলেদের নিয়ে যাতে আরো কিছুদিন ভুলে থাকা যায়।"

'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' বীজটি ঠাকুর প্রচ্ছন্নভাবে রোপণ করে-ছিলেন তাঁর ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে, ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ মঠ ও মণ্ডলীর পত্তন করেছিলেন ধীরে ধীরে। এই জীবসেবা ও নিষ্কাম যোগের তত্ত্ব প্রিয় ও প্রধান সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরীদাসীর ভেতরেও করেছিলেন সঞ্চারিত। প্রায়ই বললেন তাঁকে, "ছাখ্ মায়েরা (মেয়ে ভক্তেরা) বড় কষ্টে থাকে। ঈশ্বরের কথা, নামগান কখন শুনবে, কোথায় শুনবে? তুই সদাই ওদের কাছে যাবি, ঈশ্বরের কথা বলবি কেত্তন শোনাবি, ওদের উদ্দীপন হবে।"

দক্ষিণেশ্বরে নহবত ঘরের কাছে ঠাকুর সেদিন একটি বকুলগাছের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটি জলের পাত্র। গৌরীমা নিকটে বসে ফুল কুড়াচ্ছেন। ঠাকুর পাত্র থেকে মাটিতে জল ঢেলে দিয়ে বলেন, "ছাখ্ গৌরী, আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।"

"এখানে কাদা কোথায় যে আমি চট্‌কাবো। সব যে কাঁকর।" সবিস্ময়ে উত্তর দেন গৌরীমা।

"আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি। ওবে এদেশের মেয়েদের বড় দুঃখ, তোকে তাদেব ভেতবে কাজ কবতে হবে।"

স্তব্ধ হয়ে বসে বইলেন গৌবীমা। ভাবতে লাগলেন, সত্যিই তো, সহস্র সহস্র বৎসব ধরে অজ্ঞতা আব কুসংস্কারেব জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে এদেশের নারীদেব জীবনে। এ জঞ্জাল অপসাবণ না করলে চৈতন্যের আলোকধাবা কখনো প্রবেশ করবে না তাদেব মধ্যে, খুঁজে পাবে না মুক্তিপথেব সন্ধান।

সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে প্রবল দুশ্চিন্তা, এ যে এক বিবাট সমস্যা, কে দাঁড়াবে এর সম্মুখে, কে করবে এর সমাধান? এ গুরুদায়িত্ব বহনের সামর্থ্য তাঁর কোথায়?

কয়েকদিন পরে ঠাকুরকে নিভৃতে জানালেন, "ভেবে দেখলাম, সংসারী লোকেব সাথে আমার পোষাবে না। হৈ-হৈ আমাব ধাতে সয না। ববং আমার সাথে কতগুলো মেযে দাও, আমি তাদেব হিমালয়ে নিযে গিয়ে মানুষ ক'রে দিচ্ছি।"

এবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায বললেন ঠাকুব রামকৃষ্ণ. "না বে না। এই টাউনে বসেই তোকে কাজ কবতে হবে। এতকাল সাধনভজন অনেক হয়েছে, এবাব এ তপস্যাপূত জীবনটা মাযেদেব সেবায লাগবে। ওদেব বড় কষ্ট।"

গৌরীমার এ সমযকাব তেজোদৃপ্ত ভঙ্গী ও আকর্ষণীয ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শ্রীবামকৃষ্ণ মিশনেব প্রবীণ সাধুরা লিখেছেন[১], "গৌরীমাব ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধাবণ। উচ্চকোটি মহাপুরুষদেব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপনিবদ যা বলেছেন, সে বৈশিষ্ট্য গৌবীমার ভেতব দেখা যেত। চরিত্রেব দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা আব সংকল্পেব নিষ্ঠা তাঁর ভেতবে বিদ্যমান ছিল, পবিব্রাজন ও সাধনজীবনে বহুতব কঠিন অভিজ্ঞতাব ভেতর দিয়ে তাঁকে এগিযে যেতে হযেছিল, কিন্তু কোথাও কখনো

১ ডিসাইপল্‌স্ অব শ্রীবামকৃষ্ণ: অদ্বৈত আশ্রম

তিনি সংকল্প থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি অথবা সংশয়-জড়িত হন নি। ভয় কাকে বলে গৌবীমা তা কখনো জানতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি কোথাও উপস্থিত হওযা মাত্র চাবদিকে ছড়িযে পড়তো তাঁর শক্তিব প্রভাব, দুর্বল সংশয়ীদেব অন্তবে। তিনি জাগিযে তুলতেন আশা উৎসাহ ও সাহসেব উদ্দীপনা। গৌবীমার ভেতবে নেতিবাচক কিছু ছিল না, সবই ছিল ইতিবাচক—নিষ্ঠাভাব, দৃঢতা সাহস সহকাবে পবমপ্রাপ্তিব সাধনায এগিয়ে চলাই ছিল তাঁব বক্তব্যেব মূল কথা।

দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণেব শিষ্য ও ভক্তগোষ্ঠীব মধ্যে গৌরীমার বৈশিষ্ট্য অনেকেবই চোখে পডতো। তিনিই ঠাকুরেব প্রথম দীক্ষিতা সন্ন্যাসিনী শিষ্যা। ত্যাগ তিতিক্ষা, কঠোর সাধনা ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধিব দিক দিযেও তিনি ছিলেন অসামান্যা। বিশেব ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাবদামণি দেব-মানবেব প্রচারে গৌবীমা ছিলেন সদা উৎসাহিনী।

ভক্ত দর্শনার্থীদেব নিয়ে শ্রীবামকৃষ্ণেব কক্ষটি যখন অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ, ভজন-সংগীত ও হাস্য পবিহাসে মুখব হযে থাকতো, তখন দেবী সাবদামণি প্রাযশ থাকতেন লোকচক্ষুর অন্তবালে, নহবত ঘরে। এই সমযে গৌবীমা এসে প্রায়ই তাঁকে নিয়ে আনন্দ কবতেন, তাঁর মাহাত্ম্য খ্যাপন কবতেন বামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে। অন্তবঙ্গ সহচবী ও ভক্তপ্রধানা 'গৌবদাসী' ছিলেন সাবদামণিব এসময়কাব অনেক কিছু কাজের প্রধান সহাযিকা।

ঠাকুব বামকৃষ্ণেব কঠিন পীডাব সময় গৌবীমা আর একবাব বৃন্দাবনে চলে যান, নিকটস্থ এক নিভৃত স্থানে গিযে বত হন কঠোব তপস্যায। ঠাকুবেব মহাপ্রয়াণেব পূর্বে তাঁব নির্দেশ মতো, বৃন্দাবনে গৌবীমাকে সংবাদ পাঠানো হল। কিন্তু তিনি তখন কালাবাবুব কুঞ্জ ছেড়ে গোপন এক স্থানে বসে সাধনভজনে ডুবে আছেন, এ সংবাদ তাঁব কাছে পৌছোয নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তিম শয্যায় শুয়ে একদিন সখেদে বলেছিলেন, সারদামণির কাছে, "এতদিন কাছে থেকে গৌরী শেষটায় দেখতে পেলে না। আমার ভেতরটা যেন বিল্লীতে আঁচড়াচ্ছে।"

অগণিত ভক্তকে শোকসাগরে নিমগ্ন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ নবলীলা সংবরণ করলেন। লোকাচার অনুযায়ী সারদামণি হাতের সোনার বালা জোড়া খুলতে যাবেন এমন সময়ে শোনা গেল ঠাকুরের দৈব-বাণী, "ওগো, আমি কি মরেছি যে তুমি বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিজ্ঞেস ক'রো, সে বৈষ্ণবতন্ত্র জানে।"

নিভৃত তপস্যাস্থল থেকে বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে ফিরে এলেন গৌরীমা। এসেই শুনলেন মর্মভেদী সংবাদ, তাঁর পরমারাধ্য গুরু, পিতৃপ্রতিম ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরদেহ ত্যাগ করেছেন।

দুঃসহ শোকে অধীর হয়ে গৌরীমা ক্রন্দন করতে লাগলেন। এই সঙ্গে অভিমানও জেগে উঠল, তপস্যার জন্য বৃন্দাবনে যখন তিনি এলেন, সব জেনে শুনেও ঠাকুর কেন বাধা দিলেন না।

ঠাকুর ধরাধামে নেই, গৌরীমা যে তাঁর পরমাশ্রয় হারিয়ে ফেলেছেন, সমস্ত কিছু অবলম্বন যেন ধসে পড়ছে। অভিমানভরে ভাবলেন, 'এ ছার দেহ আর রাখবো না, ভৃগুপাতে দেবো বিসর্জন।'

যমুনার ভাঙনের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ঝাঁপ দেবেন বলে, হঠাৎ ঘটল সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, বেদনার্ত কণ্ঠে ঠাকুর বললেন, "তুই মরবি না কি?"

অবাক বিস্ময়ে গৌরীমা তাকিয়ে রইলেন তাঁর জীবনপ্রভুর দিকে, ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম নিবেদন ক'রে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন অলৌকিক মূর্তি অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

গৌরীমা বুঝে নিলেন, তাঁর মৃত্যু-বরণ ঠাকুরের অভিপ্রেত নয়। হয়তো বেঁচে থেকে ঐশ্বরীয় কর্তব্য কিছু তাঁকে ক'রে যেতে হবে। প্রত্যাবর্তন করলেন কালাবাবুর কুঞ্জে।

ঠাকুরের অন্তর্ধান উপলক্ষে ভাণ্ডারা মহোৎসব করার ইচ্ছে জাগল

গৌবীমার মনে। কিন্তু তিনি সর্বত্যাগিনী তপস্বিনী। টাকা-কড়ি তো তাঁর কাছে কিছু নেই।

মনে মনে সংকল্প স্থির ক'রে উপস্থিত হলেন বৃন্দাবনের বাজার অঞ্চলে। দোকানদারদের ডেকে বললেন তাঁর অন্তবেব অভিলাষেব কথা। সাধুমার সাহায্যে অনেকেই এগিযে এল, সংগৃহীত হল প্রচুর ঘি মযদা। প্রাণভরে দবিদ্রনারায়ণেব ভোগ লাগালেন গৌরীমা।

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকান্তরের পর সাবদামণি বৃন্দাবনধামে উপনীত হযেছেন। এবাব গৌবীমার আস্তানা খুঁজে বার কবা হল। ঠাকুরের শেষেব দিনেব বর্ণনা শুনে কান্নায ভেঙে পড়লেন গৌরীমা। কিছুটা সুস্থ হলে সারদামণি বললেন, "হাতের বালা খুলতে নিষেধ ক'বে ঠাকুব বলেছিলেন, 'গৌরীকে জিজ্ঞেস ক'বো—সে বৈষ্ণবতন্ত্র জানে। এবার আমায সব খুলে বলো।

গৌবীমা স্পষ্ট ভাষায বলে দিলেন, 'ঠাকুব চিন্ময় পুরুষ, সর্বত্র সর্বভূতে বিরাজমান। তাঁব আবাব বিয়োগ হয়েছে কি গো? তবে কেন হাতের বালা খুলতে যাবে? তাছাড়া, তুমি হচ্ছো জগতের লক্ষ্মী, তুমি সধবাব বেশ ত্যাগ কবলে জগতের অকল্যাণ হবে।"

এবাব ব্যক্ত করলেন গৌবীমাকে প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণেব প্রচ্ছন্ন নির্দেশ। বললেন, "ঠাকুব বলেছেন, গৌরদাসীর জীবন জ্যান্ত জগদম্বাদেব সেবায লাগবে।"

সামান্য ছুটি কথা, কিন্তু এব তাৎপর্য সুগভীব। সাবদামণিব দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'বে গৌবীমা ভাবতে লাগলেন অন্তিম শয্যায় শাযিত ঠাকুবের এই বাণীব প্রকৃত মর্ম।

গৌরীমা তখন যমুনার বালুকা গোফায বসে প্রায় সারারাত্রি ধুনি জ্বালিযে সাধনভজন করেন। একদিন সারদামণি তাঁব সেই সাধন-

গোফায় উপস্থিত হন। দুর্গাপুরীজী তাঁর এ সময়কার একটি বর্ণনায় বলেছেন[১] :

রাত্রিকালে গুম্ফার মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে দুইজনে কথা বলিতে-ছিলেন, এমন সময়ে সেখানে দুইটি সাপ প্রবেশ করিল। শ্রীশ্রীমা এত নিকটে সাপ দেখিয়া ভীতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ও গৌরদাসী, কি হবে গো, দুটো সাপ যে!' গৌরীমা শান্তভাবে তাঁহাকে বলিলেন 'ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে ওরা। কিন্তু ভয় নেই মা, পেসাদ পেয়ে এক্ষুনি চলে যাবে।'

গৌরীমা অতঃপর এক কোণে দামোদরের খানিকটা প্রসাদ ঢালিয়া দিলেন। সাপ দুইটি তাহা নিঃশেষ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীমা এতক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া তাহাদের ব্যাপার দেখিতেছিলেন, তাহারা চলিয়া গেলে বলিলেন, 'কি সর্বনাশ! তুমি সাপ নিয়ে কি ক'রে থাক এখানে?'

মাতাঠাকুরাণী সেই রাত্রিতে গৌরীমার নিকট রহিলেন, পরদিবস তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। তদবধি মায়ের তীর্থ-বাস কালে গৌরীমা তাঁহার সঙ্গেই রহিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে প্রায় দশ বৎসর গৌরীমা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থে পরিব্রাজন ক'রে বেড়ান। এই সময়ে যখন যেখানে থাকতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্মৃতি তাঁর অন্তরে সদা জাগরূক থাকতো, তাঁর উদ্দেশে বলা ঠাকুরের অন্তিম সময়ের কথা জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবার কথা, বার বার আলোড়িত হতো তাঁর অন্তরে।

অবশেষে তিনি সংকল্প স্থির ক'রে ফেললেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃজাতির শিক্ষা ও সেবার জন্য ব্যারাকপুরে গঙ্গাতীরে স্থাপন করলেন এক আশ্রম। এই আশ্রমেরই পরিণত রূপ উত্তরকালের বাগবাজারস্থিত সারদেশ্বরী আশ্রম। গৌরীমার সন্ন্যাসিনী শিষ্যা

১ সারদা-রামকৃষ্ণ: সারদেশ্বরী আশ্রম

দুর্গাপুবীজী এবং অন্যান্য ভক্ত শিষ্যেবা এই আশ্রমটি গড়ে তুলেছেন নারী কল্যাণেব এক প্রাণকেন্দ্রৰূপে। এই আশ্রমের প্রতি বামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী সারদামণি এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ বামকৃষ্ণ তনয়দেব কল্যাণদৃষ্টি ছিল সদা প্রসাবিত।

এই আশ্রম নিযে সর্বত্যাগিনী গৌরীমাকে কম কষ্ট পেতে হয নি। কলকাতায় এটিকে নিয়ে আসবাব পবও কযেক বৎসব তাঁকে তীব্র অর্থাভাব সহ্য কবতে হয়েছে। একদিন ঘবে একমুষ্টি তণ্ডুল নাই। আশ্রমবাসিনী কুমাবীদের তবে কি অনাহাবে থাকতে হবে? অগত্যা ভিক্ষায বেবিযে পড়েন গৌরীমা।

সম্পূর্ণৰূপে অপবিচিত এক সম্ভ্রান্ত গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাড়িব কর্ত্রীর প্রশ্নের উত্তবে বললেন, "আমি ভিকিবী, মা, তোমরা কিছু ভিক্ষে দাও।"

মাথায ঝকঝকে লাল সিঁদুবেব ফোঁটা, হাতে এয়োস্ত্রীব শাঁখা অথচ পবনে বয়েছে তাঁব গৈরিক বসন। কর্ত্রী জিজ্ঞাসা কবেন,— "হ্যাঁগো বাছা, স্বামী কি কবেন?"

গৌরীমা প্রশান্ত স্বরে উত্তব দেন, "মা গো, স্বামী আমাব সন্ন্যাসী হযে গেছেন, তাই তো দেখছো না আমিও সন্ন্যাসী। তবে অনেকগুলি মেয়েকে খেতে দিতে হয়। আজ আমাব ঘবে খাবাব কিছুই নেই, তাই তোমাব কাছে ভিক্ষে কবতে এসেছি।"

মহিলাটি বড় দযার্দ্র হযে উঠলেন, কিছু চালডাল, তবিতবকারী তক্ষুনি এনে গৌবীমাকে দিযে দিলেন। সেইগুলি চাদরে বেঁধে তিনি রওনা হযে গেছেন, হঠাৎ তখন বাড়ির কর্ত্রী কিছুটা কৌতূহলী হযে উঠলেন। ভাবলেন, কে এই অদ্ভুত মেয়েটি? আসল ব্যাপাবটা তো অনুসন্ধান কবতে হচ্ছে। একটি ছেলেকে প্রেবণ কবলেন গৌবীমাব পিছু পিছু।

পুঁটুলিটি হাতে ক'বে গৌবীমা পদব্রজে তাঁব আশ্রমেব দিকে ফিবছেন। হঠাৎ পথে দেখা হযে গেল সংস্কৃত কলেজেব তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশযেব সঙ্গে।

গাড়ি করে তিনি কলকাতা যাচ্ছেন। গৌরীমাকে রাস্তায় দেখেই গাড়ি থেকে নেমে এসে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন এবং সসম্ভ্রমে গাড়িতে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিলেন তাঁর আশ্রমে।

সন্ধানী সেই ছেলেটি ইতিমধ্যে গোপনে গাড়ির পেছনে সহিসের সীটে উঠে বসেছে, পৌঁছে গিয়েছে আশ্রমে। সেখান থেকে গৌরীমার সকল কিছু পরিচয় সংগ্রহ ক'রে বাড়িতে সে ফিরে এল, সোৎসাহে গিন্নীমাকে জানালো সব কথা। সব শুনে মহিলাটি তো মহা লজ্জিত। দুই একদিন পরে নিজে এসে উপস্থিত হলেন আশ্রমে। গৌরীমাকে প্রণাম ক'রে বললেন, "মা, আমি আপনাকে সেদিন চিনতে পারি নি। সেজন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি, আমায় ক্ষমা করুন।"

গৌরীমা নানা ভাবে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, অতঃপর হৃদ্যতা জমে গেল তাঁর সঙ্গে। ঐ মহিলাটি এবং তার পরিবারের সবাই সেদিন থেকে হয়ে উঠলেন আশ্রমের উৎসাহী সমর্থক।

•

সে-বার বরিশালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা, প্রচ্ছন্ন সাধক, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী দত্ত গৌরীমাকে দর্শন করতে এসেছেন। ঘরে প্রবেশ ক'রেই অশ্বিনীবাবু ভক্তিসহকারে গৌরীমাকে প্রণাম ক'রে বললেন, "মা, কতকাল ধরে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু আসতে আসতে কত দেরি হয়ে গেল।"

গৌরীমা তাঁকে দেখে মহা আনন্দিত। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, "বাবা, তোমার ভক্তি ও সেবাধর্মের কথা শুনে অবধি আমারও তোমায় দেখবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল।"

ভক্তপ্রবর অশ্বিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন, তাঁর অমৃতোপম উপদেশ ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। আনন্দসহকারে গৌরীমাকে তাঁর দর্শনের কথা বিবৃত করেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ প্রভুর কথা এসে গেল। সর্বজীবের প্রতি, ভক্ত ও পাষণ্ড উভয়ের প্রতি, কি

অপাব ও অহেতুকী কৃপা তাঁদেব ছিল। পাপাচাবী মাধাইব কলসীব কানায় আহত হযেও নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমালিঙ্গন দিয়েছিলেন তাকে। দিব্য করুণাধাবায় পাষণ্ডী মাধাইকে পবিশুদ্ধ করেছিলেন তিনি, রূপান্তবিত করেছিলেন পবমবৈষ্ণবে। এই প্রেমলীলাব কাহিনী বলতে গিযে গৌবীমা উদ্দীপিতা হয়ে উঠলেন। বললেন, "যীশুখ্রীষ্টও জীবেব কল্যাণে প্রেম বিতরণ কবতে গিযে কত কষ্টই না সইলেন। আহা! শেষটায কিনা হতভাগা লোকগুলো ওঁকে পেরেক বিঁধেই মেবে ফেল্লেগা! উঃ কী ভীষণ!"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশে তিনি অধীর হযে উঠলেন। সাবা অঙ্গে দেখা দিল প্রবল কম্পন। তাবপব কম্পন থেমে গেলে তাঁর দেহটি পাথবেব মূর্তিব মতো নিশ্চল হযে গেল। দাঁড়িযে আছেন কিন্তু দেহে প্রাণেব কোনো লক্ষণ নেই। বাহ্যজ্ঞানহীন এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

ভক্ত ও দর্শনার্থীবা ভীত হয়ে উঠলেন। অশ্বিনীবাবু আশ্বাস দিযে বললেন, "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, পড়ে যাবাব উপক্রম হলেই মাকে ধবো।" সবাই স্তম্ভিত ও হতবাক্ হয়ে এই দিব্য ভাবাবেশ দর্শন কবছেন। অনেকক্ষণ পরে গৌবীমার সংবিৎ ফিবে এল।

অশ্বিনীকুমার গৌবীমাকে প্রণাম ক'বে বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, "মা, অল্পক্ষণ দর্শন ক'রে আশ মিটল না, আবাব একদিন আসবো।"

উচ্চকোটিব সাধু মহাত্মা ও ব্রহ্মবিদ্‌দেব দৃষ্টিতে গৌবীমা ছিলেন এক অসামান্যা সাধিকা। মহাযোগী ভোলাগিবি মহাবাজ গৌরীমাব সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই জ্ঞাপন কবতেন আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। ভক্তপ্রবব বীবেন্দ্রকুমাব বসু উভয়ের এইপ্রকাব সাক্ষাতেব বিবরণ দিযেছেন :

গ্রীষ্মে এক ছুটিব দিনে দুপুববেলায গৌবীমাব দর্শন কবতে যাচ্ছিলুম। পথে হরিদ্বাবেব শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের

সঙ্গে দেখা। মহারাজের সঙ্গে পূর্বেই আমার পরিচয় ছিল। হঠাৎ এখানে এভাবে তাঁকে দেখে আমার ভারী আশ্চর্যবোধ হল। আমি কাছে যেতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে বীরেনবাবু যে, এদিকে কোথায় যাচ্ছ ?'

আমি বললুম, 'এখানে এক সন্ন্যাসিনী মাতাজী থাকেন, গৌরীমায়ী, দর্শন করতে যাচ্ছি।'

মহারাজ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাঁর সঙ্গে যে আমার বহু বৎসর পূর্বে হিমালয়ে দেখা হয়েছিল, চল, আমিও যাবো।'

মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মাতাজীর আশ্রমে গেলুম। সংবাদ পাঠাতেই তিনি নিচে নেমে এলেন, বাইরের ঘরে। দু'জনের দেখা হতেই ভারী আনন্দ। বহুক্ষণ ধরে হরিদ্বারের এবং হিমালয়ের তপস্যাকালের অনেক পুরনো কথা হল।

মার আশ্রমের আদর্শ এবং সন্ন্যাসিনী গঠনের কথা শুনে গিরি মহারাজ ভারী আনন্দ প্রকাশ করলেন। মাঝে মাঝে আমাকে লক্ষ ক'রে বলতে লাগলেন, 'মাতাজী যে কি কঠোর তপস্যা করেছেন, তা এখন কলকাতার ঘরে বসে তোমরা ঠিক বুঝবে না। আবার দেখছি, কত বড় মহৎ কাজ নিয়ে নেমে পড়েছেন। মাতাজীকে সাধারণ মানুষ মনে ক'রো না, বীরেনবাবু।' মহারাজের মুখে মার কথা শুনে, আর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখে, আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল।

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধকসমাজে সুপরিচিত ললিতাসখী গৌরীমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন[১] :

রথের সময় মা একদিন বললেন, "চল, আজ রথযাত্রা, মাহেশে রথ দেখিয়া আসি।" শুনিয়া আনন্দে মায়ের সঙ্গে চলিলাম। রথ টানা আরম্ভ হইয়াছে। সামান্য কিছু দূরে রথ যাইতে না যাইতেই ব্যস্তসমস্তভাবে মা বলিলেন, "চল্, চল্ শীঘ্র এখান হইতে বাহির

১ গৌরীমা : দুর্গাপুরী দেবী

হইতে হইবে।" আমি বলিলাম, "রথ টানা হইতেছে দেখিয়া যাইতে হইবে।" মা বলিলেন, "আরে না রে, এখনই এখানে খুনাখুনি রক্তারক্তি হইবে।" বলিয়াই মা চলিলেন। আমি এবং আর দুই একজন যাঁহারা ছিলেন সকলেই কিন্তু বিমনা হইয়া চলিলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই শুনি যে রথের চাকার তলে পড়িয়া একটা লোক কাটা পড়িল। চারিদিকে রক্তারক্তি বিষম ব্যাপার। তখন মায়ের কথা বুঝিলাম।"

একদিন একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মা, অনেক সাধুদের দেখিতে পাই, নানারূপ সিদ্ধি দেখান, কেহ বা মনের কথা বলেন, কেহ বা কাহারো রোগ ভাল করিয়া দেন, কেহ বা কাহারও মামলা জয় করাইয়া দেন, এ সমস্ত কি করিয়া হয়?"

মা বলিলেন, "বাবা, ভগবানকে যে কোনও ভাবে ডাকিলে তাহার কৃপা হয়। সেই কৃপার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ঐ সাধককে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হয়। যদি এ সমস্ত কোন ঐশ ব্যাপারে সাধক মুগ্ধ হন, তবে আর শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। কাজেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সমস্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে যে, কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রকাশ পায়, উহা ভক্তের ইচ্ছাকৃত নহে। উহা মাত্র ভগবদিচ্ছায় ভক্তের হৃদয়ে ক্ষণিক বিকাশ—ভক্তের অনবধানে।"

একবার গৌরীমা কলকাতা থেকে জয়রামবাটী যাচ্ছেন দেবী সারদামণির চরণ দর্শনে। পথ চলেছেন একাকিনী এবং পদব্রজে। রাস্তাঘাট তখন বিপজ্জনক ছিল. চোর ডাকাতের উপদ্রব হতো প্রায়ই। একদল পথচারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। এরা ডাকাতদলের লোক। গৌরীমার দিব্যকান্তি ও সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখে তারা ভেবে নিল, এই সাধুমার কাছে টাকাকড়ি প্রচুর আছে। তাছাড়া, ঠাকুরের মূল্যবান অলংকারও হয়তো দু'চারখানা লুকানো রয়েছে। ডাকাতেরা চক্রান্ত করল, গৌরীমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে পথে সুযোগমতো

তাঁর প্রাণনাশ করবে ও টাকাকড়ি অলংকার প্রভৃতি নিয়ে চম্পট দেবে। তাদের আচার আচরণ দেখলে মনে হবে সবাই অতি ভক্তিমান্ এবং নিরীহ গ্রাম্যলোক।

ইষ্টদেব দামোদর-শিলার পুজো এবং ভোগ দেবার জন্য গৌরীমা পথিমধ্যস্থ এক বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট হলেন। সঙ্গী ডাকাতেরা ঠাকুরের ভোগের জন্য গ্রাম থেকে সংগ্রহ ক'রে আনল নানা খাদ্য-সামগ্রী। ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করবার জন্য তারা সবাই উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

গৌরীমা পূজা ও স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত করলেন। তারপর ভোগ নিবেদন করতে যাবেন, অমনি অন্তরে অকস্মাৎ ঘনিয়ে এল সন্দেহের কালো ছায়া।

সঙ্গী লোকগুলোর দিকে তীক্ষ্ণনয়নে করলেন দৃষ্টিপাত। মুহূর্ত মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল ঐ ভণ্ড ভক্তদের প্রকৃত স্বরূপ। ভোগের সামগ্রী ঠাকুরকে আর নিবেদন করা হল না, তৎক্ষণাৎ সে সব দূরে নিক্ষেপ করলেন। এবার দৃপ্ত ভঙ্গীতে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে উঠলেন, "তোরা অতি পাষণ্ড, ঠাকুরের ভোগের জিনিসে বিষ মেখে দিয়েছিস।"

তাঁর রুদ্রমূর্তি দর্শন ক'রে ডাকাতেরা ঘাবড়ে গেল, ভাবতে লাগল, তবে কি তিনি অন্তর্যামিনী সাধিকা? তাদের ডাকাতির দুরভিসন্ধির সব কথা তাহলে তাঁর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। নিশ্চয় এই সন্ন্যাসিনী দৈবশক্তিসম্পন্না, এঁর সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। ভীত শঙ্কিতচিত্তে সবাই এবার গৌরীমার শরণ নিল, অকপটে স্বীকার করল তাদের চক্রান্তের কথা। গৌরীমা তখন বললেন, "তোরা দুষ্কর্ম ছেড়ে দে, মুনিষের কাজ নিয়ে সংসারধর্ম পালন কর্। যা, ঠাকুর তোদের উদ্ধার করবেন।"

ডাকাতেরা তখন জোড়হস্তে বার বার তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে, আর শপথ করছে, আর কখনো এমন কুকাজ করবে না।

জয়রামবাটীতে পৌছানোর পর গৌরীমা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা

বিবৃত কবলেন। সবাই মন্তব্য কবল, "ডাকাতেব হাত থেকে খুব বেঁচে গেছেন আপনি।"

সাবদামণি এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে তাঁব অন্তরঙ্গ ভক্ত গৌবদাসীব বিপদেব কাহিনী শুনছিলেন। এবাব প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "ঠাকুবেব দৃষ্টি সতত রযেছে তোমাব ওপব। তাইতো আজ তিনি বক্ষা কবলেন এ বিপদে।"

সাধিকা গৌরীমাব প্রথম শিষ্য গ্রহণেব কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। তখন তিনি বিন্ধ্যাচল পরিব্রাজনে গিয়েছিলেন। তীর্থ কবতে এসে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায নামক জনৈক অবিবাহিত যুবক এখানে তাঁব দর্শন লাভ কবেন। গৌবীমাব দিব্যকান্তি এবং ভাবাবিষ্ট মূর্তি দর্শন ক'বে নগেন্দ্রনাথেব মনে হতে থাকে এই সাধিকাই তার বিধি-নির্দিষ্ট গুরু। অকপটে মনের অভিলাষ ও সংকল্প তিনি ব্যক্ত করেন গৌবীমাব কাছে। বাব বাব কবেন তাঁর কৃপা প্রার্থনা।

গৌবীমা এ সময়ে দীক্ষাদানে অনিচ্ছুক তাই এড়িযে যান এই যুবককে। নগেন্দ্রনাথ ভাবলেন, "মা হযতো তাকে দীক্ষাদানেব অনুপযুক্ত মনে কবেছেন তাই এই প্রত্যাখ্যান। কিন্তু তিনি হটবাব পাত্র নন। আহাবনিদ্রা ত্যাগ ক'বে গৌরীমাব কুটিবদ্বারে আপন সংকল্প নিযে পড়ে থাকেন দিনবাত। দেখা পেলেই জ্ঞাপন করেন অন্তবেব আকুতি।

গৌরীমা কিন্তু অবিচল। স্পষ্টভাষায জানিয়ে দেন, "বাবা, কেন তুমি বৃথা অনুবোধ কবছো? আমি তো কাউকে দীক্ষা দিই না।"

কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থী তরুণকে নিবস্ত কবা সম্ভব হল না।

সেদিন প্রত্যূষে উঠে মৃদুস্ববে মহামন্ত্র উচ্চারণ কবতে কবতে গৌবীমা স্নানেব ঘাটে যাচ্ছেন। নগেন্দ্রনাথ আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সোৎসাহে বলে উঠলেন, "মা, এই তো আমাব দীক্ষাব মন্ত্রলাভ হয়ে গেল। তোমাব মুখনিঃসৃত যে মহামন্ত্র আমাব কানে প্রবেশ করেছে, এখন থেকে এই মন্ত্রই আমি জপ ক'বে যাবো।"

গৌরীমা সহাস্যে বলে ওঠেন, "কিন্তু বাবা, তোমার তো কৃষ্ণমন্ত্র নয়, তোমার দীক্ষা হবে শক্তিমন্ত্রে।"

নগেন্দ্রনাথ পেয়ে গেলেন তাঁর বহুপ্রতীক্ষিত সুযোগ, বার বার জানাতে লাগলেন কাতর প্রার্থনা। তাঁর এই তীব্র ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য দেখে গৌরীমার মন নরম হয়ে এল। প্রসন্ন হয়ে সেদিনই করলেন দীক্ষা দান। উত্তরকালে নগেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সাধনমার্গে উন্নতিলাভ করেন।

প্রযাগে পবিত্র ত্রিবেণীর তীরে বসে গৌরীমা একবার তপস্যায় রত রয়েছেন। একটি মহিলা সঙ্গমে স্নানসমাপন করে ঘরে ফিরছেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল দিব্যশ্রীমণ্ডিতা সন্ন্যাসিনী গৌরীমার উপর। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। গৌরীমা তখন ধ্যানাবিষ্টা, চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে অপার্থিব জ্যোতির আভা। ধ্যানান্তে গৌরীমা শুরু করলেন চণ্ডীপাঠ, তন্ময় হয়ে গেলেন এই পাঠে। প্রায় ঘণ্টা দুই এইভাবে অতিবাহিত হল। দর্শনার্থী মহিলাটি এতক্ষণ তার কাছে বসে আছেন মন্ত্রমুগ্ধার মতো, একমনে শ্রবণ করছেন মাতাজীর উদাত্ত কণ্ঠের পাঠ। অসীম শ্রদ্ধায় ভরে উঠল তাঁর প্রাণমন, ভাবতে লাগলেন, 'কে এই সন্ন্যাসিনী, মানবী না দেবী?'

পাঠ সমাপন হয়েছে। গৌরীমা এবার দৃষ্টিপাত করেন পার্শ্বে উপবিষ্ট ভক্ত মহিলাটির দিকে। যেমন তাঁর রূপ, তেমনি সেজেছেন, নানা রত্নালংকারে। কিন্তু চোখে মুখে বিষাদের কালো ছায়া। গণ্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছে।

"কে মা তুমি? কাঁদছ কেন বলতো?"—করুণামাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করেন গৌরীমা।

স্নেহ ও করুণার স্পর্শ পেয়ে মহিলাটির অন্তরের রুদ্ধ ব্যথা উদ্বেল হয়ে ওঠে, ভেঙে পড়েন কান্না ও আর্তিতে। অতঃপর কিছুটা শান্ত হয়ে তিনি বললেন, "আমার মতো এই অভাগিনীর কি কোনো উপায় আছে মা?"

প্রশান্তকণ্ঠে গৌরীমা তাঁকে বললেন, "সবাব যিনি আশ্রয, সেই ভগবানেব কৃপাই উপায়। কিন্তু কি হযেছে মা তোমাব? তোমাব দুঃখু কিসের? আমায সব খুলে বল।"

ক্ষণেকেব ভুলে, যৌন লালসাব তাড়নায মহিলাটি একসময হযেছিলেন বিপথগামিনী। এবাব অনুতাপেব আগুন জ্বলে উঠেছে, দগ্ধ হচ্ছেন দিনেব পব দিন। নিজ জীবনেব পাপাচাবেব কাহিনী অকপটে সব তিনি খুলে বললেন গৌরীমাকে। প্রার্থনা জানালেন, "মা, আপনি আমায শান্তিব পথ দেখিয়ে দিন।"

"সে পথ তো ভাবী কঠিন মা, সকল বকম বিষয বাসনা না ছাড়লে সে পথে তো এগোনা যায না।"

"সে পথ যত কঠিন হোক, মা, আমি তা গ্রহণ কবেবো। আমাব এ শান্তিহীন জীবনের একটা উপায় ক'বে দিন। আমি আব ঘরে ফিরবো না।" মহিলাটিব কান্না আব থামতে চায না।

"বেশ সত্যিকাবেব অনুতাপ যদি তোমাব এসেই থাকে তা হ'লে পাববে। যদি প্রকৃত শান্তি ও আনন্দেব সন্ধান পেতে চাও তবে সব ছেড়ে ভগবান্‌কে ডাক। পেছন দিকে আব ফিবে চেয়ো না।"

গৌরীমা তাঁকে সাধনভজন সম্পর্কে অনেক সদুপদেশ দিলেন। সর্বোপরি জানালেন এই পথভ্রষ্টকে তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ। তারপর সস্নেহে বললেন, "মা, তুমি হৃষীকেশে চলে যাও। সেখানকার পবিত্র পবিবেশে নিভৃত স্থানে বসে, শুরু কবো কঠোব তপস্যা। শান্তি আনন্দ আব আলোর পথ অচিবে তুমি দেখতে পাবে।"

অনুতপ্তা নাবী তৎক্ষণাৎ যমুনার জলে বিসর্জন দিলেন সকল কিছু স্বর্ণালংকাব, মস্তকের দীর্ঘ কেশদাম ফেললেন কেটে। তাবপর দীনা ভিখারিণীর বেশে সকল জাগতিক আকর্ষণ ও মোহবন্ধন ছিন্ন ক'বে চলে গেলেন হৃষীকেশে।

বহুদিন পবে হৃষীকেশে গৌবীমাব সঙ্গে এই তপস্বিনীর আবার দেখা। প্রথমে গৌরীমা তাঁকে চিনতে পাবেন নি। তপস্বিনী শ্রদ্ধাভবে

লুটিয়ে পড়েন তাঁর চরণতলে, স্মরণ করিয়ে দেন প্রয়াগ-তীর্থে তাঁদের সাক্ষাতের কথা। গৌরীমা লক্ষ্য করলেন, তাঁর কৃপাপ্রাপ্তা নারী ইতিমধ্যে সাধনভজনে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন, আনন্দে গৌরীমার অন্তর ভরে উঠল।

সাধনকামী যে কোনো মানুষই ছিলেন গৌরীমার স্নেহ-মমতার পাত্র। সাধারণভাবে এদের যে সাধন উপদেশ তিনি দিতেন তা তাঁর ভক্তদের লেখায় পাই :

—গৌরীমার নিকট যে সকল নরনারী সাধনভজন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহাদিগের আধার বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে উপদেশ দান করিতেন। কোনো কোনো সন্তানকে তিনি প্রাণায়ামাদি যোগপ্রণালীও শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশকেই তিনি বলিতেন, "জপধ্যান ও স্মরণ মননের পথই সহজ। এ পথেও ভগবান্ লাভ করা যায়। জপ করতে বসে প্রথম কিছুক্ষণ হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করবে। তা'তে মন শুদ্ধ হবে। তারপর ইষ্টমূর্তি চিন্তা করতে করতে জপ করবে। সংসারে কাজের চাপে বেশী সময় যদি নাই-ই পাও, তবু প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দু বেলা অন্ততঃ ১০৮ বার ক'রে ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রবে। জপ যত বেশী করতে পার, ততই মন স্থির হবে। প্রথম প্রথম ভাল না লাগলেও ধৈর্য ধ'রে লেগে থাকতে হয়, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই ভাল লাগবে। গুরু, মন্ত্র আর ইষ্ট আলাদা ভেবো না। তদ্গতচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করলেই দেখবে—ধ্যান জমে যাবে, আনন্দ পাবে।"

—সকল কথার মধ্যে এবং সকল কথার পরে তিনি উপদেশপ্রার্থী নরনারীকে বার বার স্মরণ করাইয়া বলিতেন, "গৃহীই হও, আর সন্ন্যাসীই হও, আসল কথা—মন। মন সাচ্চা ত সব সাচ্চা।" মনটি খাঁটি হলে তবে ভগবান্-কৃপা হয়। ঠাকুর বলতেন—"পবিত্র দেহমনে খুব ব্যাকুলভাবে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যাবে। তাঁকে না ডাকলে তাঁর কৃপা না হলে, মানুষের জীবন দুঃখের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সকল

কাজের মধ্যে তাঁকে স্মবণ কববে। ব্যাকুল হযে তাঁকে ডাকবে, যেন তাঁর পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়।"[১]

মহাসাধিকা সাবদামণি ছিলেন গৌরীমাব অধ্যাত্ম-জননী, এই জননীব কৃপা তাঁব লৌকিকজীবনে ঝবে পডেছিল অজস্রধাবায়। দুর্গাপুবী মাতাজী এ সম্পর্কে এব এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন[২] :

—কৃষ্ণ চৌধুবীব বাড়িতে গৌবীমা কিছুদিন বাস কবিতেছিলেন। একদিন দুপুববেলা ঐ বাড়িব বাবান্দায় বসিয়া একমনে তিনি একখানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ চাহিয়া দেখেন, শ্রীশ্রীমা আসিয়াছেন। আজ তাঁহাব পবিধানে একখানি গেরুয়া বসন, মাথায় কেশ আলুলায়িত, চলন অতি দ্রুত—সবই অস্বাভাবিক বকমেব! ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "ও মা গৌবী, তুমি এখানে থাক? আমি তোমাব কাছেই যে এলুম।" তাঁহাকে এমন অসময়ে একা এই বেশে আসিতে দেখিয়া গৌবীমা বিস্মিত চিত্তে একখানি আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন, "ওমা কি ভাগ্যি, তুমি এসেছ। এখানে বসো মা।" তাহার পব ডাকিলেন, "ও আশু! ও কেনা! তোবা কোথায় গেলি সব, শিগ্‌গীব আয়। মা ঠাকরুণ যে এসেছেন।"

শ্রীশ্রীমা বাধা দিয়া বলিলেন, "কারুকে ডেকো না, ঘবে চল।" এই বলিয়া তিনি ঘবে প্রবেশ কবিলেন। গৌবীমাও নির্বাক হইয়া তাঁহাব অনুগমন কবিলেন। ঘরে আসিয়াই তিনি গৌবীমাকে মাটিতে শোয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহাব সর্বাঙ্গ দুই হাতে ঝাড়িতে লাগিলেন। গৌবীমা মন্ত্রমুগ্ধাব ন্যায শ্রীশ্রীমাযেব মুখেব দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বহিলেন, কিন্তু ব্যাপাব কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। শ্রীশ্রীমা ঝাড়া শেষ কবিয়া গৌবীমাকে বলিলেন, "মা, তুমি ভেবো না, আমিও চাবটিখানি নিযে চললুম।" তিনি ফিবিযা চলিলেন। গৌবীমা

---

১ গৌবীমা : সাবদেশ্ববী আশ্রম

২ গৌবীমা : দুর্গাপুবী দেবী

তাঁহার পশ্চাৎ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অবসন্ন-ভাবে শুইয়া পড়িলেন।

—ঘরে একটি বালিকা লেখাপড়া করিতেছিল। সে গৌরীমার যাওয়া এবং আসা দেখিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কি যে ঘটিল তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। গৌরীমা সেদিন একটা আবেশের মধ্যে রহিলেন। কাহারও সহিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারিলেন না। সেই দিনই তাঁহার প্রবল জ্বর আসিল এবং পরের দিন সারা দেহে বসন্তের গুটিকা প্রকাশ পাইল। রোগ এমন ভীষণ অবস্থা ধারণ করিল যে, চিকিৎসকগণ গৌরীমার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন।

—ওদিকে উদ্বোধন-ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের ঐ সময় বসন্ত হইল। ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল গৌরীমাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "মায়ে ঝিয়ে ভাগাভাগি ক'রে রোগভোগ নিয়েছেন, আমরা তার কি করবো।"

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে গৌরীমার লৌকিকজীবনের কর্ম নানা দিক দিয়ে বেড়ে যায়। কিন্তু তাঁর চিত্তে এককেন্দ্রিকতা রয়ে গিয়েছিল পূর্ববৎ। ইষ্টদেব দামোদরকে ঘিরে, তাঁর সেবা পূজা ও স্মরণ মননেই সদা নিবিষ্ট থাকতো তাঁর প্রাণ মন। কর্ম কোলাহল, ছুটোছুটি, যতই থাকুক, তাঁর অন্তর্জীবনে প্রভু দামোদরের মাধুর্যময় প্রেম-লীলা ছিল অব্যাহত। উভয়ের মান অভিমান, আবদার আবেদনের বিরাম ছিল না।

প্রত্যক্ষদর্শিনী ভক্ত শৈলবালা দেবীর বর্ণনা থেকে এর মনোরম চিত্র আমরা পাই। তিনি লিখেছেন :

—একদিন মা তাঁহার সকল কাজ সারিয়া দুপুরবেলায় আসিয়া শুইয়াছেন, কিন্তু মা যেন স্থির হইতে পারিতেছেন না। কেন যে তাহা হইল, মা-ও ঠিক করিতে পারেন নাই। একটু পরে মা বলিলেন, 'ও মা, কর্তার যে দুধ খাওয়া অভ্যেস, দুধ খাওয়া তো আজ

হয় নি। তাই কর্তার ঘুম আসছে না।' মা' তখনি ঠাকুরঘরে গিয়া দামোদরকে দুধ দিয়া আসিলেন, এবং বলিলেন, 'এই দুধটুকু খেয়ে ঘুম এল।'

—আর একদিন রাত্রিতে গৌরীমার শরীর মোটে ভাল ছিল না। দামোদরের জন্য আর সেই রাত্রিতে প্রত্যেক দিনকার মতো রান্না হইল না, কিছু ফল মিষ্টি ভোগ দিয়া গৌরীমা শুইয়া পড়িলেন। দুপুর রাত্রিতে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি তাঁহার রান্নাঘরে আলো জ্বলিতেছে। গৌরীমা অতো রাত্রিতে উনুন জ্বালিয়া লুচি ভাজিতেছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এক ঘুমের পর কর্তা বললেন, খিদে পেয়েছে। তাই এ ব্যবস্থা।"

দুইটি যুক্তধারার সাধনায় ওতপ্রোত ছিল গৌরীমার জীবন। দামোদর প্রভুর লীলায় অবগাহন করতেন তিনি অবিরাম। এই সঙ্গে চলতো শ্রীরামকৃষ্ণের আদিষ্ট 'জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবা'র নিষ্কাম ব্রত। সাধনা ও সিদ্ধিতে সমুজ্জ্বল এই তাপসীর আশি বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে এবার ধীরে ধীরে এসে যায় বিরতির পালা। লীলা-সংবরণের প্রস্তুতির দিনগুলি এগিয়ে আসতে থাকে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাস। অমাবস্যার গভীর নিশীথে গৌরীমা তাঁর শয্যায় শুয়ে এক বিচিত্র অনুভূতির স্বপ্ন দেখলেন। দেবাদিদেব মহাদেব দেবী ভবানীকে সঙ্গে ক রে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর সম্মুখে, আর চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দিব্য জ্যোতিতে। প্রভু মধুর কণ্ঠে তাঁকে বললেন, "তোমার সাধনায় আমরা প্রসন্ন হয়েছি। এবার পূর্ণাহুতি দাও।"

পরের দিন ভোরে উঠেই গৌরীমা ভক্তদের কাছে সবিস্তারে বিবৃত করলেন এই স্বপ্নের কথা। সবারই অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠল, তবে কি এবার মা চিরসমাধিতে মগ্ন হতে যাচ্ছেন?

দেহে তখন আর চলৎশক্তি নেই, অধিকাংশ সময়ই গৌরীমা

শায়িত থাকেন তাঁর রোগশয্যায়। প্রবীণ ডাক্তারেরা বহুভাবে পরীক্ষা করছেন, ঔষধপত্রও দিচ্ছেন, কিন্তু রোগের কোনো উপশম হচ্ছে না।

সেদিন এক সন্ন্যাসিনী শিষ্যাকে নিভৃতে ডেকে বললেন, "ছাখ্, আমি বৃন্দাবনে আমার প্রাণপ্রভুর কাছে যাবো। তোরা আমার জন্য কাঁদিসনে যেন।"

শয্যায় শায়িত অবস্থায় প্রায় তিনি দিব্য আনন্দে আবিষ্ট হয়ে পড়েন, মৃদু মধুর হাসি ছড়িয়ে পড়ে চোখে মুখে। এমনি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সেদিন খিলখিল ক'রে হাসছেন, শয্যার পাশে রক্ষিত ফুলের রাশি ছড়িয়ে দিচ্ছেন এদিকে-ওদিকে।

এক কিশোরী সেবিকা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হেসে জিজ্ঞেস করলে, "ঠাকুমা কার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি? ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন কাকে?"

উত্তরে ভাবগদ্গদ কণ্ঠে বললেন, "ওরে, আমি যে রাধারাণীর সঙ্গে খেলা করছি।"

এ-সময়কার অবস্থা সম্পর্কে শিষ্যা ও উত্তরসাধিকা দুর্গাপুরীজী লিখেছেন :

"মায়ের মুখচ্ছবিতে, কথাবার্তায় এবং আচরণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ দেখা যাইতে লাগিল। ঠাকুর দেবতার কথা বলিতে বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনে হইত, তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহাদের কথা বলিতেছেন। সেবিকাগণও তাহার কিছু কিছু আভাস অনুভব করিতেন। কখনও কখনও দেখা যাইত, তিনি যেন কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন, কাহাকে আদর করিতেছেন, কাহারও সহিত অভিমান করিতেছেন। এইরূপে অধিকাংশ সময়ই তিনি ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন।

"তাঁহার অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ এমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তরখানি স্বতই বাহিরে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। বাহ্য চরিত্রের সেই তেজস্বিতা, সিংহবিক্রম, রুদ্রকঠোরতা আনন্দাতিশয্যের সৌরকিরণে তুষাররাশির

ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া মাধুর্যের অমৃত সিন্ধুতে পরিণত হইল। রুদ্রাণীর সূর্যমণ্ডলের ন্যায় খরপ্রভা আজ সংহৃত—মৃড়ানী সকলকে তাঁর স্নেহ-স্নিগ্ধ কোলে ডাকিয়া লইলেন। যে আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ লইয়া তাঁহার অন্তরে নিত্য উৎসব সমারোহ চলিতেছিল, তাহারই কিয়দংশ বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিল। যাঁহার মধ্যেই ভক্তিরসের সন্ধান পাইতেন, তাঁহাকেই বলিতেন—"তোমরাও আমার ঠাকুরকে একটু ভালবেসো।"

সেদিন শিবচতুর্দশী। স্মিতহাস্যে ভক্ত ও সেবিকাদের দিকে তাকিয়ে গৌরীমা বলিলেন, "ঠাকুর সুতো টানছেন। সবাই বুঝে নিলেন, স্নেহধন্যা শিষ্যা, তপস্বিনী গৌরদাসীকে শ্রীরামকৃষ্ণ এবার টেনে নিচ্ছেন পরমসত্তার পানে।

সেদিন বিকেলবেলায় সবাইকে ডেকে গৌরীমা বললেন, আজ তোরা আমায় ভালো ক'রে সাজিয়ে দে।" গরদের শাড়ী পরিয়ে অজস্র সুগন্ধি ফুলের মালায় সাজিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। নিজের সাজার বাহার দেখে গৌরীমা বালিকার মতো আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছেন। বলে উঠলেন, "বাঃ, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে তো। আমি যে রাজার বেটি। রাজরাজেশ্বরী আমার মা।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, "কি সুন্দর সেজেছি। দ্যাখ্, ঐ যে আমার রথ নেমে আসছে।"

পরের দিন নির্ধারিত বিদায় লগ্নটি উপস্থিত হল, আমায় তোমরা আর ডেকো না মা" বলে অন্তিম জপে নিবিষ্ট হলেন গৌরীমা। ধীরে ধীরে তাঁর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল দিব্য জ্যোতির আভা। অগণিত ভক্ত ও দর্শনার্থীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে চিরসমাধিতে নিমগ্না হলেন আপ্তকামা মহাধিকা।
